রাজা উজীর

বন্ধুবর

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

করকমলে

হিটলারের প্রেম

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ১লা মে জর্মনির জনসাধারণ পেল তার মোক্ষমতম শক্—যেন দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার মস্তকে স্বয়ং মুষ্টিযোদ্ধা ক্লে একখানি সরেসতম ঘুঁষি মেরে তাদের সবাইকে টলটলায়মান পড়পড়ায়মান করে দিলেন। ঘুঁষিটাএল হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র থেকে—ইতিমধ্যে মিত্রশক্তি আকাশ থেকে জর্মনির বৃহৎ বৃহৎ বেতারকেন্দ্রগুলো, বিশেষ করে শর্টওয়েভের—প্রায় সবগুলোকেই খতম করে দিয়েছেন।

বেতারে তখন সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেই অনুষ্ঠান ক্ষণতরে বন্ধ করে বলা হল, 'আপনারা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য তৈরী থাকুন।' কিছুক্ষণ পরেই বেতারে ঘোষিত হল, 'আমাদের ফ্যুরার আডল্‌ফ্ হিটলার ইহলোক ত্যাগ করেছেন।'

এরপর যে শক্‌টা পেল সেটা তাদের খুলি ভেঙ্গে দিল না বটে, কিন্তু মাথার মগজ দিলে ঘুলিয়ে। যেন অমলেট্ বানাবার কল ব্রেন-বকস্‌টার মধ্যখানে তুর্কিনাচন লাগিয়ে দিলে।

হিটলার মৃত্যুর চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে শ্রীমতী এফা ব্রাউন নাম্নী—তাবৎ জর্মনদের কাছে অজানা অচেনা এক কুমারীকে বিয়ে করেছিলেন। সমস্ত জর্মনি যেন বুদ্ধিভ্রষ্ট-জনের মত একে অন্যকে শুধালো, সে কি! গত বারোটি বৎসর ধরে যে ফ্যুরারের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, সে তো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ছবি। যিনি সুখময় নীড় নির্মাণ করেননি, বল্লভার সন্ধান করেননি, এমন কি বংশরক্ষা করে উত্তরাধিকারীরূপে কাউকে স্বহস্তনির্মিত ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের সিংহাসন বিনিন্দিত সহস্রায়ু রাইষের (নাৎসি রাজ্যের) সিংহাসনে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাননি। অথচ তিনি কী ভালোই না বাসতেন শিশুদের,—যখনই জনসাধারণের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছেন, তখনই দেখেছি তিনি কী হাসিমুখে শিশুদের আদর করে বাহুতে তুলে নিয়েছেন, তাদের মাতাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। দেশের শ্রেষ্ঠা নর্তকী, অভিনেত্রী, গায়িকা, সুন্দরীদের জন্মদিনে তাঁদের বাড়িতে দিশী-বিদেশী বিরল ফুলের স্তবক পাঠিয়েছেন। প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী গ্যোবেলস আমাদের বেতারে কতশত বার বলেছেন, 'এই সন্ন্যাসীর হৃদয়কন্দরে কিন্তু নিভৃতে বিরাজ করেন সৌন্দর্যের দেবতা। এ তপস্বী সেই বিশ্বকল্পনাময়ী চিন্ময়ীর উপাসক। সে চায়, নিভৃতে নির্জনে একাগ্র মনে তাকেই রঙে রেখায় ফুটিয়ে তুলতে, তোমাদের গৃহ সুন্দরতররূপে নির্মাণ করে তারই প্রতিষ্ঠা করে তোমাদেরই গৃহ মধুময় করে তুলতে। কিন্তু হায়, তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না। জর্মনির ভাগ্যবিধাতা তাঁর স্কন্ধে তুলে দিলেন বিরাট বিশাল রাইষের গুরুভার। তাকে বিরাটতর, বিশালতর এবং সর্বোপরি তাকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে নির্মাণ করার গুরুভার। এবং সে রাষ্ট্র এমনই প্রাণবন্ত, দীর্ঘজীবী হবে যে এযাবৎ পৃথিবীতে যে-সকল সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র আপন নাম ইতিহাসে রেখে

গেছে তাদের সবারই হতে হবে, আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের তুলনায় বালখিল্যবৎ —এ রাষ্ট্রের পরমায়ু হবে সহস্র বৎসর—থাউজেন্ড-ইয়ার-রাইষ।'

আরো অনেক কথা বলেছেন ফ্যুরার সম্বন্ধে, অনেক ছবি এঁকেছেন আডল্‌ফ্‌ হিটলারের তিনি, একের পর এক বিজয়মুকুট পরে ফ্যুরার যখন মস্কোর দ্বারপ্রান্তে—যেন রাশার মৃত্যুদূত এসেছে তার আত্মাকে শয়তানের অতল গভীরে চিরতরে বিলীন করে দিতে—তাঁর সে বিজয়-গর্বিত ছবি ; এবং তারপর যখন পরাজয়ের পর পরাজয় দ্রুততর গতিতে চারিদিক থেকে বজ্রমুষ্টিতে তাঁকে ধরতে গেছে তখনও চিরাশাবাদী গ্যোবেলস তাঁর বীণাযন্ত্র ভেঙে ফেলেননি, উচ্চতর কণ্ঠে গেয়ে উঠেছেন তাঁর প্রভু, ফ্যুরারের প্রশস্তি-সঙ্গীত। সেখানে ফ্যুরার কৃচ্ছ্রসাধন-রত যোগী। তিনি সর্বসুখ বিসর্জন করে, সর্বধ্যান নিয়োজিত করে নির্মাণ করেছেন সেই ব্রহ্মাস্ত্র (প্রায় শব্দার্থ, প্রথমা বিজয়িনী victory one, অনুজা বিজয়িনী V II)—এবারে দধীচির অস্থি নিষ্প্রয়োজন (অর্থাৎ অন্য কোনো মিত্রশক্তির সাহায্যে জয়লাভ নয়, কারণ ইতিমধ্যে তাঁর মিত্র ইতালী ও জাপান তাদের অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ রণাঙ্গনেও কোনো বিজয়চিহ্নের আভাস দেখতে পাচ্ছে না)। তিনি এই বার্লিন নগরী ত্যাগ করবেন না। এই ধ্যান-পীঠের সম্মুখে এসেই শত্রুসঙ্ঘ হবে অবলুপ্ত, লীন হবে মহাশূন্যে।

এবং বিশ্বের ইতিহাসে এই অতুলনীয় 'ধর্ম' প্রচারক বক্তা, জনগণমনজয়ের বীর গ্যোবেলস প্রায় প্রতিবারই তাঁর ভাষণ শেষ করতেন এই বলে, 'বিশ্বের ইতিহাসের এই সর্বোত্তম আত্মত্যাগ বিশ্ববিধাতা কর্তৃক লাঞ্ছিত হবে না।' (কানে কানে বলি, গ্যোবেলস ছিলেন নিরঙ্কুশ নাস্তিক ; বরঞ্চ তাঁর প্রভু হিটলার অন্তত অদৃশ্য অজ্ঞেয় অন্ধ নিয়তিতে—'শিক্‌জাল'—বিশ্বাস করতেন)।

আজ হিটলার চিতাশয্যায় (বস্তুত তাঁর ও পত্নী এফার দেহ তাঁরই সর্বশেষ আদেশানুসারে দেশাচারানুযায়ী গোর না দিয়ে পেট্রল দিয়ে পোড়ানো হয়) প্রবেশকালের প্রাক্কালে বিবাহ করলেন তাঁর 'রক্ষিতা'কে—যার সঙ্গে তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে সর্ববিলাসবৈভবে পরিপূর্ণ সুসজ্জিত শৈলাবাসে কাটিয়েছেন কত না ক্লান্তিহীন দিবস, নিদ্রাহীন রভস যামিনী, বৎসরের পর বৎসর, অন্তত চোদ্দটি বৎসর, অর্থাৎ নেতৃত্ব গ্রহণ করার প্রায় দু-বছর আগের থেকে !

কই, গ্যোবেলসের অঙ্কিত সেই বিলাসবিমুখ জিতেন্দ্রিয় সর্বত্যাগী রাইষের মঙ্গল কামনায় ধ্যানমগ্ন তপস্বীর সঙ্গে তো বেতারে প্রচারিত, একগুণকে শত-গুণে বর্ধিত করে বিজয়ী মার্কিন সেনা—উপস্থিত তারা জর্মানিতে থানা গেড়ে তার উপর সার্বভৌম রাজত্ব করছে—এবং তাদের অভ্যাসার্জিত 'কেলেঙ্কারি কেচ্ছা' বর্ণনের সুমেরু শিখরে তথাগত তথাকথিত জার্নালিস্টের প্রকাশিত জর্মন এবং ইংরাজি ভাষাতে প্রচারিত দৈনিক, সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হিটলারের ছবি আদৌ মিলছে না।

বের্ষটেশগাডেনে হিটলারের শৈলাবাস ছিল দশাধিক বৎসর ধরে সর্ব 'ধার্মিক' নাৎসি, এমন কি মধ্যপন্থী সরলহৃদয় লক্ষ লক্ষ জর্মনেরও পুণ্যতীর্থ-ভূমি। হিটলার সচরাচর থাকতেন নিরস বিরস বৈশ্যভূমি বার্লিনে ; সম্মুখে

কৃষ্ণকঠিন প্রস্তর-নির্মিত অপ্রিয়দর্শন বস্তুতান্ত্রিক রাজবর্ত্ম, চতুর্দিকে অভেদ্য পাষাণপ্রাচীর, পাষাণতর হৃদয়নির্মিত, বদনমণ্ডলে সর্বপ্রকারের অনুভূতি-প্রকাশবর্জিত, শীতল কৃষ্ণধাতুতে নির্মিত অস্ত্রহস্তে রক্ষীদল, পাত্র-অমাত্যের স্বতশ্চল শকটের যন্ত্রীরব-বিঘোষ-নিনাদ, সদাই ফ্যুরারের পরিদর্শনের জন্যে বিকটতম শব্দ করে দ্রুতগতিতে গমনাগমনরত দৈত্যসম পর্বতপ্রমাণ ট্যাংক-বর্মপরিহিত সাঁজোয়া যান, আরো কত না নবীন নবীন বৃহৎ বৃহৎ মারণাস্ত্র, এবং ফ্যুরার-ভবনের প্রশস্ত মর্মর সোপান বেয়ে উঠছেন নামছেন অভিজাত শ্রেষ্ঠ-তর মুকুটমণি রাজদূতরাজি—তাঁদের বেশভূষার দিকে তাকালে অন্ধ হয়ে যাবার আশংকা। বেশের উত্তমার্ধ স্বর্ণস্তরণে এমনই অলংকৃত—যে তার পটভূমি চীনাংশুক, পট্টবস্ত্র, না কিংখাপে নির্মিত সে তত্ত্ব নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রত্যেকেরই সেই স্বর্ণাস্তরণের উপর হীরকখচিত ভিন্ন ভিন্ন মহার্ঘ্য ধাতুনির্মিত সারি সারি মেডেল—বিজয়-লাঞ্ছন—মনে হয় তার যে-কোনো একটা সারির উপর দিয়ে দ্রুতগতিতে একটিবার আঙুল চালিয়ে নেওয়া মাত্রই বেজে উঠবে যেন জলতরঙ্গে স্বরসপ্তক।

মানুষের ভক্তি যতই গভীর হোক, সেটা অতল নয়—গভীরতম মহাসমুদ্রেরও তল আছে। যতই গগনচুম্বী হোক গৌরীশংকর নয়—এবং তিনিও চুম্বন করেন মহাউর্ধ্বের পদরেণুকণা অভ্রংরাশিমাত্র। কাজেই সেই ভক্তি বার্লিনের ঐ মারণাস্ত্র 'যক্ষপুরী'কে পুণ্যতীর্থভূমিতে পরিণত করতে পারেনি।

তারা ছুটে আসতো বের্ষটেশগাডেনে। তার পরিবেশ, তার বাতাবরণ, তার চতুর্দিকে দীর্ঘশির অভিজাত শ্যামল বনস্পতি, উচ্চতায় সেই সব বনবৃক্ষের তুলনায় সহস্রগুণে উচ্চ পর্বত, মেখলাকার শৈলমালা, তাদের অনেকেই শীতে-গ্রীষ্মে তুষারাবৃত, আর শীতকালে হিটলার ভবনের চতুর্দিকে হয়ে যায় ধবল বরফাচ্ছন্ন। গ্রীষ্মের দীর্ঘদিনে বনস্পতিরাজি নিরবচ্ছিন্ন বন্য বিহঙ্গ-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ।

লক্ষ লক্ষ নরনারী শোভাযাত্রা করে লাইন বেঁধে হিটলারের সামনে দিয়ে গৃহীর সরলতামাখা—অর্থাৎ কর্কশ মিলিটারি কেতায় নয়—'মার্চ পাস' করতো—হিটলার বিদেশাগত লয়েড জর্জ, জন স্যামুয়েল, অ্যান্টনি ইডেন জাতীয় অভ্যাগতদের আপ্যায়নে বা চপেটাঘাত প্রদানে অত্যধিক তৎপর না থাকলে পর।[১] নইলে এমনিতে দৈনন্দিন গেরস্তালি জীবনে হিটলার ছিলেন আদর্শ

---

১ আমার আশ্চর্য বোধ হয় এইসব ডিপ্লোমেটরা সেই নরঘাতন হিটলারের সম্মুখে তখন কী বেহদ্ বেহায়া, বেশরম, বেইজ্জৎ বাঁদর-নাচ, আবার বলছি, কোমরে ছিটের ঘাগরা পরে বাঁদর-নাচ নেচেছেন! পরে এঁদের অনেকেই বলেছেন,—শিশুর মত গদগদ সরল কণ্ঠে—'আমরা তখন জানতুম না, মাইরি, লোকটা ও-রকম একটা আস্ত নর-পিশাচ!' বটে! ন্যাকামির জায়গা পাওনি? তোমরা fool তো বটেই তদুপরি knave! তোমরা বুকে হাত দিয়ে বলো, তোমরা জানতে না, হিটলার রাজাসনে বসার প্রথম দিনই কম্যুনিস্টদের উপর

অতিথিসেবক, এবং এসব অপরিচিত লক্ষ লক্ষ অতি সাধারণ তীর্থযাত্রীদের প্রতি মাত্রাধিক সদয়। হিটলারের সেই বাড়ি নূতন জমিতে গড়া হয়েছিল বলে তখনো ছায়া দেবার মত বিস্তৃত ও দীর্ঘ বৃহৎ বৃক্ষ একটিও ছিল না। সেই কঠোর রৌদ্রে (উঁচু পাহাড়ের উপর রোদ বড় কড়া হয়) কখনো কখনো তিনি পুরো-পাক্কা দু'ঘণ্টা ধরে হিটলারি হাইল সেলুটে ডান হাত সম্মুখদিকে প্রসারিত করে স্কন্ধাবধি উত্তোলিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতেন—পুরো প্রসেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত। একদিন তাঁর সখা ওস্তাদের ওস্তাদ ফোটোগ্রাফার হফ্‌মান (এঁর নামটি মনে রাখবেন, পাঠক, ইনি হিটলারের প্রেম-মঞ্চে বিদূষক— বিশুদ্ধ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী তিন অঙ্ক নাটিকার শেষের দুই অঙ্কে অভিনেতা মাত্র তিনজন,—নায়ক, নায়িকা ও বিদূষক হফ্‌মান) হিটলারকে শুধোন, তিনি কি করে পুরো দু'ঘণ্টা ধরে, এরকম হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন! হিটলার উত্তরে বলেন, নিছক মনের জোরে।

দ্বিতীয় 'শকে'র পর এই সব লক্ষ লক্ষ তীর্থ-প্রত্যাবর্ত ও 'ভগবান' হিটলারের শ্রীমুখ-দর্শনপ্রাপ্ত নরনারী বিহ্বল, সামান্য দুটি অসংলগ্ন বাক্য সংযোজিত করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, কর্তাভজাদের ন্যায় গুরু কাণ্ডারীতে যারা সর্ব প্রত্যয় সর্ব আত্মোৎসর্গ করে আপন আপন নোঙর ভবনদীতে অবহেলায় বিসর্জন দিয়ে বসেছিল, তারা তখন কি ভেবেছিল?

এই গম্ভীর 'মার্চ পাস', হিটলারের সৌম্যস্মিত বদন (অবশ্য তাঁর টুথব্রাশ মুস্টাশ বাদ দিয়ে—এফা ব্রাউনও ছিলেন এটির জন্মবৈরী—কিন্তু ভক্তের কাছে তো 'বিটকেল গোঁপো গুরু ট্যারা চোখে চায়। তথাপি সে মোর গুরু নিত্যানন্দ রায়॥') স্বস্তিবাচক আশীর্বাদসূচক, অভয়মুদ্রার উত্তোলিত দক্ষিণ বাহু—তাঁর পিছনের পূত শান্ত সজ্জন ভবন, যেখানে গুরু অহোরাত্র জর্মন-মঙ্গল-কামনায় অহরহ তপস্যামগ্ন—তার পিছনে ছিল এত বড় ধাপ্পা! একটা রক্ষিতা রমণী নিয়ে সঙ্গোপনে ঢলাঢলি! তার জন্য অতিশয় সযত্নে জর্মনির সর্বশ্রেষ্ঠরও শ্রেষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে নির্মিত হয়েছে ঐ বাড়ির একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আস্ত wing!

মার্কিনরা মেতে উঠেছে, এবং রুচিবিহীন একাধিক জর্মন যোগ দিয়েছে সেই ভূতের নৃত্যে (আমি দোষ দিচ্ছি নে, জর্মনি তখন চরমতম দৈন্যপঙ্কে

কী অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে, তারপর ইহুদিদের নিয়ে, তারপর ২০শে জুলাই ১৯৩৪-এ তাঁর সহকর্মীদের—র‍্যোম, এর্নস্ট, হাইন্‌ৎস (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এরা ছিল নির্দোষী)—mass murder without any trial (শব্দার্থে নির্বিচারে পাইকারী হারে খুন), তোমরা তো তখন নিতম্ব বাজিয়ে নৃত্য করেছ! কণ্টক কণ্টকে নাশ! মুখে যতই ধানাই-পানাই করো, ইহুদিদের প্রতি তোমাদের মনোভাব অন্তত আমার অজানা নয়।

আর যদি এ-সব না জানতে তবে নিজেদের 'ডিপ্লোমেট' বলে পরিচয় দাও কেন? রাস্তার মেথরানী আর তোমাতে তাহলে কি তফাৎ!

এমনি নিমগ্ন যে বেটাবেটির দু'মুঠো অন্ন যোগাড় করার জন্য অনেক কিছু করতে সে প্রস্তুত—আমার আপন দেশের দৈন্য কি আমি চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে দেখিনি, পরে বুঝিনি ? এখন ঘাড় ফেরাই) হিটলারের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গতম গোপন কথা বের করে রগরগে পর্নোগ্রাফ ছেড়ে টু ক্রোর পাইস্ কামাতে।

আর জর্মানি খায় শকের পর শক্। অবশ্য তখন জর্মানির এমনই দুরবস্থা যে প্রেস নেই, নির্জলা মিথ্যার বিরুদ্ধেও প্রকৃত সত্য দিবালোকে প্রকাশ করার উপায় নেই। এবং সমূহ বিপদও তাতে আছে! লেখককে যে কোনো মুহূর্তে বিন্-ওয়ারেণ্টে, যদিও সে নাৎসি ছিল না—ধরে নিয়ে যাবে denazification (of delousing) কোর্টে,[২] এবং অন্য কিছু সাক্ষীসাবুদ

---

২ এরা যখন মার্কিন জেল থেকে মুক্তিলাভ করলো, ততদিনে আবার জর্মানিতে আপন আধা-স্বাধীন সরকার, মায় আদালতসুদ্ধ বসে গেছে। এই আদালত এদের এবং অন্য বহু লোককে ধরে আবার আরম্ভ করলে denazification (অর্থাৎ দেশকে ভুতপূর্ব নাৎসি-মুক্ত করা) মোকদ্দমা—গণ্ডায়-গণ্ডায়। এনারা আবার ওঁয়াদের চেয়ে এক কাঠি সরেস। কারণ জজদের অনেকেরই সামনে এসে দাঁড়ালেন এমন সব নাৎসি যাঁদের হাতে বিচারকরা নাৎসি-রাজত্বে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। (অবশ্য লাঞ্ছিত হওয়ার সময় তাঁরা জজ ছিলেন না, কিংবা ডিসমিস হয়েছিলেন) এঁরা নিলেন তাঁদের পূর্ণ প্রতিহিংসা—জেল, নাগরিকাধিকার লোপ এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল বহু লোকের—এমন কি যাদের মার্কিন কোর্ট কোনো প্রমাণ না পেয়ে বেকসুর ছেড়ে দিয়েছিল। আবার উল্টোটাও হল। যেখানে জজ নির্বাচিত হলেন কোনো 'প্রচ্ছন্ন নাৎসি', তখন তিনি পাঁড় নাৎসিদের অনেককেও ছেড়ে দিলেন কিংবা দিলেন মোলায়েমতম সাজা। তারপর হল আরেক ফার্স। জর্মন আইনে নিয়ম (এ আইন রোমান আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত—ব্রিটিশ আইন তা নয়) কোনো অপরাধের বিশ বৎসর পরে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মোকদ্দমা হতে পারে না। হিটলার আত্মহত্যা করেন ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫। মোটামুটি বলা যেতে পারে হিটলার নির্বাচিত নবীন চ্যান্সেলর মিশ্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ৮ই মে। অতএব লেগে গেল ধুন্দুমার। তা হলে ৮ ৫. ৬৫ তারিখে দেশে-বিদেশে লুক্কায়িত খুনিয়া খুনিয়া সব নাৎসি 'অজ্ঞাতবাস' থেকে বেরিয়ে আবার নবীন নাৎসি সঙ্ঘ তৈরী করবার চেষ্টা করবে। হয়তো বা এই কুড়ি বৎসরে যারা নাৎসিদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা করেছিল তারা প্রাণ দেবে গুপ্ত নাৎসি ঘাতকের হাতে, অন্ততপক্ষে গোপনে অপমানিত লাঞ্ছিত এবং প্রহৃত হবে। কারণ এদের অনেকেই ছিলেন পয়লা নম্বরী নাৎসি যেমন হিটলারের সেক্রেটারি মার্টিন বরমান্, এবং ইহুদী নিধনের গ্যাসঘর তথা কনসানট্রেশন ক্যাম্পের চোপদার (ন'টি ল্যাজতলা চাবুক মারনেওলা), কমাণ্ডান্ট্, কয়েদীদের উপর মারাত্মক (এদের ৯৫°/০ মারা যায়) সব ব্যারাকের

না নিয়ে, তুমি যে পাঁড় নাৎসি ছিলে সেইটে মার্কিন জংলী পদ্ধতি 'প্রমাণ' করে পাঠিয়ে দেবে শ্রীঘরে (অবশ্য তখন সেই বীভৎস খাদ্যাভাবের করাল কালে জেলে ভালো হোক, মন্দ হোক দু'মুঠো জুটতো)।

কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডের বৃহত্তম অংশের ভাষা জর্মন। বহু নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প এবং জেলমুক্ত নাৎসিবৈরী লেখক সেখানে গিয়ে আপন আপন বই বের করতে লাগলেন। তখন পরিপূর্ণ সত্য জানার ফলে জর্মনরা ধীরে ধীরে আপন আপন শকমুক্ত হতে লাগল। এঁদের অনেকেই যদ্যপি হিটলার-যুগে মানব-দুর্লভ সাহস দেখিয়ে নাৎসি-বিরোধিতা করার ফলে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও জেল বরণ করেন, (এবং সেখানে প্রায় সকলেই অসহ্য যন্ত্রণাভোগের পর মারা যান) আজ তাঁরা সত্য বলতে গিয়ে অনেক স্থলে নাৎসি-বিরোধী এবং মিথ্যা হিটলার কেলেঙ্কারি প্রচারের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার হিটলারের প্রাইভেট লাইফ সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব বেরুলো, যেগুলো nosy American and peeping British—and some French thrown in the bargain for good measure—বহু পরিশ্রম করেও বের করতে পারেনি।

তারই অন্যতম, হিটলারের প্রেম সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য বেরুলো যা দিয়ে প্রকৃত সত্য আজ হয়তো কিছুটা নিরূপণ করা যেতে পারে। এই যে মৃত্যুর চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে ১৪।১৫ বছরের রক্ষিতাকে হিটলার বিয়ে করলেন, সেটা কেন? সত্যই কি তিনি তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসতেন, যাকে আমরা বাংলায় প্রেম বলতে পারি, কিংবা এফা কি নিম্নস্তরের হাপ্‌গেরস্ত (দেমি মঁদেন), তাঁর সঙ্গে হিটলার কি প্লাটনিক প্রেম করেছিলেন (when "just nothing happens"), তাদের যৌন-জীবন কি সম্পূর্ণ নরম্যাল ছিল, হিটলার পারভার্স ছিলেন না কি না, এফাকে যদি সত্যই ভালবাসতেন তবে তাঁকে বহু পূর্বেই বিয়ে করলেন না কেন?—এবং জর্মনির জনসাধারণ বিশেষ করে মাতারা তো

---

experiment করনেওলা ডাক্তার, অথবা পাঁড় নাৎসি সম্পূর্ণ বিবেকহীন আইন বাবদে পরিপূর্ণ নাৎসি কর্তাদের মেহেরবানীতে নিযুক্ত জজ যারা কারো বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ (নাৎসি) মোকদ্দমা আনা মাত্র আসামীকে অপমানিত লাঞ্ছিত করে—মুক্ত অথবা গুপ্ত আদালতে হয় ফাঁসির হুকুম, নইলে চোদ্দ বছরের জেল। এদের অনেকেই বা অজ্ঞাতবাস থেকেই বেনামীতে নাৎসিবৈরীদের শাসিয়েছে।

তাই বহু আন্দোলনের পর—এমন কি ক্যাবিনেটে এ-বাবদে দ্বিধা ছিল যে, যদ্যপি ৮।৫।৪৫-এর পর কোনো নাৎসি-রাজ ছিল না, এবং ফলে তারপর কোনো নাৎসি অপরাধ হয়নি—এবং বিশ বৎসর পর সব খতম হওয়ার কথা। তবু—আরো দশ না কুড়ি বছর ধরে (আমার ঠিক মনে নেই) পূর্ব নাৎসিরা ধরা পড়লে মোকদ্দমা চলবে।

চাইতেনই যে ফ্যুরার হোন আর যাই হোন, ফ্যুরার হলেই তো আর দেহ পাষাণ হয়ে যায় না (এটা বিদ্যাসাগরের নকল ; তিনি বলেছেন, "বিধবা হইলেই তো তার 'দেহ' পাষাণে পরিণত হয় না", তার পূর্বের সমাজ-সংস্কারকরা বলতেন, "বিধবা হইলেই তো আর 'হৃদয়' পাষাণে পরিণত হয় না"), অতএব তাঁরও বিয়ে করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা উচিত। এস্থলে বলা বাহুল্য, সেটা পূর্বেই বলেছি, যে এফার সঙ্গে হিটলারের প্রকৃত-সম্পর্ক এতই মাত্রাধিক মিলিটারি টপ্ সীক্রেটের মত তিনি লুকিয়ে রাখতেন, এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের এবং চাকর-বাকরদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে তাঁরাও প্রাণের ভয়ে এ বিষয়ে ঠোঁট সেলাই করে রাখতেন। এবং সর্বশেষে প্রশ্ন, এফাই কি তাঁর প্রথম প্রেম, না এ বিষয়ে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতাও ছিল ? সেইটেই আজকার বিষয়বস্তু।

ন্যুরন্বের্গের মোকদ্দমার সময় (মিত্রপক্ষ বনাম নাৎসি রাইষের প্রধান প্রধান প্রতিভূ, যেমন হিটলারের পরের সম্মানিত জন ফিল্ড মার্শেল গ্যোরিঙ—হিটলার হঠাৎ মারা গেলে হিটলারের ফরমান অনুযায়ী তিনিই 'ফ্যুরার' হতেন ; তাবৎ জঙ্গী বিভাগের বড়কর্তা—হিটলারের পরেই—কাইটেল, তার পরের জন য়োড্ল্, ইত্যাদি ইত্যাদি সর্বসুদ্ধ ডজন দুই) আদালতের সামনে প্রাগুক্ত প্রশ্নগুলো আসামীরা দোষী না নির্দোষ সে বিচারে 'অল্পে'র চেয়ে 'বিস্তর' অবান্তর ছিল বলে সেগুলো আদালত সাতিশয় সংক্ষেপে সারেন। (অথচ পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কেন,—কোটি কোটি লোক বললেও আমি সংখ্যাটাকে অস্মদ্দেশীয় গঞ্জিকা-নির্গত বলে পত্রপাঠ বাতিল করে দেবো না—জানতে চেয়েছিল হিটলারের 'প্রেম' সম্বন্ধে এবং আজও জর্মনির ভিতরে বাইরে বিস্তর লোক এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন।) সৌভাগ্যক্রমে মার্কিনরা তাঁদের দেশের রীতি অনুযায়ী তাঁদেরই গুটিকয়েক সর্বোত্তম সাইকিয়াট্রিস্টকে সঙ্গে এনেছিলেন। আসামীদের একাধিকজন হিটলার ও এফাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন—হিটলারের বের্ষটেশগাডেনের বাড়ি বের্কহফে এঁরা হিটলারের অতিথিরূপে একাধিকবার গিয়েছেন এবং নিতান্ত বাইরের (বেগানা) লোক না থাকলে তাঁরা হিটলার ও এফার সঙ্গে খেয়েছেন, বেড়াতে গিয়েছেন, পিকনিক করেছেন, বাড়ির প্রাইভেট ফিল্ম শো প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই একসঙ্গে বসে দেখেছেন।

তাই মার্কিন ডাক্তাররা মোকদ্দমায় অবান্তর হিটলারের যৌনজীবন সম্বন্ধে আপন আপন কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এঁদের শুধিয়েছেন অনেক প্রশ্ন। যেমন ডাক্তার গিলবার্টের প্রশ্নের উত্তরে গ্যোরিং বেশ বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'Of course, he was normal like any one of us', অর্থাৎ হিটলার ছিলেন এ সব বাবদে আর পাঁচজনের মতই নর্মাল।

সেই সময়ই জর্মন জনগণ—অবশ্য প্রধানত জর্মন সাক্ষীদেরই মারফতে—একটি তরুণীর কথা জানতে পায়, নাম, গেলী (Angelika—এবং Geli এঁর ডাক-নাম) রাউগল্।

আমার ব্যক্তিগত মতে হিটলার ভালোবেসেছিলেন ½+1+½ (হাফ প্লাস ওয়ান প্লাস হাফ) অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে দুবার।

প্রথম হাফটা সচরাচর রোমান্টিক 'কাফ্ লভ্', অর্থাৎ বাছুরের মত করুণ নয়নে তাকানো, ম্যা-ম্যা রব ছাড়া—যার অর্থ গোপনে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করা, এবং সব চেয়ে বড় কথা বাছুর যে-রকম শিং গজাবার সময় যত্রতত্র ঢুঁ মেরে নিজের মস্তকদেশই জখম করে, বেশী চ্যাংড়ার বেলাও অবিচারে যত্রতত্র 'প্রেমে পড়ে' নাস্তানাবুদ হওয়া।

কিন্তু হিটলারের কাফ্ লভ্ প্রচলিত প্যাটার্ন নকল করেনি—এমন কি তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বাল্যজীবনের একমাত্র জীবনী-লেখক হিটলারের অতি প্রিয় একমাত্র বাল্যসখা—তিনি যা লিখেছেন সেখানে অনেকগুলো লক্ষণ দেখা যায় যেগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে, এ স্থলের নায়ক কিন্তু অসাধারণ প্রেমিক। আমি আজ সে কাহিনী কীর্তন করবো না, আমার উদ্দেশ্য সেই কাহিনী কিঞ্চিৎ শুনিয়ে দেওয়া যেটাকে হিটলারের ম্যুনিক যুগের (১৯২০ থেকে ১৯৩৩) সর্বঅন্তরঙ্গ জন—সংখ্যায় অতিশয় কম—এক বাক্যে হিটলারের 'ওয়ান এন্ড গ্রেট লভ্' বলেছেন—'গ্রেটেস্ট' বলেননি কারণ তাহলে অন্যগুলো অর্থাৎ যেগুলোকে আমি উপরে প্রথম 'হাফ' ও দ্বিতীয় 'হাফ' রূপে চিহ্নিত করেছি, ও ঐ একমাত্র গ্রেট লভের সঙ্গে একাসন না পেলেও একই শ্রেণীতে বসবার অনর্জিত সম্মানলাভ করে। কিন্তু সেই কাহিনীর নান্দী গাইবার পূর্বে, পাঠকের কৌতূহল কিঞ্চিৎ প্রশমিত করার জন্য উল্লেখ করি, হিটলার তাঁর প্রথম প্রেমের নায়িকাকে চার বৎসর ধরে প্রায় প্রতিদিন রাস্তায় অন্তত দুবার করে দুরু-দুরু বুকে ক্রস করেছেন, হ্যাট তুলে ভিয়েনার ভদ্রজনসম্মত পদ্ধতিতে গভীরতম বাও করেছেন—তিনি (জীবনী-লেখক—সে মহিলা এখনো জীবিতা এবং বিধবা, এখন বয়স প্রায় পঁচাত্তর—তাই ছদ্মনামে তাঁর 'পরিচয়' দিয়েছেন) যেদিন মৃদু হাস্য সহকারে প্রতিনমস্কার করেছেন সেদিন অষ্টাদশ-বর্ষীয় হিটলার

'আশার বাতাসে করি ভর ফিরে যেত আডল্‌ফ্ কুটিরে'

আর যেদিন প্রিয়া সঙ্গের আর্মি-অফিসার উমেদার নাগরের প্রতি ঈষৎ সম্মোহিত বলে হিটলারের প্রতি ভ্রূ-কুঞ্চিৎ করতেন সেদিন হিটলার—ইংরিজিতে যাকে বলে 'saw red', অর্থাৎ তিনি মহাপ্রলয় ডেকে এনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট করার জন্য সেই শিঙাটি খুঁজছেন। বাল্যবন্ধু বলছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে কী চিৎকার! অভিসম্পাত দিচ্ছে সবাইকে, আর বিশেষ করেই ঐ হতভাগা 'আর্মি-র পাপাত্মা অফিসারদের'[৩] বন্ধু বলছেন, বুর্জুয়া

৩ ঐ সময় থেকেই হিটলার আর্মি-অফিসারদের ঘৃণা করতে আরম্ভ করেন বললে হয়তো অত্যুক্তি তথা 'বিনা যুক্তিতে সমস্যাকে অত্যধিক সরল করে ফেলা'র—ওভার-সিম্প্লিফিকেশন—অকর্ম করা হবে। তবে এ-কথা সত্য, পরবর্তীকালে জর্মন আর্মি ছিল তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় প্রতিষ্ঠান—except the army officers, এবং এটাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে আত্মহত্যা করার ঠিক ২২ ঘণ্টা পূর্বে তিনি তাঁর জীবনের যে সর্বশেষ পত্র লেখেন সেটি আর্মির

সম্প্রদায়ের প্রতি হিটলার অতি বাল্য বয়স থেকে সমস্ত সত্তা দিয়ে নিকৃষ্টতম ঘৃণা প্রকাশ করতেন—এবং বিশেষ করে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সম্রাট-সেনাবাহিনীর অফিসারদের এবং তাদের উদ্ধত ভাব, দাম্ভিক আচরণের প্রতি—যত্রতত্র সর্বোত্তম সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু, আদর-আপ্যায়ন যেন তাঁদেরই সর্বপ্রথম প্রাপ্য, যেন স্বর্গ থেকে স্বয়ং সেন্ট পীটার স্বহস্তে তাঁদের জন্যে সে শাহ্-ইন্-শাহী ফরমান লিখে দিয়ে নিজেই ধন্য হয়েছেন—এই ভাব।[৪]

সর্বপ্রধান কর্তা—অবশ্য তাঁর পরে—কাইটেল্‌কে। সে চিঠির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জর্মন আর্মি-অফিসারমণ্ডলীকে, আমাদের ভাষায় যেন পৈতে ছিঁড়ে, 'উচ্ছন্ন যাও, উচ্ছন্ন যাও' বলে ব্রহ্মশাপ দেওয়া। সে পত্রে তিনি বলেন, 'গত (প্রথম) বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাই, এ যুদ্ধের জর্মন অফিসার-গণের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের অফিসারদের কোনো তুলনাই হয় না। এ যুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে সংগ্রামকারী জোয়ানদের সাফল্যের তুলনায় অফিসারগণ যেটুকু সামান্য করতে পেরেছেন সেটা জোয়ানদের কর্মসিদ্ধির তুলনায় তুচ্ছ।'

৪ হিটলারের খাস চাকর—valet—ছিলেন জনৈক হাইন্‌ৎস লিঙে। ইনি হিটলারের জামাকাপড় দুরুস্ত রাখা, ওষুধপত্র হামেহাল হাজির রাখা এসব শত কাজ তো করতেনই—এমন কি ইভ্‌নিং-ড্রেস পরার সময় বো-ওটি তিনিই বেঁধে দিতেন। কিন্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ—এবং গরিমাময় কর্মও বটে—জর্মনির ফ্যুরার ও তার প্রিয়া এফার বিছানা তৈরী করা। একদা তিনি দুজনকে এমন অবস্থায় পান—হিটলার ব্যত্যয়-বিহীন অভ্যাসমত মাত্র সেই এক দিন দোরে চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন—যে তাঁর চাকরি যাবার যোগাড় হয়েছিল। এই কর্মের জন্যে তাঁকে বাছাই করা হয় হিটলারের অতিশয় খাস সেনাবাহিনীর (এস্. এস্=শুৎস্‌স্টাফেল) সর্বশ্রেষ্ঠ এক হাজার সৈন্য থেকে। প্রভুকে পূর্ণ দশটি বছর সেবার পর যখন হিটলার মিত্রশক্তির নিপীড়নে বার্লিনে প্রায় অবরুদ্ধ হতে যাচ্ছেন তখন অবশ্য মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য হিটলার তাঁকে ডেকে আপন পরিবারে চলে যাবার অনুমতি দেন। প্রভুভক্ত লিঙে যাননি। ফলে হিটলারের শেষ পর্বের আত্মহত্যার বুলেটশব্দ পর্যন্ত তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনতে পান, তাঁর মৃতদেহ চিতাস্থলে বয়ে নিতে যেতে, চিতাতে অগ্নিসংযোগ করতে সাহায্য করেন। এফাও এঁকে বড়ই বিশ্বাস করতেন এবং প্রাণের কথাও খুলে বলতেন।

হিটলারের ভূগর্ভস্থ, বিরাটতম বোমার আক্রমণেও নিরাপদ 'বুঙ্কার' তিনি প্রভুর শবদাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরিত্যাগ করেননি। সে কর্ম সমাধান করে তিনি যখন রুশ সেনানী ভেদ করে—রাশানরা তখন বুঙ্কার থেকে তিনশ গজ দূরে—মার্কিন অধিকৃত এলাকায় আপন পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করেন তখন বার্লিনেই রুশদের হাতে বন্দী হন। পূর্ণ দশটি বৎসর তিনি ঐ দেশের ডাকসাইটে সব কারাগারে—(কিছুকালের জন্য সাইবেরিয়া বাস করে তিনি বিশ্ববন্দীমণ্ডলীতে যেন সোনার তাজ পেয়েছেন!)—বহু

পুষ্পোৎসবের প্রভাতে হিটলার তাঁর সর্বোত্তম সজ্জা পরে পথপার্শ্বে অপেক্ষা করছেন, তাঁর প্রিয়ার জন্যে, তিনিও আসবেন শব্দার্থে পুষ্পরথে, পুষ্পাভরণ পরিধান করে। সময় যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। অবশেষে তিনি এলেন। হিটলার হ্যাট তুলে অন্যদিনের তুলনায় প্রচুরতর সসম্ভ্রম অভিবাদন জানালেন। সেই ভিড়ের মধ্যেও প্রিয়া তাঁকে লক্ষ্য করে তাঁর হাতের পুষ্পগুচ্ছ থেকে একটি ফুল তুলে নিয়ে তাঁর দিকে ছুঁড়ে ফেলে প্রসন্ন মৃদুহাস্য করলেন।

সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে—বরঞ্চ বলা ভালো 'সে মহালগনে' তিনি সপ্তম স্বর্গেও যেতে সম্মত হতেন না—হিটলার বাড়ি ফিরলেন।

এই চার বৎসরের ভিতর হিটলার ঐ তরুণীটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তাঁর সখার কাছে, তিনিও যতখানি পারেন উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু হিটলার তাঁর কোনো উপদেশ, কিংবা নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী কোনো কৌশলই হাতে-কলমে ফলপ্রসূ করার চেষ্টা দেননি! এ বড় আশ্চর্যের কথা। এ নিয়ে প্রাগুক্ত জীবনীকার বিস্তর গবেষণা, বিস্তর চিন্তা করেছেন, কিন্তু এস্থলে তার স্থানাভাব এবং ঈষৎ অবান্তর বলে বর্জন করতে অনিচ্ছায় বাধ্য হলুম। শান্তি, সময় ও সুযোগ পেলে পরে চেষ্টা করবো। কারণ যদিও দুজনাতে কোনো কথা হয়নি, পত্র-বিনিময় পর্যন্ত হয়নি, তবু ঘটনাটি সত্যই চিত্তাকর্ষণ করে—কারণ হিটলার তাঁর 'স্বর্গীয় প্রেমে'র অভিব্যক্তি, প্রিয়াকে এক শুভদিনে দাম্পত্য বন্ধনে বন্ধন করার শুভেচ্ছা, সবই বন্ধুকে বলতেন। গৃহনির্মাণের স্কেচ আঁকাতে হিটলার সেই তরুণ বয়সেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন (ফ্যুরার রূপে পরবর্তী জীবনে তিনি শতকর্মের মাঝখানে, এমন কি আত্মহত্যার কয়েক দিন পূর্বেও বহু অভূতপূর্ব বিরাট প্রাসাদ, সৈন্যদের জন্য য়ুনিফর্ম, মেডেল, নৌবহরের জন্য সাবমেরিন ইত্যাদি নানা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর স্কেচ করেছেন এবং প্রায় সব স্কেচই কর্মে পরিণত করা হয়েছিল) এবং তাই

যন্ত্রণা ভোগ করে ১৯৩৪-এ পশ্চিম বার্লিনে ফিরে আসেন। এসেই তিনি হিটলার সম্বন্ধে প্রচলিত বহুবিধ গুজোব বিনাশার্থে একখানা চটি বই লেখেন। তার এক স্থলে আছে, বিদেশের কোনো হোমরা-চোমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁব পদলেহন করার পর তিনি অতিশয় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, 'দেখলে লিঙে (ইনি কোনো কোনো সময় অভ্যাগতের জন্য পানাদি নিয়ে যেতেন—লেখক), ব্যাটারা কি রকম গত যুদ্ধের সামান্য এক জোয়ানের (হিটলার কর্পোরেল ছিলেন) সামনে হাঁটু নিচু করছে। আর বিদেশী কোনো জঙ্গীলাট হলে তো কথাই নেই। বস্তুত হিটলার প্রকৃত মহান পুরুষদের মত এসব 'বুর্জুয়া স্নব'দের উপেক্ষা না করে তাদের 'সাষ্টাঙ্গ প্রণামে' পরিতৃপ্ত হতেন—যেন তাঁর তরুণ বয়স ও যৌবনকালের আহত আত্মাভিমান সান্ত্বনা-প্রলেপ পেয়ে বেদনা দাগটা (তখনো!) লাঘব করে দিত। লিঙে সম্বন্ধে আমি 'হিটলারের শেষ দশ দিন' নামক প্রবন্ধে, 'দু-হারা' গ্রন্থে ঈষৎ সবিস্তার লেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

বিবাহের পর যে ভবনে কপোতকপোতী বাস করবেন তার অসংখ্য স্কেচ আঁকতেন হিটলার সমস্ত দিন ধরে।

হিটলার যখন স্কেচের উচ্চতম নভলোকে উড্ডীয়মান তখন কিন্তু তাঁর সখা, জীবনী-লেখক প্রখর ব্যবসায়-বুদ্ধিধারী—তাঁর পিতাও ব্যবসায়ী—ঘোর বস্তুতান্ত্রিক গুস্তাফ্—এক কথায় স্বপ্নলোকনিবাসী ডন কুইক্সোটের যেমন হুবহু উল্টো কড়া সংসারী তামসিক সাংকো পান্জা, এস্থলে হিটলারের সাংকো পান্জা ভিন্ন গোত্রের বসওয়েল, স্কেচের পাশে দাঁড়িয়ে বলতো, 'হুঃ! সবই বুঝলুম, কিন্তু সেই বস্তুটি টাকা!' তিনি জানতেন হিটলারের বৃদ্ধা মাতার অতি ক্ষুদ্র পেনশন ভিন্ন সে পরিবারে একটি কানাকড়িরও আমদানি ছিল না।

হিটলার স্বপ্নভঙ্গে বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'আখ্, তোমার শুধু টাকা, টাকা!'[৫]

কিন্তু এ কাহিনী এখানেই থাক। আমি শুধু ভাবি, কবিসম্রাট দান্তের কথা।

৫ আসলে কিন্তু এই সখা অতিশয় সদাশয় ভদ্র নির্লোভ ব্যক্তি। ওঁদের বয়েস যখন প্রায় কুড়ি (১৯১০।১১ গোছ) এবং একসঙ্গে একই কামরায় ভিয়েনায় বাস করতেন তখন হিটলার দৈন্যপঙ্কে নিমজ্জিত হতে হতে শেষটায় এমন অবস্থায় পেঁছিলেন যে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী সখা গুস্তাফকে বিব্রত না করার জন্যে—হিটলার আম্ত্যু ছিলেন এমনই আত্মাভিমানী, touchy, যেটাকে নিশ্চয়ই morbid বলা চলে—একদিন সখাকে কিচ্ছু না বলে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলেন। তার প্রায় ২৫ বৎসর পর হিটলার লোকচক্ষের সম্মুখে রাজনৈতিক নেতারূপে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছেন, তখন গুস্তাফ্ খবরের কাগজ মারফৎ তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতে পারলেন। তারপর ১৯৩৩-এ যখন হিটলার চ্যান্সেলর হলেন তখন দীর্ঘ ২৩ বছর পর গুস্তাফ্ তাঁকে চিঠি লিখলেন। উত্তরও পেলেন। ১৯৩৪-এ হিটলার অস্ট্রিয়া দখল করে যখন বিজয়ী বীরের মত লিন্ৎসে পেঁছিলেন তখন দুই সখাতে দেখা হল। গুস্তাফ্ ছোট্ট সরকারী চাকরি করতেন এবং অল্পেই সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলেন বলে হিটলারের big offer তিনি গ্রহণ করলেন না। তবে প্রতি বছর দু'একবার হিটলারের নিমন্ত্রণে প্রধান প্রধান সঙ্গীতের জলসা-উৎসবে একসঙ্গে যেতেন। বস্তুত হিটলারের সর্বজীবনীকার একবাক্যে বলেছেন, গুস্তাফই একমাত্র হিটলার-সখা যিনি তাঁদের বন্ধুত্ব পৌণ্ড শিলিঙে পরিবর্তিত করেননি। জলসাতে যে যেতেন তার একমাত্র কারণ এক জলসাতেই আপন ছোট শহরে তাঁদের প্রথম পরিচয় হয়—সঙ্গীতই ছিল উভয়ের প্রাণতুল্য প্রিয়। গুস্তাফের ভদ্র আত্মবিসর্জন কতখানি, পাঠক এর থেকেই বুঝতে পারবেন যে তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন সঙ্গীত, কিন্তু সে পথে সুযোগ না পেয়ে একটি ছোট্ট দফতরে চাকুরি নেন। হিটলার তাঁকে বলেন, 'যেখানে খুশী বলো, আমি সরকারী সঙ্গীতালয়ে তোমাকে প্রধান সঙ্গীতচালক করে দিচ্ছি। তুমি পাবে, সর্বসময়, সর্বাবস্থায় আমার প্রটেক্শন্!' গুস্তাফ্ সে লোভও সম্বরণ করেন।

তাঁর প্রিয়া বেয়াত্রিচে সখীজনসহ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শুধু একবার মাত্র প্রেম-বিহ্বল কবির দিকে স্মিতহাস্য করেছিলেন। আরেকবার পুষ্পের জন্য বিখ্যাত ফ্লরেন্স্ (flora) নগরীর পুষ্পোৎসবে যখন সবাই সবাইকে পুষ্পোপহার দিচ্ছে, এমন কি অচেনা জনকেও, তখন—হয়তো—কিছুমাত্র না ভেবেচিন্তেই প্রেমোন্মাদকে একটি ফুল এগিয়ে দেন। ব্যস্! আর তো কিছু জানবার উপায় নেই। তাই বোধ হয়, তথ্য যেখানে যত কম, কিংবদন্তী সেখানে, সেই অনুপাতে তত বেশী। সেই শত শত কিংবদন্তীর মাঝখানে একটি সত্য প্রোজ্জ্বল : দান্তের সুপ্ত কবিসত্তা তাঁকে সচেতন করে দিয়ে বলল, 'তোমার প্রেমে আর এই নগরীর শত শত প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে পার্থক্য কোথায়?' বিনয়ভরে যেন সেই পরমাত্মার সম্মুখে মস্তক নত করে দান্তে রচনা করলেন তার 'স্বর্গীয় কাব্য' (দভীনা কম্মেদিয়া = ডিভাইন কমেডি)।

দান্তে আপন জন্মের নগর থেকে বিতাড়িত হন—রাজনীতির জুয়াখেলাতে হেরে গিয়ে। হিটলার স্বেচ্ছায় (বা অনিচ্ছায়) স্বদেশ অস্ট্রিয়া ত্যাগ করে জর্মনি গিয়ে সেখানে পূর্ণ বারোটি বৎসর 'রাজমুকুট' পরার পর নিজ হাতে আপন প্রাণ নিলেন। আমি শুধু ভাবি হিটলার যদি রাজনীতিতে দান্তের মত নিষ্ফল হতেন তবে হয়তো তিনিও তাঁর বেয়াত্রিচেকে কাব্যলক্ষ্মীর স্বর্ণমন্দিরে অজরামর করে রেখে যেতেন, অবশ্য নরদানব হিটলার নিশ্চয়ই দান্তের ইন্‌ফেরনো (নরক) অধ্যায়টা লিখতেন বেশী ফলাও করে। কিংবা হয়তো কাব্যলক্ষ্মীর জন্য নবীন মন্দির নির্মাণ করে—স্থাপত্যেই হিটলারের সর্বাধিক প্রতিভা ছিল, এ সত্য তাঁর শত্রুমিত্র সবাই স্বীকার করেন।

পূর্ণপ্রেম

ভিয়েনাতে সর্বপ্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ নিষ্ফলতা অর্জন করে হিটলার দেশত্যাগ করে চলে গেলেন জর্মনির বাভারিয়া প্রদেশের প্রধান নগর ম্যুনিকে। সেখানেও তিনি বেকার, এমন সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেলে তিনি স্বেচ্ছায় জর্মন সৈন্যবাহিনীতে জওয়ান রূপে প্রবেশ করলেন। যুদ্ধশেষে ম্যুনিকে ফিরে এসে জওয়ানদের কী যেন এক কালচারাল বা ঐ জাতীয় অস্পষ্ট কি এক ট্রেনিং দেবার জন্য নিযুক্ত হলেন। এই সময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন, সরস্বতী তাঁর রসনায় বিরাজ করেন তাঁকে একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বক্তারূপে জনসমাজের অভিনন্দন গ্রহণ করাবার জন্য। এই সময় ম্যুনিক শহর রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত্যায় বিক্ষুব্ধ। অসংখ্য রাজনৈতিক দল, এবং রাস্তায় রাস্তায় গণবিক্ষোভের কোলাহল। হিটলার এরই একটার সদস্য হলেন। যে দলের সভ্যসংখ্যা দশ হয় কি না হয়! ১৯১৯ থেকেই তিনি এই দল (National Sozialictiche Deutsche Arbeitspartei—এরই প্রথম শব্দের Na এবং দ্বিতীয় শব্দের zi নিয়ে বিপক্ষ বা নিরপেক্ষ দলের অজানা কে একজন Nazi—নাৎসি নামকরণ করে) গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন, অচিরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ

করলেন, এবং বাভারিয়া প্রদেশের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক কম্যুনিস্টবৈরী রূপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দুসরা জঙ্গীলাট, পয়লা নম্বর হিণ্ডেনবুর্গের (ইনি পরবর্তী যুগে জর্মনির প্রেসিডেণ্ট হন) সহকর্মী জেনারেস এরিষ্ লুডেন্‌ডর্ফের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিন-চার বৎসর যেতে না যেতে পার্টির সভ্যসংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় হিটলারের এতখানি শক্তিসঞ্চয় হল যে তিনি সবলে বাভারিয়া প্রদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপ্রমুখদের অপসারণ করে প্রদেশের রাজ্যভার গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন—এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হল। এই উদ্দেশ্যে লুডেন্‌ডর্ফকে পুরোভাগে নিয়ে এই ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি সদলবলে প্রধান রাজকার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হলেন। রক্ষীরা গুলি ছোঁড়াতে সমস্ত দল পালালো, স্বয়ং হিটলার কিঞ্চিৎ আহত হলেন (কিন্তু বন্দুকের গুলিতে নয়), কিছুদিন পর, রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে পাঁচ বছরের জেল হল। কিন্তু ইতিমধ্যে এবং বিশেষ করে কারাবাসের সময় তিনি ম্যুনিক তথা বাভারিয়া প্রদেশের সর্বত্র এমনই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন, (এবং তথাকার সরকার ইতিমধ্যে কম্যুনিস্টদের শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্তি দেখে, রীতিমত শঙ্কিত হয়ে 'কণ্টক দ্বারা কণ্টক উৎপাটনার্থে') হিটলারকে অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই, অর্থাৎ ১৯২৩ সালেরই ডিসেম্বর মাসে এবং শুভেচ্ছার প্রতীক রূপে বড়দিনের অল্প কয়েকদিন পূর্বে কারামুক্ত করে দিলেন।

হিটলার নবোদ্যমে ইতিমধ্যে নেতার অভাবে দ্বিখণ্ডিত পার্টিকে দিনে দিনে শক্তিশালী করে তুলতে লাগলেন।

রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে হিটলার সম্বন্ধে কোনো কিছু বললে সেটা যথেষ্ট বোধগম্য হয় না বলে সংক্ষেপে কয়েকটি বৎসরের বর্ণনা দেওয়া হল।

এখন প্রশ্ন ইতিমধ্যে হিটলার আর কাউকে প্রেম নিবেদন করেছিলেন কিনা। ভিয়েনায় এসে হিটলার কিছুদিন তাঁর বন্ধুর মারফতে উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁর প্রিয়ার (লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন 'স্তেফানি') খবর নিতেন। তারপর সেই বন্ধু, গুস্তাফও ভিয়েনায় এসে একই কামরায় বাসা বাঁধলেন। স্তেফানি হিটলারের তুলনায় বহু উচ্চবংশের কন্যা। পাত্র হিসাবে হিটলারের চেয়ে অযোগ্যতর পাত্র তখন বোধ হয় লিন্‌ৎস শহর খুঁজলেও দ্বিতীয়টি পাওয়া যেত না। ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠার পূর্বেই সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, জাতে প্রায় মজুর শ্রেণীর, অর্থসম্বলে প্রায় 'ধনুর্গুণ ভক্ষণে'র অবস্থা। হিটলার ভিয়েনা থাকাকালীন স্তেফানির বিয়ে হল সুযোগ্য বরের সঙ্গে। হিটলার সে খবর কখন পেয়েছিলেন—আদৌ পেয়েছিলেন কিনা, কারণ বন্ধু গুস্তাফ্ তাঁর সঙ্গে তখন ভিয়েনাতে এবং এঁদের দুজনার পরিবারের কেউই স্তেফানিকে চিনতেন না—এ সম্বন্ধে সব ঐতিহাসিকই নীরব।

কারণ তখন হিটলার বিরাট ভিয়েনা শহরের ঘূর্ণাবর্তে প্রায় বিলীন হবার উপক্রম!

কিন্তু এস্থলে তাঁর স্থাপত্য শিক্ষালয়ে প্রবেশ করতে অক্ষম হওয়া, তাঁর নিদারুণ দৈন্য, পাবলিক লাইব্রেরি থেকে অবিচারে নানা জাতের বই এনে সে-গুলো গোগ্রাসে ভক্ষণ—এর কোনোটাই আমাদের বিষয়বস্তু নয়। আমরা জানতে চাই, ওয়াইন-উইমিন-সং—মদ্যমৈথুনসঙ্গীত—এই তিন বস্তুতে যে রাজসিক প্রিয়দর্শন ভিয়েনা নগর প্যারিসের সঙ্গে পাল্লা দিত, উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে তো বহু পূর্বে সে প্যারিসকে ছাড়িয়ে গিয়েই ছিল, সেই ভিয়েনাতে নারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিটলারের কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল কিনা।

গুস্তাফ্ দৃঢ়কণ্ঠে বলছেন, যতদিন হিটলার তাঁর সঙ্গে বাস করেছেন তত-দিন ওদিকে তাঁর কণামাত্র উৎসাহও তিনি কখনো দেখেননি। বস্তুত দীনবেশে সজ্জিত হলেও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনরত সন্ন্যাসীর চোখেমুখে যে দীপ্তি পথিক-জনেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ভিয়েনার ভদ্র, দৌম ম'দেন, গণিকাদের চোখেও সেটা ধরা পড়তো হিটলারকে দেখে। এবং তরুণ হিটলারের দিকে কটাক্ষনয়নে তাকিয়ে বিশেষ ইঙ্গিতও দিত। সাদামাটা, কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত গুস্তাফ্ সেদিকে হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি তাঁর বাহু ধরে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলতেন, 'চল, চল, গুস্‌ৎল্, বাড়ি চলো।'

পূর্বেই বলেছি তারপর তিনি উধাও হলেন।

সেই ১৯০৮ থেকে ১৯১৯।২০ পর্যন্ত যে যা-কিছু লেখেন তার পনের আনা কাল্পনিক। অবশ্য ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হিটলার যখন জওয়ানরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে, তাঁর সম্বন্ধে সে সময়কার খবর সরকারী কাগজ-পত্রে রয়েছে, কিন্তু সেগুলো আমাদের কাছে অবাস্তব।

বস্তুত এ-কথা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ১৯০৮ থেকে ১৯২৫।২৬ পর্যন্ত কোনো রমণী তাঁর উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।[৬]

---

৬ এমন কি পরবর্তী কালে এফা ব্রাউনও না।

এস্থলে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করি। ১৯৪১ এর গ্রীষ্মকালে হিটলারের সেনাদল যখন বীরবিক্রমে জয়ের পর জয় লাভ করে মস্কোপানে এগিয়ে চলেছে তখন তিনি প্রতিদিন লাঞ্চ-ডিনারের পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন। ১৯৪২-৪৩-এর শীতে স্তালিনগ্রাদের পরাজয়ের পর জেনারেলদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি শুধু তাঁর মহিলা সেক্রেটারি-স্টেনোদের সঙ্গে খেতেন। (এফার হেডকোয়ার্টার্সে আসার অনুমতি ছিল না। হিটলার সময় পেলে বের্ষটেশগাডেনের বাড়ি বের্গ-হফে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন) কিন্তু ঐ ১৯৪১।৪২ এক বা দেড় বৎসর তিনি যে-সব গালগল্প করেছেন সেটি লিখে রাখা হয়েছিল স্টেনোদের দ্বারা। প্রকাশিত হয়েছে 'হিট্‌লার্‌স্ টেবিল-টক' শিরোনামায়। প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার কেতাব। এ-পুস্তকের বহুস্থলে পাওয়া যায় রমণীজাতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত। কিন্তু ভিয়েনা বাসকালীন কিংবা ১৯২৫।২৬ পর্যন্ত তিনি যে কোনো রমণীকে কাছের থেকে চিনতে পেরেছেন, এর কোনো ইঙ্গিত নেই। অবশ্য এ-দ্বারা কোনো কিছু নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় না।

পরিচয় হয়েছিল তাঁর বহু রমণীর সঙ্গে—একে ভিয়েনায় তাঁর যৌবনের বেশ কিছুকাল কেটেছে, যে-ভিয়েনা রমণীজাতিকে খাতির করতে তার সঙ্গে প্রেমে পড়ার জন্য সর্বক্ষণ সচেতন, কিংবা 'অচৈতন্য', দুটোই বলতে পারেন, এক কথায় ভিয়েনা গ্যালান্ট নগর—তদুপরি ১৯২২ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত তিনি ম্যুনিকের রাজনৈতিক আকাশে অন্যতম জ্যোতিষ্মান গ্রহ, কম্যুনিস্টদের মোকাবেলা করতে পারেন একমাত্র তিনি, রাস্তাঘাটে নাৎসি আর কম্যুনিস্ট দলে প্রায় প্রতিদিন মারামারি হয় এবং উভয় পক্ষে কয়েকটা গুপ্ত প্রকাশ্য খুনও হয়ে গিয়েছে—এ সবার নেতা তো বীর্যবান না হয়ে যায় না। তদুপরি মহিলাদের প্রতি কি প্রকারের ব্যবহার করতে হয়, তাদের প্রতি ব্যবহার্য সব আদব-কায়দা-এটিকেট-গ্যালানট্রি তিনি জানেন—ভিয়েনাতে অবশ্যই তার বেশীর ভাগ তিনি দেখে শিখেছিলেন, কিন্তু হিটলারের মত অসাধারণ জিনিয়াসের পক্ষে সেইটে যথেষ্টর চেয়েও ঢের বেশী। এবং সর্বশেষ কথা, তাঁর যে একটা ম্যাগনেটিক চার্ম—চৌম্বিক আকর্ষণ শক্তি ছিল সেটা তো জর্মন ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বহু বিদেশী রমণীও বলেছেন।

আমি পূর্বেই নিবেদন করেছি, হিটলার-জীবনে প্রেম হাফ প্লাস ওয়ান প্লাস হাফ।

স্তেফানির প্রতি তাঁর প্রেম প্রথম হাফটা, শেষ হাফটা এফা ব্রাউন, যাঁকে তিনি শেষ মুহূর্তে বিয়ে করেন এবং সেই সূত্রে পৃথিবীর বহুলোক এ প্রেমের খবর পায়। কিন্তু আমরা এস্থলে যে দৃষ্টিবিন্দু—অর্থাৎ প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে—হিটলারকে দেখছি, সেভাবে কেউ দেখেননি, লেখেননি। হয়তো সেই হাফটি এস্থলে আগে বর্ণনা করে মাঝখানের ফুল ওয়ানটিতে গেলে ভাল হত, পাঠক পুরো পার্সপেক্টিভ পেতেন, কিন্তু শেষটায় অনেক চিন্তা করে দেখলুম বিশেষ কারণ না থাকলে এ ধারার খেলাতে কালানুক্রমিক অগ্রসর হওয়াই প্রশস্ত (সিনেমার ফ্লাশবেক কিংবা ফ্লাশ ফরওয়ার্ড টেকনিক অবশ্য আজকাল বড়ই জনপ্রিয়)। দ্বিতীয়, এফার সঙ্গে হিটলারের সর্বশেষ প্রেম ১৯৩৯-৪৫এর যুদ্ধাদি দ্বারা এতই বিক্ষুব্ধ যে বহু অবান্তর নরনারীকে সেখানে টেনে এনে প্রবন্ধর কলেবর বাড়াতে হয়। তৃতীয়ত, অনেকেই সে-প্রেম সম্বন্ধে অল্পবিস্তর পড়েছেন বলে স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে মূল ঘটনাগুলো শুধু আবার তাঁরা শুনতে পাবেন মাত্র—অর্থাৎ, সে প্রেম বর্ণাতে হলে পূর্ণ পুস্তকের প্রয়োজন।

এস্থলে নিবেদন করা কর্তব্য মনে করি, রমণীর প্রতি পুরুষের একনিষ্ঠ প্রেম এদেশের এবং ওদেশের বহু কাব্যকাহিনীতে আছে কিন্তু বাস্তবে যদ্যপি যে কোনো কারণেই হোক। কুলীন প্রথার কথা তথা শ্রীকৃষ্ণ বা দশরথের কথা এস্থলে স্মরণে আনছি নে। আমরা আজ এদেশে একদারনিষ্ঠতাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখি, ইয়োরোপে বহুকাল যাবৎ একই রমণীকে আজীবন পুজো করার বিশেষ মূল্য দেয়নি। অতএব পাঠক যেন স্তেফানির কথা স্মরণে এনে হিটলারের

সর্বমহৎ, সর্বগ্রাহী প্রেমকে তার যথোপযুক্ত সম্মান দিতে কুণ্ঠিত না হয়।

ঠিক কোন্ সালে সে প্রেমের সূত্রপাত হয় সে কথা তাঁর অন্তরঙ্গতম ব্যক্তিও জানেন না—যদিও আমার সুদৃঢ় অচল বিশ্বাস, বয়সে পরিণত হওয়ার পর তিনি কারুর সঙ্গেই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব স্থাপন করেননি, ফোটোগ্রাফার হফ্‌মান ছিলেন তাঁর একমাত্র নিত্যালাপী বিদূষক—তবে নিশ্চয়ই ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্বে।

ইতিমধ্যে হিটলারের একটি বিশিষ্ট স্বভাবের উল্লেখ না করলে সে প্রেমের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

পূর্বেই নিবেদন করেছি মোটামুটি ১৯২৭, পাকাভাবে বলতে গেলে তার দু'তিন বছর আগের থেকেই হিটলার মুনিকাঞ্চলে এমনই প্রখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই তাঁর চতুর্দিকে ভিড় জমে যেত। দিনের পর দিন বিশাল জনতার সামনে তিনি ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা দেশের দুঃখদৈন্যের নিদারুণ বর্ণনা দিচ্ছেন, বিশেষ করে শিশু পুত্রকন্যার জন্য আহার বসন সংগ্রহার্থে মা-জননীদের কঠোর সংগ্রাম (মেয়েরা দু হাত দিয়ে মুখ চেপে কাঁদলেও তার সম্মিলিত ধ্বনি হিটলারকে কখনো কখনো পুরো দু-তিন মিনিট বক্তৃতা বন্ধ করতে বাধ্য করতো) এবং সমসাময়িক রাষ্ট্রনায়কের ক্লৈব্য তথা পাপাচার (করাপশন) নিয়ে তাঁর সুতীক্ষ্ন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—এবং সর্বোপরি তাঁর আত্মবিশ্বাস, তাঁর আশাবাদ যে তিনিই মেসায়া (কল্কি, যিনি পুনরায় পৃথিবীতে ধর্মস্থাপনা করবেন) তিনিই ভের্সাঈ ডিকটাট্ (ডিকটাট্—ডিক্‌টেশন থেকে, অর্থাৎ ক্রীতদাসদের প্রতি যে কোনো অন্যায় পশুবলপ্রযুক্ত অলঙ্ঘ্য আদেশ, যে আদেশ পালন না করলে আদিষ্ট ব্যক্তিকে সবংশে নির্বংশ করা হবে এবং জর্মন রাষ্ট্র থেকে সমূলে উৎপাটিত করা হবে) ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জর্মনিকে পুনরায় সার্বভৌম এবং ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নেশানরূপে পরিণত করবেন।[৭]

ব্যক্তিগত জীবনেও হিটলার আর কাউকে আমল দিতেন না। প্রায় প্রতিদিনই তিনি তাঁর প্রিয় তিনটে কাফের একটাতে কয়েকজন বন্ধুসহ বসতেন। কিন্তু আমরা যাকে বলি আড্ডা মারা, কিংবা গালগল্প করা—যে কর্মে ভিয়েনা বাঙ্গালীর চেয়েও এক কাঠি সরেস—এবং যে ভিয়েনায় হিটলার প্রথম যৌবন কাটান—সেটি হত না। হিটলার ভিয়েনাতে অনেক কিছু শিখেছিলেন, শুধু এই সমাজনন্দন আচরণটি রপ্ত করতে পারেননি। সর্বক্ষণ তিনিই কথা বলতেন, একমাত্র তিনিই।

এসব মণ্ডলীতে মহিলাদের নিরঙ্কুশ 'প্রবেশ নিষেধ' না হলেও তাঁদের মাত্র

---

৭ হিটলারের বক্তৃতা দেবার ভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লেখা যায়—লেখক তাঁর বহু বক্তৃতা শুনেছে। এ বাবদে একটি অত্যুত্তম—সর্বোৎকৃষ্ট বললেও অত্যুক্তি হয় না—পরিচ্ছেদ লিখেছেন জর্নলিস্ট মার্কিন মাউরার তাঁর 'জর্মনি পুট্‌স্ দি ক্লক ব্যাক্' পুস্তিকায়।

দু'একজন আহ্বান পেতেন অতিশয় কালেভদ্রে। হিটলার ভিয়েনার কায়দায় তাঁদের হস্তচুম্বন করতেন (যদিও জর্মনিতে তখন সেটা বিলকুল আউট্ অব্ ডেট্), তাঁদের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখতেন, সামান্য হাঁ, হুঁ কিংবা অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে দিতেন, কিন্তু একটা দিকে তিনি কঠোর কঠিন দৃষ্টি রাখতেন, কোনো রমণী যেন ভ্যাচর ভ্যাচর করতে আরম্ভ না করে—তা তিনি যত বুদ্ধিমতীই হোন, মাদাম পম্পাডুর, ইজাবেলা ডানকান, মাদাম দ্য স্তাল যেই হোন না কেন।

গেলীর প্রবেশ

সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়, অবিশ্বাস্য—অতিপ্রাকৃত বা মিরাক্‌ল্‌ই বলা যেতে পারে।

নিতান্ত একটা চিংড়ি (চ্যাংড়ার স্ত্রীলিঙ্গ) মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলেন হিটলার তাঁর অন্যতম কাফেতে। অতি ভদ্রভাবে সে সবাইকে নমস্কারাদি করলে। সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাজ্জব কি বাৎ। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে তাবৎ কথাবার্তা সে-ই বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে—ওদিকে এতই বিবেচনা ধরে, যে একে কথা বলতে দেয়, ওকেও কথা বলতে দেয়, কাউকে অস্বাভাবিক আড়ষ্ট হতে দেয় না—সবাই, ইংরিজিতে যাকে বলে ভেরি মাচ্ অ্যাট ঈজ—কিন্তু সব মন্তব্য, সব আলোচনা ঘুরে ফিরে যায় ঐ মেয়েটিরই কাছে।

আর অতিপ্রাকৃত, মিরাক্‌ল্ হল এই যে, স্বয়ং হিটলার চেয়ারে আরামসে হেলান দিয়ে সুমধুর পরিতৃপ্তির মৃদুহাস্য বদনমণ্ডলে ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছেন।

হিটলারকে যখনই তাঁর চেয়ে বয়সে বড় মুরুব্বীস্থানীয় পার্টি-মেম্বরেরা শুধোতেন, 'বয়েস তো হল, বিয়ে-শাদীর কথা—'

হিটলার বাধা দিয়ে বলতেন, 'জর্মনি আমার বধূ!'

ঠাট্টাছলে বললেও এর ভিতর যে অনেকখানি সত্য লুক্কায়িত আছে সে তত্ত্বের কিছুটা সে-সব মুরুব্বীরা জানতেন। নইলে এ-জাতীয় প্রশ্ন ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিরদরদ-নির্মিত শিখরবাসী হিটলারকে জিজ্ঞেস করবে কে? কারণ তাঁরা এবং পার্টির অন্য সবাই জানতেন, হিটলার জাত-ব্যাচেলার। তা সে ভিয়েনীজ কেতায় সুন্দরীদের সামনে যতই গ্যালানট্রি, শিভালরি দেখান না কেন, রমণী-দের কথা উঠলে টেবিলে দু'হাত রেখে, সুমুখের দিকে ঝুঁকে যতই সিরিয়াসলি তিনি কোথায় কোন্ সুন্দরী রমণী দেখেছেন, যে-বেভেরিয়াকে তিনি এত ভাল-বাসেন যে আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করে এখানে এসে স্থায়ী আবাস নির্মাণ করেছেন সেই বেভেরিয়া মায় তার মুনিক সুন্দরীর ব্যাপারে যে ভিয়েনার কাছেই আসতে পার না—এসব নিয়ে যত ধানাইপানাই তিনি করুন না কেন, পার্টির উঁচু মহলের প্রায় সবাই জানতেন যে হিটলারের পক্ষে কোনো সুন্দরীকে নিয়ে পার্টির অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর কিছুটা ঢলাঢলি বরঞ্চ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়, কিন্তু বিয়ে করে বউ কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর বাঁধবার মত মানুষ হের হিটলার

নন। মাঝে মাঝে তাঁকে এ মন্তব্যও করতে শোনা গেছে : 'সুন্দরীদের ভালোবাসবো না—সে কি ? আমি কি এতই রসকষবর্জিত আকাট ! যা বলুন, যা কন্ আপনারা তো জানেন, আমার সত্তার অন্তস্তলে যে পুরুষ লুকানো আছেন তিনি আর্টিস্ট ! এবং আমি ফুলও ভালোবাসি কিন্তু তাই বলে কি আমাকে বাগানের মালী হতে হবে ?' প্রায় এ সত্যটিই চার্লস ল্যাম্ বলছেন, 'আমার ঘরে ফুল নেই কেন, শুধোচ্ছেন ? আমি কি ফুল ভালোবাসি নে ? নিশ্চয় বাসি। অমি শিশুদেরও ভালোবাসি—তাই বলে তাদের মুণ্ডুগুলো কেটে ঘরের ভিতর ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখি নে।' আর এ বিষয়ে পরিপূর্ণ সত্যের শেষ শব্দটি বলতে হলে বাঙলা প্রবাদেরই শরণাপন্ন হতে হয়—'বাজারে যখন দুধ সস্তা তখন গাই পোষার কি প্রয়োজন ?'

পূর্বেই বলেছি, সত্যকার অন্তরঙ্গ বন্ধু হিটলারের কেউ ছিল না। তবু মোটামুটি যাঁকে বলা যেতে পারে তিনি তাঁর ফটোগ্রাফার হফ্মান। এঁকে তিনি এই প্রসঙ্গে খাঁটি বৈষয়িক তত্ত্বকথাটি বলেন, 'জর্মনিকে গড়ে তোলা আমার জীবনের একমাত্র কাম্য, আদর্শ। একবার আমার জেল হয়েছে, আবার যে কোনো মুহূর্তে আমার ছ'বছরের জেল হতে পারে। তখন বউ-বাচ্চা বাইরে, আমি গরাদের ভিতর। এটা কি খুব বাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি ?'

তবু বেশীর ভাগই এই নবাগতা সুন্দরী, ব্লণ্ডিনী, মধুরভাষিণী, আত্মসচেতন অথচ বিনয়ী মেয়েটিকে দেখে (এবং বিশেষ করে লক্ষ্য করে যে হিটলার কফি-চক্রের চক্রবর্তীর সম্মানিত আসন সানন্দে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন) ভাবলেন, তবে কি হিটলারের 'জর্মনি আমার বধূ' নীতিটি পরিবর্তন করার সময় এসেছে ?

মেয়েটির নাম আঙেলিকা রাউবাল। হিটলারের সৎবোনের মেয়ে—ভাগ্নী। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে সত্য কিন্তু তেমন কোনো অলঙ্ঘ্য আপ্তবাক্যপ্রসূত নিষেধ নেই।[৮] মেয়েটির মা বিধবা, সামান্য যে পেনসন পায় তাতে দুই কন্যাসহ জীবনযাপন সহজ নয় ; এদিকে যে ছোট বৈমাত্রেয় ভাই আডল্ফকে, তার বহু দোষ—তার মারাত্মক গোটা তিনেক পূর্বেই নিবেদন করেছি—থাকা সত্ত্বেও, তাকে ছেলেবেলা থেকেই গভীরভাবে স্নেহ করেছেন, সেই আডল্ফ, এখন স্বচ্ছল হওয়ার দরুণ আপন জন্মভূমি অস্ট্রিয়ার কাছেই—সীমান্তের লাগোয়া অঞ্চলে ম্যুনিক থেকে একশ মাইল দূরে বের্ষটেশগাডেনে বাড়ি কিনে তাঁকে অনুরোধ করেছে সীমান্তের এপারে এসে সে বাড়ির জিম্মা নিতে। বেচারা আডল্ফকে বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হয় ম্যুনিক শহরে রাজনীতি নিয়ে, সময় পেলে ঐ গ্রামের নূতন বাড়িতে গিয়ে যেন

---

৮ এই ভারতের অন্ধ্র অঞ্চলে হিন্দুসমাজে আপন সহোদরা ভগ্নীর মেয়েকে বিয়ে করা খুবই স্বাভাবিক, ও নিত্য নিত্য হয়। বস্তুত প্রথমেই মামাকে কন্যাদানের প্রস্তাব করতে হয়—যেন ন্যায্য হক তারই। সে রাজী না হলে অন্যত্র তার বিয়ে হয়।

একটুখানি আরাম পায়। তদুপরি এ তথ্য সর্বজনবিদিত যে আঙেলিকা রাউবালের মা, হিটলারের এই সৎবোনটি যেমন বাড়ি চালাতে জানে, অতিথি-সজ্জনের সেবা করাতে নিপুণা, তেমনি পাচিকা রূপে সমস্ত নগরীতে অতুলনীয়া।৯ স্বভাবতই সঙ্গে নিয়ে এলেন দুই মেয়েকে। এদের বড়টিই আঙেলিকা বা গেলী।

---

৯ হিটলার-পরিবারের কুলুজীটি দিশী-বিদেশী কোনো ঘটক-ঠাকুরেরই অমলানন্দের কারণ হবে না। প্রথমত হিটলারের (Hitler, Hiedler, Huetler, Huettler—আমাদের দেশের অল্পশিক্ষিত চাষাদের মত হিটলারের ঠাকুর্দারা নানাভাবে এ নাম বানান করেছেন ; স্বয়ং হিটলারের পিতা—তাঁর জন্ম জারজরূপে—সেকথা পরে হবে, গোড়াতে Hiedler এবং পরে Hitler বানান করেছেন) পিতা এবং মাতা উভয়েই দুই ভাই, অর্থাৎ হিটলার পদবী ধরেন এমন দুজনার বংশগত, এবং এই কারণে হিটলারের পিতা যখন তাঁর মাতাকে বিয়ে করেন তখন চার্চের পক্ষে থেকে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতামহ বিবাহ করেন Mari Anna Schicklgruber-কে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু তার পাঁচ বৎসর পূর্বে Schicklgruber একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন কুমারী অবস্থাতেই ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন। এই পুত্রই ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতা। এবং যেহেতু নবজাত শিশুর মাতা বিবাহিত নয় তাই রীতি অনুযায়ী তাকে দেওয়া হয় মাতা-মাতামহের পরিবারিক নাম Alois Schicklgruber। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, বিয়ের পরও পিতা তাঁর পুত্রের নাম Hiedler (তিনি এভাবেই বানান করতেন) —এ পরিবর্তন করার মেহন্নৎটুকু আপন স্কন্ধে তুলে নেননি। অবশ্য একথা যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনি বাতিলও করা যায় না যে Alois সত্যই ফ্যুরারের পিতামহ Johann Georg Hiedler-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা, তবে সে অঞ্চলের সাধারণজনের বিশ্বাস ছিল Alois-এর জন্ম Johann Georg-এর ঔরসেই। Alois-এর মাতা Maria ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মারা যেতেই Johann Hiedler অন্তর্ধান করেন। ত্রিশ বৎসর পর তিনি পুনরায় দেখা দিলেন এবং তিনজন সাক্ষী ও নোটারির (উকিলের) সামনে শপথ নিলেন যে, Alois Schicklgruber তাঁহাই ঔরসজাত পুত্র বটে। ঐদিন থেকে তাঁর নাম হল Alois Hitler (বা Hiedler)। ইনিও একাধিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর পিতারই মত। এদিক ওদিক বিস্তর ঘোরাঘুরির পর বিয়ে করেন শুল্ক বিভাগের এক পালিতা কন্যা Anna Glasl-Hoerer-কে। এ বিয়ে সুখের হয়নি। এবং এঁকে তালাক দেওয়ার পূর্বেই Alois 'বন্ধুত্ব' করেন কুমারী Franziska Matzelsberger-এর সঙ্গে। ফলে একটি পুত্রসন্তান হয়। এর নামও Alois। ইনিও জারজ ; পরে আইনতঃ পিতার নাম পান। এঁর পিতা তাঁর মাতা Franziska-কে বিয়ে করেন তাঁর তালাকপ্রাপ্তা প্রথম স্ত্রী Anna Glasl-Hoerer-এর মৃত্যুর পর। বিয়ের তিন মাস পর Franziska

মেয়েটি অসাধারণ সুন্দরী ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এর সম্বন্ধে এবং মামা আডল্‌ফের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ছিল সে সম্বন্ধে একাধিক লেখক আপন আপন মতামত দিয়েছেন। এর ভিতর দু'জন দুই মত পোষণ করেন, এবং পঁয়ত্রিশ বছর পর আজ সত্য নিরূপণ করা অসম্ভব। তবে দুজনাই একমত যে ঐ গেলী-ই হিটলারের 'ওয়ান গ্রেট লাভ্‌'! এঁদের একজন হিটলারের ফোটোগ্রাফার বন্ধু হাইনরিষ হফ্‌মান। হিটলারের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ইনি হিটলার সম্বন্ধে একখানা বই লেখেন। বইখানার নাম 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেন্ড' (ইংরিজি অনুবাদ)। বলা বাহুল্য যে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দেও তিনি সব কথা প্রাণ খুলে বলতে পারেননি, তবে এ-কথা সত্য, সব তত্ত্ব—গ্যাস চেম্বারে ইহুদী পোড়ানো ইত্যাদি—জেনে-শুনেও তিনি হিটলারের নিন্দার চেয়ে প্রশংসাই করেছেন বেশী—তবে এ কথাও বলে রাখা ভালো, রাজনৈতিক ব্যাপারে হফ্‌মানের কোনো চিত্তাকর্ষণ ছিল না,—ঐ বিষয়, যুদ্ধবিগ্রহ, কনসানট্রেশন ক্যাম্প ইত্যাদি নিয়ে দুই বন্ধুতে আলোচনা হত খুবই কম। ফটোগ্রাফার হলেও হফ্‌মান উত্তম উত্তম ছবির কদর ও সন্ধান জানতেন, এবং হিটলারেরও রুচি ছিল স্থাপত্যে, চিত্রে ও ভাস্কর্যে। দুজনার আলাপ-আলোচনা হত আর্ট নিয়ে।

অন্যজনের নাম পুৎসি হান্‌ফ্‌স্টেঙেস। এঁর বইয়ের নাম 'আনহার্ড

একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন (এঁর নাম Angela এবং ইনিই পরবর্তীকালে হিটলারের নতুন বাড়ি দেখাশুনো করার ভার নেন ও সঙ্গে নিয়ে আসেন কন্যা, হিটলারের প্রেয়সী Angelica, ডাক নাম Geli)। কিন্তু Angela-র জন্মের এক বৎসর পরে Franziska ক্ষয়রোগে মারা যান। এর চার বৎসর পর ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলারের পিতা Alois Hitler বিয়ে করেন তাঁর ঠাকুন্দার ভাইয়ের নাত্নী শ্রীমতী Klara Poetzl-কে, ৭ই জানুয়ারী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। এ বিয়ের চার মাস দশ দিন পরে জন্মান ফ্যুরারের সর্বজ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতা Gustav এবং বাল্যকালেই মারা যান, এবং তার পরের কন্যা Idaও অল্পবয়সে মারা যান। ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলার তৃতীয় সন্তান (পিতার তৃতীয় বিবাহের)। তাঁর ছোট ভাই Edmund এ পৃথিবীতে মাত্র ছ'মাস ছিল। সর্বশেষ সন্তান—পঞ্চমা—Paula ফ্যুরারের মৃত্যুর পর, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত চিরকুমারী অবস্থায় Salzburg-এ বাস করতেন। এই পাউলা একবার ভ্রাতার (হিটলার তখন ফ্যুরার) বাড়িতে তাঁকে দেখতে আসেন, কিন্তু দীর্ঘদিন (হিটলারের হিসেবে) থাকেন বলে ভ্রাতা আডল্‌ফ তাঁকে আর কখনো নিমন্ত্রণ জানাননি।

সৎভাই (পিতার ২য় বিবাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র Alois) বার্লিনে মদ বেচতেন। তাঁর সম্বন্ধে হিটলার কখনো একটি বর্ণও উচ্চারণ করেননি। তাঁর ছোট বোন Angela বেশ কয়েক বৎসর হিটলারের গ্রামের বাড়ি চালানোর পরে ঝগড়া করে চলে যান, এবং এক ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করেন। হিটলার এমনই চটে যান যে বিয়েতে কোনো উপহার পর্যন্ত পাঠাননি।

উইটনেস'। হিটলার যখন ম্যুনিকে তাঁর দল গড়ে তুলতে আরম্ভ করেন তখন উভয়ের পরিচয় হয়। পুৎসি বিত্তশালী খানদানী ঘরের ছেলে বলে তিনি হিটলারকে নানাভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হন। হিটলার ফ্যুরার হওয়ার পরও বেশ কিছুকাল তিনি 'দরবারে' আসা-যাওয়া করতেন, এবং প্রায়ই নিভৃতে হিটলারকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি 'দরবারে'র কূটনৈতিক মারপ্যাঁচে হেরে যান এবং সুইটজারল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়ে সেখানেই ঘর বাঁধেন। ইনি তাঁর পুস্তকে হিটলার এবং গেলী উভয়েরই বিরুদ্ধে প্রচুর বিষোদগার করেছেন। তাঁর মতে গেলী অতিশয় সাধারণ আর পাঁচটা মেয়ের মত ফ্লার্ট করার জন্য আকুল, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিকরা হিটলার সম্বন্ধে আপন আপন বই লেখার পর, এই দুজনার বই বেরিয়েছে এবং ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ধারণা হফ্‌মানের কাছাকাছি।

তা সে যা-ই হোক, এ-কথা সত্য হিটলার তাঁর ভাগ্নীকে নিয়ে কাফেতে যেতেন এবং আগে কাজের চাপে সিনেমা, থিয়েটার, অপেরায় অল্প যেতেন—এখন গেলীর চাপে সেগুলো বেড়ে গেল। কিন্তু আসলে হিটলার সব চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন গেলীকে মোটরে করে নিয়ে পিকনিক করতে—ম্যুনিকের চতুর্দিকে পিকনিকের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট স্থল বিস্তর। পাহাড়, উপত্যকা, হ্রদ, নদী, বনফুলে ভর্তি মোলায়েম ঘাসের ঢালু মাঠ, মহান বনস্পতি—কোনো বস্তুরই অভাব নেই। হফ্‌মান পরিবার প্রায়ই সঙ্গে যেতেন।

সোজা বাংলায় বলতে গেলে হিটলার এই কুমারীকে যেন দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করতেন। এবং তাই লোকজনসমক্ষে তিনি কখনো বে-এক্তেয়ার হয়ে এমন কোনো আচরণ করেননি যা মুগ্ধ প্রণয়ী ইয়োরোপে মাঝে মাঝে করে থাকে। গেলীর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ছিল,—হিটলার সে স্বর তালিম দিয়ে অপেরার জন্য গেলীকে তৈরি করতে চাইলেন এবং উপযুক্ত গুরু নিয়োগ করলেন। পুৎসি বলেন অন্য কাহিনী। তিনি বলেন, মেয়েটা ছিল অত্যন্ত বাজে ফ্লার্ট টাইপের। অপরার উপযুক্ত কণ্ঠস্বর প্রস্তুত করতে হলে যে রেওয়াজ এবং বিশেষ করে যে কঠোর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন ছিল, গেলীর চরিত্রে তার কণামাত্র উপাদান ছিল না। প্রায়ই গুরুকে ফোন করে রেওয়াজ নাকচ করে দিত এবং এই ফাঁকে ফ্লার্ট করার তালে লেগে যেতো। পুৎসির মতে শেষ পর্যন্ত গানের ক্লাস সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

তবে এ-কথা সর্ববাদিসম্মত যে ভিয়েনায় যে গুরুর কাছে গেলী সর্বপ্রথম গান গাইতে শেখা আরম্ভ করে সে তাঁর কাছে ফিরে যেতে চাইতো। জনশ্রুতি এ-কথা বলে, সেখানে নাকি গেলীর দয়িত বাস করতো।

এবং ঠিক এইখানেই ছিল হিটলারের ঘোরতর আপত্তি। শুধু তাই নয়, যদিও গেলীকে খুশী করার জন্যে হিটলার সব কিছুই করতে রাজী ছিলেন—যেমন গেলীর সঙ্গে টুপি-জুতো কিনতে যাওয়ার মত পীড়াদায়ক মারাত্মক একঘেয়ে ঘণ্টানিও তিনি বরদাস্ত করে নিতেন (হিটলার নিজেই বলেছেন, গেলীর সঙ্গে হ্যাট টুপি কাপড় কিনতে যাওয়ার চেয়ে কঠিনতর অগ্নিপরীক্ষা

ত্রিসংসারে আর নেই। আধঘণ্টা একঘণ্টা ধরে সে দোকানের মেয়েকে দিয়ে বস্তার পর বস্তা কাপড় নামাবে, তার সঙ্গে সে সব নিয়ে প্রাণ ঢেলে দিয়ে আলোচনা করবে এবং শেষ পর্যন্ত কিছুটি না কিনে গট গট করে বেরিয়ে চলে যাবে অন্য দোকানে। হিটলার ততক্ষণ বোধ হয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে বসে আঙুলের নখ কামড়াতেন, কিন্তু যা-ই করুন আর না-ই করুন, তার পরের বারও বাছুর ছানাটির মত গেলীর সঙ্গে কেনা-কাটা করতে যেতেন ঠিকই) কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি অচল অটল। তাঁর অনুমতি ভিন্ন গেলী যার-তার সঙ্গে আলাপচারী করতে পারবে না। এমন কি পরিচিতজনের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কিও চলবে না। এবং এই ফরমান্ যে কত সুদূরপ্রসারী সেটা স্বয়ং গেলীও জানতো না।

গেলী অবশ্যই জানতো হিটলার তাকে ভালোবাসেন, তার প্রেমমুগ্ধ, সে প্রেম যে কত অতল গভীর সে-সম্বন্ধে বেচারীর কোনো ধারণাই ছিল না। একদিন সেটা সে বুঝতে পারলো রীতিমত ভীতশঙ্কিত হয়ে।

হিটলারের পার্টির সদস্যগণ যে যে কাজই করুন না কেন, সমাজে তাদের যে-স্থানই হোক না কেন, পার্টির ভিতর একটা প্রশংসনীয় সাম্যবাদ ছিল। হিটলারের মোটর ড্রাইভার এমিল মরিস ছিল প্রাচীন দিনের পার্টি-মেম্বার। সে একদিন কাঁপতে কাঁপতে হফ্‌মানের সামনে এসে বললে, সে গেলীর সঙ্গে ঠাট্টা-ঠুট্টি করছিল, এমন সময় হঠাৎ হিটলার ঘরে ঢুকে রাগে, জিঘাংসায় যেন সর্ব আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে চিৎকারের পর চিৎকারে মরিসকে গালাগাল দিতে আরম্ভ করেন। মরিস তো রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলো, হিটলার যে কোনো মুহূর্তে পিস্তল বের করে গুলি চালাতে পারেন। ঘটনাটি হফ্‌মানকে বলার সময় সে তখন ভয়ে কাঁপছে।

হফ্‌মানের মতে গেলী ছিল পূত, পবিত্র পুষ্পটির মত। তিনি বলেন, অপরাধ তার দিক দিয়ে নিশ্চয়ই কিছু ছিল না। কিন্তু মরিসটি ছিলেন ঈষৎ নটবর। কিন্তু সেও যে ফ্যুরারের ভাগ্নীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করবে সেটা অবিশ্বাস্য। করতে গেলে তার বহু পূর্বেই মরিসের বন্ধুবান্ধব তাকে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করে দিত।

হিটলারের শত্রুর অভাব কোনো কালেই ছিল না। এমন কি তাঁর প্রধান শত্রু কম্যুনিস্ট দলের কিছু কিছু সদস্য পার্টির আদেশানুযায়ী নাৎসি মেম্বার-শিপ নিয়ে হিটলারের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে যথাস্থানে তাদের রিপোর্ট পাঠাতো। এদের তো কথাই নেই, আরো কেউ কেউ বলেন, সমস্ত ব্যাপারটা এতখানি ধোয়া তুলসীপাতা ছিল না।[১০] তা সে যাই হোক, হিটালার আত্ম-কর্তৃত্ব ফিরে পেলেন বহু কাল পরে—ইতিমধ্যে মরিস গা ঢাকা দিয়ে থাকতো

---

১০ হিটলারের প্রখ্যাত জীবনী-লেখক বুলক্ বলেন—'He (Hitler) discovered that she (Geli) had allowed Maurice to make love to her', ইংরিজিতে to make love হয়তো একাধিক অর্থ ধরে।

—হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে তুলকালাম কাণ্ড লেগে যেত।

ইতিমধ্যে আরেটা কাণ্ড ঘটে গেল। হিটলার প্রোপাগাণ্ডা-সফরে বেরুলে গেলী মায়ের কাছে, হিটলারের গ্রামের বাড়িতে চলে যেত। বোধ হয় তারই কোনো এক সময়ে হিটলার প্রিয়া গেলীকে একখানা চিঠি লেখেন—সেটাতে নাকি যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে হিটলার অতিশয় প্রাঞ্জল—শত্রুপক্ষের অভিমতে—অশ্লীল ভাষায় আপন কাম্য আদর্শ যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন। যৌনবিজ্ঞানীরা বলেন অত্যাচারী শাসকদের (টাইরেন্ট) অনেকেই নাকি মাজোকিস্ট হয়ে থাকেন—অর্থাৎ স্বাভাবিক যৌনসঙ্গমের পরিবর্তে উলঙ্গ রমণী সে স্থলে পুরুষকে তীব্র কশাঘাত করে, কিংবা তলায় সূক্ষ্ম লোহা লাগানো রাইডিং বুট পরে পুরুষের স্কন্ধোপরি ঘন ঘন বুটাঘাত করে, তবেই নাকি পুরুষ তার যৌনানন্দ পায়।[১১] শত্রুপক্ষের মতে হিটলারের চিঠি মাজোকিস্ট দর্শন বিবৃত করেছিল। সে চিঠি নাকি দুর্ভাগ্যক্রমে পড়ে যায় অন্য লোকের হাতে। অতি কষ্টে, বহু অর্থ নিয়ে (বলা হয় পার্টি-ফাণ্ড থেকে) এক ক্যাথলিক পাদ্রী—ইনি তাঁর ইহুদি-বিদ্বেষ নাৎসি পার্টিতে যোগ দিলে কার্যে পরিণত করতে পারবেন এই আশায় পার্টিতে যোগ দেন—তারই বিনিময়ে চিঠিখানা কিনে নেন। (কথিত আছে, ৩০ জুন ১৯৩৪-এ হিটলার যখন বিনা বিচারে এক তথাকথিত 'বিদ্রোহী' দলের নেতা রোম্, হাইনৎস ইত্যাদিকে গুলি করে মারবার আদেশ দেন তখন সেই মোকায় আরো জনা চারশ'র সঙ্গে এই ফাদার স্টেমপ্‌ফলেকেও খুন করা হয়। তাঁর দোষ তিনি ঐ চিঠির সারমর্ম স্বমস্তিষ্কে সীমাবদ্ধ না রেখে দু'একজন অন্তরঙ্গ পার্টি-মেম্বারকে বলে ফেলেন। হিটলার-সখা হফ্‌মান অবশ্য এ চিঠি উল্লেখ করেননি, বরঞ্চ স্টেম্‌প্‌ফলে ও অন্যান্য নাৎসি নেতা নিহত হওয়ার কয়েকদিন পর হিটলারের সঙ্গে যখন দেখা করতে যান তখন তাঁকে দেখা মাত্রই নাকি হিটলার বলে ওঠেন, 'জানো হফ্‌মান, শুয়োরের বাচ্চারা আমার প্যারা ফাদারকেও খুন করেছে!' অবশ্য এ-কথা সত্য যে, জুন ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে হিটলারের আদেশে যে পাইকারি খুন 'জুন পার্জ' বা 'জুন মাসের জোলাপ' হয়—এ লেখক তখন জার্মানিতে ও ধুম্ধুমারের যতখানি আর পাঁচটা রাস্তার নাগরিক দেখতে পেয়েছিল, সেও

---

১১ লণ্ডন পুলিস নাকি বেশ্যাবাড়িতে হামলা চালালে মাঝে মাঝে চাবুক, লোহার গুলিওয়ালা রাইডিং বুট, ইত্যাকার যন্ত্রণাদায়ক সাজসরঞ্জাম পায়, বেশ্যাদের বক্তব্য, 'খদ্দের ভদ্রলোক'। তিনি স্ত্রীকে এসব করতে আদেশ দিতে পারেন না—স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ। তাই এ ধরনের লোক আমাদের কাছে আসেন। আমরাও সাজসরঞ্জাম তৈরী রাখি। স্ত্রীলোক মাজোকিস্টও আছে, এবং যেসব রমণী স্বামী মারপিট করলে চিৎকার করে, কিন্তু যৌনানন্দ পায়, তাদের 'নরমতর' মাজোকিস্ট বলা হয়। অনেকের মতে অনেক রমণী বাড়িতে এমন সব কাজ করে থাকে বা করে না (যেমন ঘর ঝাঁট দিল না রান্না করলো না, বা স্বামীর গামছাখানা লুকিয়ে রাখলো) যাতে করে স্বামী তাকে ঠ্যাঙায়!

পেয়েছে, কিন্তু সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর হিটলার জাতির সম্মুখে যখন আপন সাফাই গেয়ে বক্তৃতা করলেন, তখন আর পাঁচজন নাগরিকের মত সে সেটা বিশ্বাস না করে অবিশ্বাস করেছিল এবং পরবর্তী ইতিহাস-উদঘাটন লেখককেই সমর্থন করে—তখন গ্যোরিং, হিমলার আদেশদাতা হিটলারকে না জানিয়ে, পরে মিথ্যে অভিযোগ এনে, আপন আপন ব্যক্তিগত শত্রুও খতম করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, ফ্যুরারের গোপনীয় কেলেঙ্কারি বাবদে যখন ফাদার এতই অসতর্ক তখন এ মোকায় তাঁকে সরিয়ে ফেলাই ভালো —এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকেও খুন করা হয়। কিন্তু এই 'পার্জ' বা জোলাপ গেলী-প্রেমের ছ'বছর পরের কথা, আমরা ১৯২৮-এ ফিরে যাই)।

তা সে চিঠি আদৌ হিটলার লিখেছিলেন কিনা সে তর্ক উত্থাপন না করলেও জানা যায়, ঐ সময়ে পার্টি-সদস্যদের ভিতর কানাঘুষা আরম্ভ হয়। কারণ ইতিমধ্যে হিটলার আরো ভালো রাস্তায় বৃহৎ ভবন কিনে সেখানে গেলীর জন্য রাজরানীর মত আবাস নির্মাণ করে সেইটেকে আপন স্থায়ী আবাস-বাটি করেছেন, গেলীকে যত্রতত্র সর্বত্র সঙ্গে নিয়ে যান, এবং নিতান্ত সরল পার্টি-সদস্যও দু-চারবার লক্ষ্য করলেই বলতো, নিশ্চয়ই ফ্যুরার এ মেয়েতে মজেছেন। তা তিনি মজুন, কিন্তু একে বিয়ে করলেই তো পারেন। নইলে শত্রুপক্ষ যে বলছে হিটলার রক্ষিতা পোষণ করেন, দু'কান কাটার মত স্বভবনে তার সঙ্গে বাস করেন, তিন কান কাটার মত সগর্বে সদম্ভে তাকে নিয়ে সর্বত্র—এমন কি পোলিটিকাল পার্টি মিটিঙেও—যাতায়াত করেন, এবং আপন ভাগিনীর—তা হোক না সে সৎবোনের মেয়ে—ভবিষ্যৎটি যে ঝরঝরে করে দিচ্ছেন সে বিষয়ে তাঁর কোনো বিবেকদংশন নেই; আর এতদিন ধরে প্রচার যে, হিটলারের মত সর্বত্যাগী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ আর হয় না, তিনি যে ঊনচল্লিশ বছর বয়সেও দারগ্রহণ করেননি তার একমাত্র কারণ, দারাপুত্রপরিবার দেশের জন্যে তাঁর আত্মোৎসর্গে অন্তরায় হবে বলে। জিতেন্দ্রিয় না কচু!

এই 'কেলেঙ্কারি'তে পার্টির কতখানি ক্ষতি হচ্ছিল বলা কঠিন, কিন্তু এ কথা সত্য যে নাৎসি পার্টির ভ্যুরটেম্বের্গ অঞ্চলাধিপতি মুরুব্বী, পার্টির এক অতি প্রাচীন সদস্য যখন হিটলারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করলেন তখন তিনি রাগে ক্রোধে চিৎকার করে তাঁকে পার্টি থেকে স্রেফ খেদিয়ে দিলেন।

এদিকে হিটলারের কড়া পাহারা গেলীর উপর। হফ্‌মানের মতে তিনি আদৌ জানেন না যে গেলী অন্যজনকে অতি গভীরভাবে ভালোবাসে—ভিয়েনায় নাকি দয়িতের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এবং এ কথাও সত্য, গেলী বার বার সঙ্গীতচর্চা করার জন্য তার প্রাচীন গুরুর কাছে ভিয়েনায় যেতে চায়—এবং হিটলারের কবুল জবাব, 'নাইন' অর্থাৎ নো। যে ম্যুনিকের সহস্র সহস্র নরনারী হিটলারের উচ্ছ্বসিত ভক্ত, সেই হিটলার যখন গেলীর পদপ্রান্তে তাঁর প্রণয় রাখলেন তখন আর কিছু না হোক, এত বড় সর্বজনপ্রশংসিত একটা গ্রেটম্যানের বশ্যতা গেলিকে নিশ্চয়ই মুগ্ধবিহ্বল করেছিল। (প্রেমের প্রতিদান দিক আর না-ই দিক) এবং হয়তো হিটলার সেই বিহ্বলতাকেই প্রণয়ের

প্রতিদান হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। হফ্‌ম্যানের মতে হিটলারের 'গ্রেট লভ্‌' ছিল স্বার্থপর প্রেম—অনেক মুনিঋষিরাও বলেন, 'গ্রেট লভ্‌' কখনো নিঃস্বার্থ হতে পারে না, সে 'লাভার' অন্য সকলের প্রতি হয়ে যায় হিংসাপরায়ণ, তার বুভুক্ষা অসীম। বার্নার্ড শও বলেছেন, 'গ্রেট লভ্‌' সামলে-সুমলে অল্প মেকদারে ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে হয়। নইলে দয়িতার দম বন্ধ হয়ে আসে। যেন কোনো 'ম্যানিয়াক' প্রেমোন্মাদ তাকে অষ্টপ্রহর আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নিরুদ্ধনিশ্বাস করে তুলছে।

ম্যুনিকের বছরের সব চেয়ে বড় নাচের পরব এগিয়ে আসছে। প্রাণচঞ্চলা গেলী কেন, নিতান্ত অর্থাভাব না হলে, কিংবা প্রেমিকও দরিদ্র হলে, ম্যুনিকের কোনো তরুণী সে নাচ বর্জন করে? প্রথমটায় হিটলার তো কানই দেন না। আর গেলীও ছাড়বে না। শেষটায় বাধ্য হয়ে হিটলার রাজী হলেন, কিন্তু শর্ত রইল দুটি। সঙ্গে যাবেন দুই গার্জেন এবং দুই গার্জেনদের প্রতিজ্ঞা করতে হল যে রাত এগারোটার ভেতর গেলীকে ফের বাড়ি পেঁছে দিতে হবে।

সেই ডান্‌সের জন্য যে পারে সে-ই নূতন হালফেশানের ফ্রক তৈরী করায়। ম্যুনিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিজাইনার-দর্জি ডাঁই ডাঁই অতি অরিজিন্যাল ডিজাইন রেখে গেল। হিটলার এক নজর বুলিয়েই সব কটা নামঞ্জুর করে দিলেন। এগুলো বড্ড বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে—বড্ড বেশী সালংকার—যদ্যপি ফ্রক হিসাবে অত্যুৎকৃষ্ট। গেলী যাবে সাধারণ ইভনিং ড্রেস পরে।

তাই হল। স্বয়ং হফ্‌মান ও তাঁর চেয়ে বুড়ো পার্টির প্রাচীন সদস্য আমান্‌ গেলীর 'চরিত্ররক্ষকস্বরূপ' তাকে মধ্যিখানে নিয়ে গেলেন নাচের মজলিশে। এক্ষেত্রে তরুণীরা প্রায় সর্বদাই আপন আপন লভারের সঙ্গে এ নাচে কেন—সব নাচেই যায়।

এবং ফিরতে হবে রাত ১১ টায়। বলে কি? মাথা খারাপ!

হফ্‌মান বলেছেন—এবং এ লেখকও আপন একাধিক অভিজ্ঞতা থেকে অসংকোচে সায় দেবে—এ-সব নাচে ফুর্তি-ফার্তি ফষ্টি-নষ্টি এমন কি কিঞ্চিৎ বেলেল্লাপনা আসলে আরম্ভ হয় রাত বারোটার পর। আমার মতে জমে প্রায় দুটোয় এবং নাচ ভাঙ্গে ছ'টায়।

অনুমান করা কঠিন নয় যে গেলী অত্যধিক আপ্যায়িত বা সন্তুষ্ট হয়নি। নাচের মাঝে মাঝে ফাঁকে ফাঁকে কপোত-কপোতীরা জোড়ায় জোড়ায় ফোটো-গ্রাফ তোলায়। গেলীর যথেষ্ট কাষ্ঠরস ছিল। সে-ও ছবি তোলালে ঐ দুই প্রহরী 'ডালকুত্তা'র মাঝখানে। কপোত-কপোতীর এক হাতে থাকে সফেন শ্যাম্পেন গ্লাস, অন্য হাতে গোটাপাঁচেক বেলুনের সুতো, মাথায় ঐ বলডান্‌সেই কেনা রঙ-বেরঙের ফুল্‌স্‌ ক্যাপ, গাধার টুপি ইত্যাদি। গেলী ছবি তোলালে এমন কায়দায় যেন মনে হয় ফাঁসির আসামীকে তার দুই জল্লাদ তাকে ফাঁসি-কাঠে নিয়ে যাবার সময় প্রেস ফোটোগ্রাফার যে ভাবে ছবি তোলে।

হফ্‌মান বিরক্তির সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটার সময় হিটলারের গচ্ছিত মহামূল্যবান গেলীকে মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল বেলা সাড়ম্বরে 'সরকারী' কায়দায় গেলী ফোটোগ্রাফখানা মামাকে উপহার দিলেন। হিটলার এ সব নাচ এককালে বিস্তর না হোক অল্প-বিস্তর নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। তাঁর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ না করাই ভাল।

বৈমাত্রেয় মামা হলেও গেলী পেয়েছিল হিটলারের একটি মহৎ গুণ ; সে তার পেটের কথা কাউকে বলতো না। যে-পুৎসি হান্‌ফ্‌স্টেঙেল তাঁর পুস্তকে হিটলার ও গেলীর বিরুদ্ধে প্রচুরতম বিষোদ্গার করেছেন তিনি সে সময়ে নিত্য নিত্য হিটলারের বাড়িতে আসতেন, এবং গেলীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁর পুস্তকে গেলীকে দিয়ে রামগঙ্গা কিছুই বলাতে পারেননি। শুধু একবার নাকি তিনজনা যখন একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন হিটলার কি একটা রূঢ় মন্তব্য করলে, পুৎসি শুনতে পেলেন, গেলী দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "ব্রুট"—পশু !

গেলীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল হফ্‌মান পরিবারের প্রতি এবং সমস্ত ম্যুনিক শহরে ঐ পরিবারের কর্ত্রী এর্না হফ্‌মানের সঙ্গে তার ছিল অন্তরঙ্গতা। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত আগাপাস্তলা কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি, স্বামীকেও বোঝাতে পারেননি। পুৎসি তাঁর বিষোদ্গারের সময় গেলীর যত নিন্দাই করে থাকুন না কেন, এর্না পাঁচজনকে যা বলেছেন তার থেকে বোঝা যায়, তিনি, এর্না নিজে আর্টিস্ট ছিলেন বলে শুধু যে গেলীর অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে মজে-ছিলেন তাই নয়, তার মানসিক ও চারিত্রিক একাধিক বিরল সৎগুণ তাঁকে সত্যই মুগ্ধ করেছিল। এমন যে বয়স্কা বান্ধবী যাঁর কাছে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, বিপদে আপদে উপদেশ পথনির্দেশ চাওয়া যায় পাওয়া যায় তাঁর কাছেও গেলী তার সুখ-দুঃখের কথা বলত না। শুধু একদিন মাত্র, কেমন যেন আত্মহারা হয়ে সে স্বীকার করে যে, সে যখন ভিয়েনায় ছিল তখন কোনো একজনকে গভীরভাবে ভালবেসেছিল। সামান্য এই, এতটুকু বলার পর সে হঠাৎ থেমে গেল, যেন সম্বিতে ফিরে এসে বুঝতে পারল, বড্ড বেশি বলা হয়ে গিয়েছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'আর যা আছে, সেটা আছেই। আপনিও কিছু করতে পারবেন না, আমিও কিছু করতে পারবো না। অতএব অন্য কথা পাড়ি।' এর্না দুঃখিনী গেলীকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন, সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন—এর্না বাস্তবিকই দৃঢ় চরিত্রের রমণী ছিলেন, অনেকের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন, নাৎসি পার্টিতে যোগ দেননি, এবং যদিও হিটলারকে সমীহ করে চলতেন তবুও অন্যান্য বাবদে দু একবার তাঁকেও খাঁটি অপ্রিয় সত্য কথা শোনাতে কসুর করেননি—কিন্তু গেলী তার শামুকের খোল থেকে বেরুতে রাজী হল না। পরবর্তী ঘটনা থেকে মনে হয়, সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল, সে যা চায় হিটলার তার ঘোরতর বিরোধী এবং এই নিরীহ হফ্‌মান দম্পতি এখনও হিটলারের স্বরূপ চেনে না, হিটলার তাঁর মর্জিমাফিক যে সব সম্ভব-অসম্ভব কার্য করতে ও করাতে পারেন সে সম্বন্ধে এঁদের কণামাত্র ধারণা নেই—হিটলারের যে-'স্বরূপ' সে তার প্রতিদিনের সান্নিধ্যে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছিল।

সেদিন এর্না শুধু এইটুকু জানতে পেরেছিল যে গেলী ভিয়েনায় একজন আর্টিস্টকে ভালবোসে, কিন্তু সে কে, তাদের দুজনার মধ্যে কি আদান-প্রদান হয়েছে গেলী যদি তার ভালবাসার প্রতিদান পেয়ে থাকে তবে উভয়ের বিবাহের প্রতিবন্ধকই বা কি— এ-সব হফ্‌মানরা জানতে পারেননি, পরে অন্য কেউও জানতে পারেনি।

এদিকে গেলীর মুখ সদা প্রফুল্ল, মামার বুড়া-বুড়া প্রাচীন দিনের পার্টি-সদস্যরা তার উপর বড়ই প্রসন্ন, মামার বানানো সেই কাঁটাজালের ভিতরও তার বিধিদত্ত সরসতা লোপ পায়নি। পুৎসি এটাকেই ঘৃণা করে বলেছেন 'ককেটরি' —এর বাংলা প্রতিশব্দ কি? ঢলাঢলিপনা? কি জানি! হফ্‌মান বলেন, তাঁর মনে সন্দেহ নেই যে এটা ছিল তার বাহিরের মুখোশ। এই প্রাণবন্ত, প্রকৃতিদত্ত সদাচঞ্চলা, আনন্দে হাসিতে যে কোন মুহূর্তে কারণে অকারণে শতধা হয়ে ফেটে যাওয়া যার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তার চতুর্দিকে বিধিনিষেধের কাঁটার জাল! ম্যুনিকের মত স্বাধীন শহরে—যেখানে নর-নারী কি রকম অবাধে মেলামেশা করে সেটা এদেশে বসে কল্পনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব—গেলী কারো সঙ্গে কথা কইতে পারবে না মামার অজান্তে, কারো সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে পারবে না মামার পরিষ্কার অনুমতি ভিন্ন, এমন কি ঐ বয়সের আর পাঁচটা মেয়ে যে সামাজিকতা করে থাকে, যে লোকাচারসম্মত ভদ্রতা-সৌজন্য করে পাঁচজনের সাহচর্য সঙ্গসুখ পায়—এর কোন একটা সে করতে পারে না, মামাকে না জানিয়ে, মামার অনুমতি ছাড়া।

সেই 'ডালকুত্তা'—শব্দটা হফ্‌মান তিক্ততার সঙ্গে নিজেই ব্যবহার করেছেন —দুটিকে নিয়ে ডান্‌সে যাওয়ার ফার্সের পরের দিন হফ্‌মান আর সহ্য না করতে পেরে হিটলারকে বললেন, 'আপনি গেলীর চতুর্দিকে যে পাঁচিল খাড়া করে তুলেছেন তার ভিতর মেয়েটার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে। যে নাচে কাল রাত্রে তার ফুর্তি করার কথা ছিল, সেটা শুধু তার অবরুদ্ধ জীবনের তিক্ততা তিক্ততর করে তুলেছিল।'

হিটলার উত্তরে বললেন, 'আপনি জানেন, হফ্‌মান, গেলীর ভবিষ্যৎ আমার কাছে এমনই প্রিয়, এমনই মূল্যবান যে তাকে সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। এ-কথা খুবই সত্য আমি গেলীকে ভালবাসি এবং আমি তাকে বিয়েও করতে পারি, কিন্তু বিয়ে করা সম্বন্ধে আমার মতামত কি আপনি ভালো করেই জানেন, এবং আমি যে কদাপি বিয়ে করবো না বলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করেছি সে-কথাও আপনি জানেন। তাই আমি এটাকে আপন ন্যায়সম্মত অধিকার বলে ধরে নিয়েছি যে যতদিন না গেলীর উপযুক্ত বর এসে উদয় হয় ততদিন পর্যন্ত সে যার সঙ্গে পরিচয় করতে চায় এবং যারা তার পরিচিত তাদের উপর কড়া নজর রাখা। আজ গেলী যেটাকে বন্ধন বলে মনে করছে সেটা প্রকৃতপক্ষে বিচক্ষণ আত্মজনের সুচিন্তিত সতর্কতা। আমি মনে মনে দৃঢ়তম সংকল্প করেছি গেলী যেন জোচ্চোরের হাতে না পড়ে বা এমন লোকের পাল্লায় না পড়ে যে গেলীকে দিয়ে আপন ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেবার

অ্যাড্‌ভেঞ্চারের তালে আছে।'

হফ্‌মান এস্থলে যোগ দিচ্ছেন, হিটলার অবশ্য জানতেন না, যে গেলী গোপনে গোপনে ভিয়েনাবাসী এক তরুণকে মনপ্রাণ দিয়ে গভীর ভালবাসে।

হিটলার গিয়েছিলেন ম্যুনিকের বাইরে—গেলীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মায়ের কাছে—আবার যাবেন দূর হামবুর্গে, মাঝপথে কয়েক ঘণ্টার জন্য ম্যুনিকে থামবেন এবং গেলীকে গ্রাম থেকে আনিয়েছেন। হামবুর্গের দীর্ঘ সফরে সহযাত্রী হওয়ার জন্য তিনি পূর্বেই হফ্‌মানকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এস্থলে হফ্‌মানের বিবরণী মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর (অর্থাৎ ম্যুনিক সমাজে হিটলার গেলীকে পরিচয় করিয়ে দেবার চার বৎসর পর—কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গেলীকে ম্যুনিক সমাজে উপস্থিত করেন, তাহলে হবে সাত বৎসর পর, কিন্তু এ বাবদে আমি হফ্‌মানকেই বিশ্বাস করি, এবং এসব ঐতিহাসিকদের বই বেরিয়েছে হফ্‌মানের বই বেরুবার পূর্বেই) হফ্‌মান এলেন হিটলারের বাড়িতে। গেলী মায়েরই মতো ভালো ঘরকন্না করতে জানত, তাই সে তখন হিটলারের স্যুটকেস গুছিয়ে দিচ্ছে। হিটলার সখাসহ যখন সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামছেন, তখন উপরের তলার রেলিঙের উপর ভর করে, নিচের দিকে ঝুঁকে গেলী বলতে লাগল, 'ও রেভোয়া মামা অ্যাডল্‌ফ, ও রেভোয়া, হ্যার হফ্‌মান!' হিটলার দাঁড়ালেন, তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে দোতলার দিকে চললেন। হফ্‌মান বাইরে এসে পেভমেণ্টে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হিটলার এলে পর মোটরে উঠে দুজনা চললেন উত্তর দিকে ন্যুরন্‌বের্গ পানে। শহর থেকে বেরুবার সময় হিটলার বন্ধু হফ্‌মানকে বললেন, 'কেন জানি নে আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে।'

হফ্‌মান বিবেচক লোক। তিনি নিজেই ঠাট্টা করে বলেছেন, 'অনেকেই আমাকে আড়ালে হিটলারের কোর্টজেস্টার (গোপালভাঁড়) বলত, এবং হয়তো সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।' তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এ সময়কার দখিণা "ফ্যোন" বাতাসটা সক্কলেরই বুকের উপর চেপে বসে সবাইকে মনমরা করে দেয়।' কিন্তু হিটলার চুপ করে রইলেন, এবং দীর্ঘ ন্যুরন্‌বের্গের রাস্তা ড্রাইভ করার পর সেখানকার পার্টি-মেম্বারদের প্যারা হোটেলে উঠলেন।

পরের দিন ন্যুরন্‌বের্গ শহর ছেড়ে যখন তাঁরা বায়রট্‌ শহরের দিকে এগুচ্ছেন তখন হিটলার ড্রাইভিং সীটের সামনের ছোট্ট আয়নাটিতে লক্ষ্য করলেন, আরেকখানা মোটর দ্রুততর বেগে ক্রমশই তাঁদের গাড়ির কাছে এগিয়ে আসছে। নিরাপত্তার জন্য হিটলারের হুকুম ছিল কোনো গাড়ি যেন তাঁর গাড়ি ওভারটেক না করতে পায়, কারণ ঐ সময় দুটো গাড়িই কিছুক্ষণ পাশাপাশি চলে বলে অন্য গাড়ি থেকে হিটলারের উপর গুলি চালানো কঠিন নয়। হিটলার সোফার শ্রেক্‌কে সেই আদেশ দিতে যাচ্ছেন সেই সময় তিনিই লক্ষ্য করলেন, যে-গাড়ি পশ্চাদ্ধাবন করছে সেটা ট্যাক্সি এবং ড্রাইভারের পাশে

হোটেলের উর্দিপরা একটি ছোকরা ক্ষিপ্তের ন্যায় দু হাত নাড়িয়ে তাঁদের থামবার জন্য সংকেত করেছে। শ্রেক্ গাড়ি দাঁড় করালে ছেলেটি উত্তেজনায় হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, 'হ্যার হেস (ইনি তখন এবং ১৯৪১-এ যখন অ্যারোপ্লেনে করে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে লণ্ডন যান তখনও হিটলারের পরেই তাঁর স্থান ছিল) ম্যুনিক থেকে ট্রাংককল করে অত্যন্ত জরুরী বিষয় নিয়ে হিটলারের সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনি ফোনে না পেঁছিনো পর্যন্ত হেস লাইন ছাড়বেন না।' দুই বন্ধু মোটর ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চললেন ন্যুরন্বের্গ পানে।

গাড়ি ভাল করে থামতে না থামতেই হিটলার লাফ দিয়ে মোটর থেকে বেরিয়ে ছুটে ঢুকলেন হোটেলের ভিতর এবং তারপর টেলিফোনের বাক্সে (বুথে) —বুথের দরজা পর্যন্ত তিনি বন্ধ করেননি। পিছনে পিছনে ছুটে এসেছেন হফ্মান এবং টেলিফোন বুথের দরজা খোলা বলে হিটলারের প্রত্যেকটি শব্দ শুনতে পেলেন।

'এখানে হিটলার—কি হয়েছে?' উত্তেজনায় হিটলারের গলা খসখসে কর্কশ হয়ে গিয়েছে। 'হে ভগবান! এ কী ভয়ংকর!' অপরপ্রান্ত থেকে কি একটা খবর শুনে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, এবং তাঁর কণ্ঠস্বরে পরিপূর্ণ হতাশা। তারপর দৃঢ়তর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, এবং সে কণ্ঠস্বর শেষটায় প্রায় চিৎকারের পর্যায়ে পেঁছিল, 'হেস! আমাকে উত্তর দাও—হাঁ কিংবা না—মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে তো?...হেস, তুমি অফিসার, সেই অফিসারের নামে দিব্যি দিচ্ছি—আমাকে সত্য করে বলো—যেয়েটা বেঁচে আছে, না মরে গেছে?... হেস!...হেস!' এবারে হিটলার তীব্রতম কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন। মনে হল তিনি অপর প্রান্ত থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছেন না। হয় লাইন কেটে গেছে, নয় হেস উত্তর দেবার দুর্বিপাক এড়াবার জন্য রিসীভার হুকে রেখে দিয়েছেন। হিটলার টেলিফোন বুথ থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলেন, তাঁর চুল নেমে এসে কপাল ঢেকে ফেলেছে (এ কথাটা তাঁর খাস চাকর লিঙে একাধিকবার বলেছে, যে, হিটলার তাঁর মাথার চুল কিছুতেই বাগে রাখতে পারতেন না—অল্পেতেই সেটা কপাল ঢেকে ফেলত), তাঁর চাউনি ছন্নের মত, তাঁর চোখ দুটো যে উজ্জ্বল হয়ে ঝকঝক করছে সেটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

শ্রেকের দিকে মুখ করে বললেন, 'গেলীর কি যেন একটা কি ঘটেছে। আমরা ম্যুনিক ফিরে যাচ্ছি। গাড়ির যা জোর আছে তার শেষ আউন্স্ পর্যন্ত কাজে লাগাও। গেলীকে জীবিত অবস্থায় আবার আমাকে দেখতেই হবে।'

'টেলিফোনের বুথ থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো যে সব কথা ভেসে এসেছিল তার থেকে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, গেলীর কিছু একটা হয়েছে, কিন্তু ঠিক ঠিক কি সেটা বুঝতে পারিনি, এবং হিটলারকে জিজ্ঞেস করার মত সাহসও আমার ছিল না।'—বলছেন স্বয়ং হফ্মান।

হিটলারের উন্মাদ উত্তেজনা যেন সংক্রামক। শ্রেক্ চেপে ধরেছে

অ্যাকসিলীরেটর। মোটরের মেঝে পর্যন্ত তার গাড়ি তীব্র আর্তনাদ করে ছুটে চলেছে ম্যুনিকের দিকে। হফ্‌মান মাঝে মাঝে মোটরের ছোট্ট আর্শিতে দেখছেন হিটলারের চেহারা—ঠোঁট দুটো চেপে তিনি উইণ্ডস্ক্রীনের ভিতর দিয়ে সম্মুখপানে তাকিয়েও যেন কিছু দেখছেন না। আমাদের মধ্যে একটি মাত্র বাক্য বিনিময় হল না—যে যার বিমর্ষ চিন্তা নিয়ে ডুবে আছে আপন মনের গহনে।

অবশেষে আমরা তাঁর বাড়িতে পেঁছিলুম এবং সেই ভয়ংকর দুঃসংবাদ জানতে পেলুম। চব্বিশ ঘণ্টা আগে গেলী মারা গিয়েছে। সে তার মামার অস্ত্রভাণ্ডার থেকে একটি ৬·৩৫ পিস্তল নিয়ে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি জায়গায় গুলি করেছে। ডাক্তারদের মতে যদি সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা হত তবে হয়তো তাকে বাঁচানো অসম্ভব হত না। কিন্তু সে দরজা বন্ধ করে গুলি ছুঁড়েছিল, কেউ সে শব্দ শুনতে পায়নি এবং ধীরে ধীরে রক্তক্ষরণে সে ইহলোক ত্যাগ করেছে।

ইতিমধ্যে পোস্টমর্টেম, করোনারের তদন্ত সব কিছু হয়ে গিয়েছে এবং পুলিস মৃতদেহ ফেরত দিয়েছে। ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে বোঝা গেল, হিটলারের বিদায়ের অল্প পরেই গেলী আত্মহত্যা করে। সে দেহ এখন আনুষ্ঠানিক ভাবে সুসজ্জিত করে কবরস্থানে রাখা হয়েছে—তিন দিন পর গোর হবে—এ সময় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব মৃতকে শেষবারের মত দেখে নেন এবং আত্মার সদ্গতির জন্য আপন আপন প্রার্থনা জানান।

গেলীর মা ইতিমধ্যে বের্ষটেশগাডেন থেকে এসে গেছেন। পার্টির মুরুব্বীদের একাধিকজন ও হিটলার-ভবনের বন্ধু প্রাচীন দিনের 'গৃহরক্ষিণী' ফ্রাউ ভিন্‌টারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গেলীর মা নির্বাক অশ্রুধারে সিক্ত হচ্ছিলেন।

* * *

'গৃহরক্ষিণী' ফ্রাউ ভিন্‌টার যা বললেন তার সারমর্ম এই, হিটলার বাড়ি ছাড়ার পূর্বে সিঁড়ি দিয়ে আবার দোতলায় উঠেছিলেন—এর বর্ণনা আমরা হফ্‌মান মারফৎ আগেই দিয়েছি—গেলীকে আরেকটু আদর করার জন্য, কারণ তিনি সেদিনই ম্যুনিক ফিরেছিলেন এবং সেদিনই আবার ন্যুরন্‌বের্গ হয়ে হামবুর্গ চলে যাচ্ছিলেন বলে গেলীর প্রতি যথেষ্ট যত্নবান হতে পারেননি। সেই অনিচ্ছাকৃত অবহেলাটা যেন খানিকটা দূর করার জন্য তিনি উঠে গেলীর গালের উপর হাত দিয়ে আদর করতে করতে কানে কানে সোহাগের কথা কইছিলেন কিন্তু গেলী যেন কোনো সান্ত্বনা মানতে চায়নি, তার রাগও পড়েনি।

দু'জনার চলে যাওয়ার পর গেলী ফ্রাউ ভিন্‌টারকে বলে, 'সত্যি বলছি, আমার ও মামার মধ্যে কোনো জায়গায় মিল নেই (নাথিং ইন্‌ কমন্‌)।'

ফ্রাউ ভিন্‌টার কিন্তু এ-কথা বললেন না, হফ্‌মানও নীরব, যে সেদিনই হিটলারে গেলীতে তুমুল কথা-কাটাকাটি হয়, এবং সেপ্টেম্বর মাসে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত নাহলে—এবং সেদিন আদৌ হয়নি—অনেকেরই জানলা খোলা থাকে

বলে একাধিক প্রতিবেশী সে কলহের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পান। শাইরার প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা বলেন, (Shirar : The Rise & Fall of the Third Reich ; Aufstieg und Fall des dritten Reiches 1960/61) যে, গেলী ভিয়েনা গিয়ে গলা সাধবার জন্য আবার অনুমতি চাইছিল, এবং হিটলার পূর্বের ন্যায় কণ্ঠে অসম্মতি জানাচ্ছিলেন।

এই ব্যথাটা অস্বাভাবিক অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ গেলীর মৃত্যুর পর তার ঘরে ভিয়েনার গুরুর উদ্দেশে তার লেখা একখানা অর্ধসমাপ্ত চিঠি পাওয়া যায়। যেটাতে সে গুরুকে জানাচ্ছে, সে আবার ভিয়েনায় এসে তাঁর কাছে কণ্ঠসঙ্গীত শিখতে চায়।

ফ্রাউ ভিন্‌টার আরো বললেন যে, মিত্রসহ হিটলার চলে যাওয়ার পর গেলী তাঁকে বলে যে সে এক বন্ধুর (বা বান্ধবীর) সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছে, এবং তার জন্য যেন রাত্রের কোনো খাবার তৈরী করা না হয়। সে রাত্রে তিনি তাই গেলীকে আবার দেখতে না পেয়ে বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা করেননি। গেলী ব্রেকফাস্ট খেত ভোরেই, এবং সে যখন তার অভ্যাসমত ঐ সময়ে ব্রেকফাস্ট করতে এল না, তখন ফ্রাউ ভিন্‌টার তার ঘরে গিয়ে টোকা দিলেন। কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি চাবির ফুটো দিয়ে ভিতরের দিকে তাকাবার চেষ্টা দিলেন, কিন্তু চাবি ফুটোতে লাগানো এবং ঘর ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে ডাকেন। তিনি দরজা ভেঙে যখন ভিতরে ঢুকলেন, তখন সম্মুখে ভয়ানক দৃশ্য। গেলী এক ডোবা রক্তে পড়ে শুয়ে আছে, তার পিস্তলটা সোফার এক কোণে। ফ্রাউ ভিনটার তৎক্ষণাৎ গেলীর মাকে খবর দেন, এবং হেস্‌ ও পার্টির কোষাধ্যক্ষ শ্বার্ৎসকে জানান।

অনেকেই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু হফ্‌মানের আত্মচিন্তা এস্থলে বিশেষ মূল্য ধরে। তিনি বলছেন, 'হিটলার কি গেলীর আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ জানতেন ? তিনি যে শহর ছাড়ার সময় বলেছিলেন, "কেন জানি নে, আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে" সেটা কি ইন্দ্রিয়াতীত কোনো অনুভূতিসঞ্জাত অস্বস্তিবোধ, অথবা কি গেলীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার সময় এমন কিছু একটা ছিল যেটা তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ?'

তার চেয়ে যে জিনিস হফ্‌মানের কাছে একবারেই দুর্বোধ্য ঠেকেছিল সেটা এই : ফ্রাউ ভিন্‌টার বলেন, হিটলার এবং তিনি চলে যাওয়ার পর গেলী অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে নুয়ে পড়ে। এ তথ্যটা বুঝতে তাঁর কোনো অসুবিধা হল না, কিন্তু তারপর ফ্রাউ ভিন্‌টার যা বললেন সেটা তাঁর বিচার-বিবেচনাকে দিল একদম ঘুলিয়ে। ফ্রাউ ভিনটার বার বার জোর দিয়ে বললেন, গেলী হিটলার—একমাত্র হিটলারকেই ভালোবাসতো ; বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, গেলীর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকি-টাকি মন্তব্য ফ্রাউ ভিনটারকে দৃঢ়নিশ্চয় করেছিল হিটলারকেই গেলী ভালবাসে। হফমান বলছেন, 'কিন্তু আমার যতদূর জানা এবং ভালো করেই জানা—গেলী ভালাবাসতো অন্য একজনকে।'

এর সঙ্গে তাহলে আরেকটি তথ্য জুড়তে হয়, হফমানের ফোটো কর্মশালায়

তার কিছুদিন পূর্বে হিটলার শ্রীমতী এফা ব্রাউনের সঙ্গে পরিচিত হন[১২], যে এফাকে তিনি মৃত্যুর অল্প পূর্বে বিয়ে করেন, এবং হফ্‌মানের মতে তাঁদের বন্ধুত্ব নিবিড়তর হয় বেশ কিছুকাল পরে এবং গেলী মামাকে লেখা এফার একখানা চিঠি দৈবযোগে মামার কোটের পকেটে পেয়ে যায়। তাহলে বলতে হবে, ফ্রাউ ভিন্‌টারের রহস্য সমাধান হয়তো সম্পূর্ণ ভুল নাও হতে পারে।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও সেটা পরের এবং অনেক দিন ধরে চলছিল। গেলীর মা এমনিতেই এফা ব্রাউনকে পছন্দ করতেন না, এবং গেলীর মৃত্যুর পর সে অপছন্দটা পরিপূর্ণ ঘৃণায় গিয়ে পেঁছিল। হফ্‌মান এবং অন্যান্যরা তাঁকে যতই বোঝাবার চেষ্টা করতেন তিনি ততই অকুণ্ঠ ভাষায় জোর দিয়ে বলতেন, তাঁর মনে কণামাত্র দ্বিধা নেই যে, তাঁর মেয়ে হিটলারকেই ভালোবাসতো এবং ঐ এফা ব্রাউনের অস্তিত্ব ও হিটলারের উপর তার প্রভাব গেলীকে গভীরতর নৈরাশ্যে নিমজ্জিত ক'রে দেয়, এবং এইটেই গেলীর অকাল মৃত্যুর অন্যতম প্রধানতম কারণ।

* * *

এদেশের জোরালো গোটা দু'তিন দল তাদের বেপরোয়া আপন আপন দৈনিক নেই বলে বহু কেলেঙ্কারি-কেচ্ছা অনায়াসে চাপা পড়ে। ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশে অবস্থাটা ভিন্ন প্রকারের। বিশেষতঃ ভাইমার রিপাবলিক যুগে —এই খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে, হিটলার চ্যানসেলার না হওয়া পর্যন্ত (১৯৩৩) জর্মনির খবরের কাগজে কাগজে নরক ছিল গুলজার, বিশেষত জর্মনরা যখন ইংরেজী খবরওলাদের 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' 'থীভ্‌স্‌ এগ্রীমেণ্টে' আদৌ বিশ্বাস করে না। তাই মুনিকের খবরের কাগজগুলোর অস্বাভাবিক মৃত্যু যেন মৌচাকের উপর ঢিলের মত হয়ে এসে পড়ল। আর কাফে কাফে বারেতে বারেতে গুজোবগুঞ্জরণের তো কথাই নেই। এমন কি নাৎসি পার্টির ভিতরও নানা মুনি নানা মত দিতে লাগলেন। যারা সরাসরি দুশমন তাদের একদল বেশ জোর গলায় বললে, 'নাৎসি পার্টি' তার প্রভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে অটপসি আদৌ করাতে দেয়নি, করোনারের সামনে যা-কিছু ঘটেছে তার সমস্তটাই আগাগোড়া থাড্ডো কেলাসী থিয়েডারের ফার্স', এবং এক দল বললে, 'তাই হবে, কারণ এটা আত্মহত্যা নয়, আসলে খুন, এবং খুনী স্বয়ং হিটলার। তিনি হামবুর্গ পানে রওয়ানা হয়েছিলেন সত্য কিন্তু সেটা ছিল ফাঁদ পাতার মত। সন্ধ্যার সময় ফের বাড়ি ফিরে আসেন, এবং গেলীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে এমন অবস্থায় পান যে তখন হিটলারের মত হিংস্র প্রাণীর মাথায় যে খুনচাপবে তাতে আর বিচিত্র কি?' অন্য দলের বক্তব্য, 'না, পরপুরুষ ছিল না, শুধু গেলীর ভিয়েনা যাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে কথা-কাটাকাটি এমনই চরমে পেঁছিয় যে হিটলার আত্মকর্তৃত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন এবং উন্মাদাবস্থায়

---

১২ শাইরার বলেন, হিটলার ও ব্রাউনের পরিচয় হয় গেলীর মৃত্যুর এক বা দুই বৎসর পরে। কিন্তু এ বিষয়ে হফমানের বক্তব্যই অধিকতর বিশ্বাস্য।

গেলীকে খুন করেন।' আবার কেউ কেউ বললেন, 'না, খুন করেছেন হিমলার। পার্টির মুরুব্বীরা যখন দেখলেন যে হিটলারের খোলাখুলি বেলেল্লাপনার ঠেলায় পার্টির ইজ্জৎ যায়-যায় (যদিও আমি যতদূর জানি জনসমাজে গেলীর সঙ্গে হিটলারের আচরণ ছিল ভদ্র, সংযত, ইংরিজিতে যাকে বলে 'করেক্ট্'; অন্যপক্ষের বক্তব্য আমরা যদি মিনিমাম্‌টাও নিই সেটাও যথেষ্ট খারাপ, কারণ এ-কথা তো আর মিথ্যে নয় যে, 'তুমি মেয়েটাকে ভালোবাসো এবং তাকে নিয়ে একই বাড়িতে বাস করো, আর তার মাকে রেখেছ দূরে গাঁয়ের বাড়িতে যখন তুমি তাঁকেও অনায়াসে এখানেই রাখতে পারতে—'), ওদিকে হিটলার ছাড়া যে পার্টি দুদিনেই কাত হয়ে যাবে সেটাও অবিসংবাদিত সত্য, তখন তাঁরা পার্টি বাঁচাবার জন্য হিমলারের উপর গেলীকে সরাবার ভার দিলেন। কর্মটি করেছেন হয় স্বয়ং তিনি বা তাঁর কোনো গুণ্ডাকে দিয়ে (পার্টিতে যে গুণ্ডার অভাব ছিল না সে তথ্যটি সবাই জানতেন, এবং না থাকলে নাৎসি পার্টি যে রাস্তায় কম্যুনিস্টদের ঠেলায় একদিনও টিকতে পারতো না সেটা আরো সত্য)। ইত্যাকার নানাপ্রকারের গুজোবে তখন জর্মনি ম-ম করছে, কারণ গেলীর মৃত্যুর পূর্বেই নাৎসি পার্টি এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে রাস্তার উপর কারণে অকারণে যাকে তাকে চ্যালেঞ্জ করে, এবং কম্যুনিস্টদের কাউকে একা পেলে তাকে পেটাতেও কসুর করে না; প্রতিদিন আবার কানে আসছে, এই বুঝি প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ নাৎসি নেতা হিটলারকে ডেকে পাঠাবেন, হয় আপন মন্ত্রিসভা গড়ে প্রধানমন্ত্রী—চ্যানসেলর হতে, কিংবা কোয়ালিশন সরকার নির্মাণ করতে।

আমি তখন ম্যুনিকে বাস না করলেও জর্মনিতে, এবং প্রতিদিন লাঞ্চ-টেবিলে বন্ধুদের আলোচনা, কথা-কাটাকাটি শ্রবণই ছিল আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের রীডিং রুম ম্যুনিক তথা জর্মনির সব বড় বড় শহরের প্রধান প্রধান খবরের কাগজ রাখতো, তদুপরি আমাদের কেউ না কেউ ম্যুনিক আসা-যাওয়া করছে, আর একজন তো খাস ম্যুনিকবাসী—সে শহরের বিরাট ম্যাপ খুলে হিটলারের বাড়ি, তিনি যে যে কাফেতে যান, সবগুলো পিন্ ডাউন করতে পারতো। কাজেই আমাদের লাঞ্চ-টেবিলে গুজবেরও অনটন ছিল না। কিন্তু এটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে এতদিন পরে আজ আমি তার অধিকাংশই ভুলে গিয়েছি। তবে, ঘটনার প্রায় কুড়ি বৎসর পর থেকে যখন হিটলার সম্বন্ধে নানাপ্রকার পুস্তক বেরুতে আরম্ভ করলো (গেলী আত্মহত্যা করে ১৯৩১-এ; হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে ডেকে পাঠান তার তিন সপ্তাহ পরে এবং আলাপচারী যে নিষ্ফল হয় তার একমাত্র কারণ স্বরূপ নাৎসিরা বলেন, হিটলার গেলীর মৃত্যুশোক তখনো সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেননি বলে সমস্ত চিন্তাশক্তি একাগ্রচিত্তে ব্যবহার করতে পারেননি—ঘন ঘন আনমনা হচ্ছিলেন; ১৯৩৩-এর জানুয়ারী মাসে হিটলার চ্যানসেলর হন, ১৯৩৯-এ তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ করেন, ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫-এ তিনি আত্মহত্যা করেন;

খৃষ্টাব্দে, এবং অধুনা ১৯৬১—প্রকাশিত শাইরারের ১১৭৪ পৃষ্ঠার যে বিরাট বই বাজারে নাম করেছে তাতে কোনো মৌলিকতা নেই এবং আমার মনে হয় তিনি হফ্‌মানের বইখানা হয় পড়েননি, নয় একপেশে বলে খারিজ করেছেন। বলা বাহুল্য বুলক, শাইরার এবং শতকরা ৯০ খানা বই রাজনৈতিক তথা যুদ্ধবিদ্‌ হিটলারকে নিয়ে আলোচনা করে বলে তার মধ্যে প্রেম অল্প স্থানই পায়, এবং তারও অধিকাংশ পান এফা ব্রাউন, গেলী সত্যিই এখনো 'কাব্যের উপেক্ষিতা'!) তখন দেখে বড় আশ্চর্য বোধ হল যে তখনকার দিনে যেসব গুজোব আমরা সেফ্‌ গাঁজা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলুম তার অনেকগুলোই এসব পুস্তকে রীতিমতো সম্মানের আসন পেয়েছে, এবং যেগুলোকে আমরা সত্য বা সত্যের নিকটতম বলে স্বীকার করে নিয়েছিলুম সেগুলোর উল্লেখ পর্যন্ত নেই!

অবশ্য এ-কথা উঠতে পারে যে, হফ্‌মানের মতে হিটলার গেলীর আত্মহত্যার জন্য নিতান্ত পরোক্ষভাবে দায়ী, আদৌ যদি তাকে দায়ী করা হয়, তিনি গেলীকে কড়া শাসনে রাখতেন (হিটলারের সাফাই 'আজ গেলী যেটাকে বন্ধন বলে মনে করছে সেটা বিচক্ষণ আত্মজনের সুচিন্তিত সতর্কতা') আবার ওদিকে বলেছেন, 'গেলী ছিল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত সদাই আত্মহত্যার জন্য মুখিয়ে থাকা টাইপের একদম খাঁটি উল্টোটি। তার প্রকৃতি ছিল বেপরোয়া, জীবনের মুখোমুখি হত সে প্রতিদিন নিত্য নূতন সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে—এসব ভাবলে তো কিছুতেই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে সে আপন জীবন আপন হাতে নিতে নিজেকে বাধ্য অনুভব করলো।'

হফ্‌মান কৃত তাঁর সখা হিটলারের জীবনী হয়তো অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখবেন, ভাববেন, রাজনৈতিক এবং গ্যাস-চেম্বারের প্রবর্তন ও সফলীকরণ-কর্তা হিটলারকে তিনি সমর্থন করতে না পেরে—অবশ্য এটা সবাই স্বীকার করেছেন যে আর্ট ভিন্ন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তিনি অতি বেবেসেবে হিটলারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং আরো সত্য যে হিটলার, বিশেষ করে গ্যোবলসের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ডাঙরতম সরকারী চাকরি বা পার্টিতে কোনো গণ্যমান্য আসন নিতে নারাজের চেয়ে নারাজ সম্পূর্ণ নারাজ ছিলেন, অতএব রাজনৈতিক হিটলারকে দোষী বা নির্দোষী প্রমাণ করার হাত থেকে তিনি (সানন্দে) অব্যাহতি পেয়েছেন—তিনি 'মানুষ হিটলার'কে অযথা অপবাদ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ-নেমকহালালী প্রশংসনীয়, কিন্তু সে কর্ম করতে গিয়ে তিনি কতখানি সত্যবাচন করেছেন সেটা অনেকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করবে।

আমি তাঁকে মোটামুটি বিশ্বাস করেছি, এবং দৈনন্দিন জীবনে হিটলার যেখানে 'ছোট লোক' সেখানে পুৎসি হান্‌ফ্‌স্টেঙ্গেলের—হিটলারের বিরুদ্ধে তাঁর বহুস্থলে অহেতুক বিষোদ্‌গার সত্ত্বেও—অনেক কথা মেনে নিয়েছি।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আমার মনে হয়েছিল এবং এখনও মনে হয়, হিটলার জানতেন এবং ভাল করেই জানতেন যে গেলী ভিয়েনার এক আর্টিস্টকে গভীর ভাবে ভালোবাসতো (আমার মনে হয়, হফ্‌মান যে বলছেন, হিটলার সে-

খবরটি জানতেন না, এটা তাঁর ভুল এবং গেলীর ভিয়েনা যাবার জন্য উৎসাহ এবং মামাকে পীড়াপীড়ি সেখানে যাবার অনুমতির জন্য)। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে গেলী বরাবরই ম্যুনিকের রাজসিক বাসভবন, অতি সাধারণ মেয়ের জন্য সমাজে সর্বোচ্চ আসন, ম্যুনিকের সর্বজন সম্মানিত মামার 'গরবে গরবিনী' হওয়া, সেই গ্রেট মামার প্রেমনিবেদন তারই পদপ্রান্তে, সে মামা আবার তার কথায় কথায় ওঠ-বস করেন, সর্বোত্তম থিয়েটার অপেরায় সর্বশ্রেষ্ঠ আসনাধিকার, এক কথায় বলতে গেলে ম্যুনিকের মত সুখৈশ্বর্য, সর্বপ্রকারের বিলাস, চিত্তহারিণী আমোদ-প্রমোদ দিতে সক্ষম—এসব ছেড়ে ভিয়েনাতে তাকে থাকতে হত সাধারণ—অবশ্য অপেক্ষাকৃত বিত্তশালিনী—ছাত্রীর মত। এ দুয়ের আশমান জমীন ফারাক। শুধু সঙ্গীতে পারদর্শিনী হওয়ার জন্য এত বড় সুখসম্মান বিসর্জন? আমার বিশ্বাস হয় না। পুলিস যখন কটুবাক্য ব্যবহার করে বলেন, 'মেয়েটা পয়লা নম্বরের স্ফূর্তিবাজ ফ্লার্ট, কণ্ঠসঙ্গীত উচ্চতম পদ্ধতিতে আয়ত্ত করতে হলে যে অধ্যবসায় ও ফুর্তিফার্তি বিসর্জন অবশ্য প্রয়োজনীয় সে-দুটো গেলীর ছিল কোথায়?' তখন আমার মনে হয় গেলীর মন পড়ে থাকতো ভিয়েনায়, যেখানে সে অধ্যবসায়ের সঙ্গে রেওয়াজ করবে ও সন্ধ্যায় পাবে তার আর্টিস্ট দয়িতের কাছে অনুপ্রেরণা, যদি সেখানে দৈন্যেও বাস করতে হয়, সেটা সে ভাগাভাগি করবে তারই সঙ্গে; তার তুলনায় ম্যুনিকে মামার সঙ্গে বাস করে, মনে মনে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থেকে উৎকৃষ্টতম বিলাসভোগ শতগুণে নিকৃষ্ট। ভিয়েনার ছাত্রজীবনের স্বাধীনতা, তরুণ-তরুণীর সঙ্গে সম্মিলিত আনন্দোল্লাস নিশ্চয়ই ম্যুনিকের বন্দীশালা এবং প্রতি সন্ধ্যায় কাফেতে মামা এবং তার বুড়োহাবড়া ভারিক্কি-ভারিক্কি রাজনৈতিক পার্টি-মেম্বারদের সঙ্গে বসে প্রসন্নতা এমন কি উল্লাসের ভান করার চেয়ে শতগুণে শ্রেয়, কিন্তু সেইটেই তত্ত্বকথা নয়—তত্ত্বকথা ঐ দয়িতের সঙ্গ-সুখ। সঙ্গীতই যদি বড় কথা হবে তবে ম্যুনিক কি অজ পাড়াগাঁ? ম্যুনিকে ঠিক সে সময়ে হয়তো কোনো 'মেস্ত্রো' 'ওস্তাদের ওস্তাদ' ছিলেন না, কিন্তু গেলী যে ভিয়েনাতে কোনো মেস্ত্রোর কাছে সঙ্গীতাধ্যয়ন করেছিল এ-কথা তো কেউ বলেনি। না, সঙ্গীত তার শেষ বচসার এবং সবশেষে নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যার কারণ নয়।

হফ্‌মান বুঝতে পারেননি, কিংবা বলতে ভুলে গেছেন—সেটা পরবর্তী যুগের সহচরগণ বার বার উল্লেখ করেছেন—হিটলার ঝান্ডুঝান্ডু সুপক্কতম রাজনৈতিক-দের পেটের কথা টেনে বের করার কৌশলটিতে সুপটু ছিলেন। আর এ তো চিংড়ি ভাগ্নি! হয়তো মামা তাঁর প্রেম নিবেদন করার পূর্বেই আবেগ-বিহ্বল তরুণী মামার সহানুভূতি ও আনুকূল্য পাবার আশায় পূর্বাহ্নেই সব কিছু বলে বসে আছে। কিংবা হয়তো হিটলার যখন লক্ষ্য করলেন, গেলী তাঁর প্রেমের উপযুক্ত প্রতিদান দিচ্ছে না তখন সেটা চেপে দিয়ে আঁকশি চালিয়ে বের করলেন গেলীর পেটের কথা—বরঞ্চ বলা উচিত হৃদয়ের ব্যথা। এবং তারই বা কী প্রয়োজন? সেই ১৯৩১ সালেই তাঁর পার্টির অসংখ্য স্পাই ছিল

ভিয়েনায়—যে নগরে তিনি নিজে যৌবনের একাংশ রাস্তায় রাস্তায় স্বহস্তে অঙ্কিত পিকচার পোস্টকার্ড ফেরি করেছেন—নইলে ১৯৩৪এ, এ ঘটনার মাত্র আড়াই বৎসর পরে তিনি তাঁর পার্টির লোকের দ্বারা ভিয়েনা শহরের জন-সমাগমে পরিপূর্ণ দফতরে অস্ট্রিয়ান প্রধানমন্ত্রী ডলফুস্‌কে খুন করলেন কি প্রকারে? এবং তার চার বৎসর পরে একটিমাত্র গুলি না চালিয়ে ভিয়েনা দখল করলেন কি কৌশলে? তার তুলনায় একটি সাদামাটা ছাত্রী ভিয়েনাতে কি ভাবে জীবন-যাপন করেছিল সেটা বের করা তো অতি সহজ। ভিয়েনাতে সে-যুগে বিস্তর প্রাইভেট ডিটেকটিভও ছিল।

আমার মনে হয়—বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—বুদ্ধিমতী গেলী তার মামার চরিত্রের একটা দিক আবিষ্কার করতে পেরেছিল তখনই, যেটি বিশ্বমানব আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হল পুরো পনেরোটি বৎসর পরে, এবং তাও সম্ভব হত না, যদি যুদ্ধে হিটলার পরাজিত না হতেন এবং ফলে গ্যাসচেম্বার ইত্যাদি আবিষ্কৃত না হত। সে তত্ত্বটি—হিটলার কী অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর দানব!—এই তত্ত্বটি গেলী আবিষ্কার করে এক বিভীষিকার সম্মুখীন হল। হিটলার যে কোনো মুহূর্তে, কারো সুখদুঃখের কথা মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে তার দয়িতকে নিষ্ঠুরতম পদ্ধতিতে খুন করাতে পারেন। আজ যদি কেউ বলে, এই ভয় দেখিয়েই ব্ল্যাকমেল করে হিটলার গেলীকে ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত তাঁর মুনিকের বাড়িতে—আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন কিন্তু বস্তুত পরাধীনের চেয়েও পরাধীন ভাবে—আটকে রেখেছিলেন, তবে সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হবে কেন? এবং হয়তো ঐ চার বৎসর ধরে তাকে বাধ্য হয়ে 'রক্ষিতার লীলাখেলা'ও খেলতে হয়েছিল। হফ্‌মান বলেছেন, গেলীর চরিত্রবল ছিল দৃঢ় এবং সে ছিল 'স্পিরিটেড গার্ল'। মুনিক থেকে অস্ট্রিয়ার পথ কতখানি? আর বের্ষটেশ-গাডেনের বাড়ি থেকে তো অস্ট্রিয়ান সীমান্ত আরো কাছে। পায়ে হেঁটে ওপারে যাওয়া যায়। বস্তুত হিটলার সেই কারণেই বেছে বেছে ঐ জায়গাটিতেই বাড়ি কিনেছিলেন। এপারে, অর্থাৎ রাজনৈতিক বাতাবরণ বড় বেশী উষ্ণ হয়ে পড়লে, কাউকে না জানিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে দিয়ে অক্লেশে ওপারে যেতে পারবেন বলে—অঞ্চলটাও অস্বাভাবিক নির্জন এবং ঐ যুগে পাসপোর্টের কড়াকড়ি তো ছিল না, এসব জায়গায় যারা নিত্য নিত্য ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে এপার-ওপার করতো তাদের তো পাসপোর্ট আদৌ থাকতো না।

এমন অবস্থায়ও 'স্পিরিটেড' গেলী গ্রামে থাকাকালীন ওপারে চলে গিয়ে ভিয়েনা যেতে পারলো না?—সেখান থেকে ভিয়েনাও তো রেলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। না, তা নয়। অমতে যাওয়ার মানেই হত, দয়িতের অবশ্য-মৃত্যু। এবং পরে সে নিজেও হয়তো কিড্‌ন্যাপ্‌ট্‌ হতে পারতো। তাই সে আপন কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বলেছিল, হফ্‌মানের স্ত্রীকে: 'Well that's that! And there's nothing you or I can do about it. So let's talk about something else.' এ কথোপকথনের উল্লেখ আমি পূর্বেই করেছি।

হয়তো আমার নিছক কল্পনা। কিন্তু আমার মনে হয় গেলী দিনের পর দিন অভিনয় করে গেছে (যেটা হফ্‌মান ঠিক ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু পুৎসি বুঝতে না পেরে 'ঢলাঢলি' বলেছেন), যদি শেষ পর্যন্ত মামার মন গলানো যায়। যখন দেখল কোনো ভরসাই নেই তখন করেছিল শ্মশান-চিকিৎসা—পুরোপুরি ঝগড়া, যেটা একাধিক প্রতিবেশী শুনতে পেয়েছিল, এবং হয়তো বা—হয়তো বা আত্মহত্যার ভয়ও দেখিয়েছিল এবং হয়তো তার চোখে-মুখে তখন এমন ভাব ফুটে উঠেছিল যে চতুর—শঠ—হিটলার বুঝেছিলেন, এ ভয় দেখানোটা নিতান্ত শূন্যগর্ভ নয়, এটা আর পাঁচটা হিস্টেরিক (এবং হফ্‌মান বলেছেন, গেলী আদপেই হিস্টেরিক ছিল না) মেয়ের মত নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ নয়। তাই বোধ হয় মুনিক শহর থেকে বেরোবার সময় সখাকে বলেছিলেন, 'কেন জানি নে আমার মনটা যেন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে, 'I don't know why, but I have a most uneasy feeling' তাই তাঁর পরবর্তী বিষণ্ণতা। পথিমধ্যে টেলিফোনের কথা শুনেই যেন বুঝতে পেরেছিলেন, এ টেলিফোনে থাকবে গেলী-সম্বন্ধে দুঃসংবাদ।

এ অনুমান যদি সত্য হয় তবে বলতে হবে গেলী যে ভয় দেখিয়েছিল সেটা শূন্যগর্ভ, ফাঁকা আওয়াজ ছিল না। সে সেটা কাজে পরিণত করেছিল প্রথমতম সুযোগেই।

গেলীর আত্মহত্যায় হিটলারের শোক

হিটলারের চরিত্রবল ছিল অসাধারণ এবং তাঁর ভেঙে পড়াটাও ছিল অসাধারণ। তবে যে দুটো ভেঙে পড়ার কারণ ইতিহাসের জানা আছে, তার শেষটা আত্মহত্যা করার কয়েক দিন আগের থেকে—তাঁর খাসচাকর (ভ্যালে) লিঙে সেটির কিছুটা বর্ণনা দিয়েছেন, এবং আর একটা, গেলীর মৃত্যুর পর। দুটো প্রায় একই প্রকারের।

প্রথম দুদিনের খবর কেউ ভালো করে লেখেননি, তবে তখনকার দিনের অন্যতম প্রধান নাৎসী নেতা গ্রেগর স্ট্রাসার পরে বলেন যে, এ দুদিন তিনি এক মুহূর্ত হিটলারের সঙ্গ ত্যাগ করেননি, পাছে তিনিও আত্মহত্যা করেন।[১৩]

এরপর তাঁর সঙ্গে ছিলেন, একমাত্র সাক্ষীরূপে, আমাদের পূর্বপরিচিত হফ্‌মান। এবার তাঁকে অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। এটা সত্যই ওয়ান ম্যান্‌স্‌ স্টোরি। তিনি বলছেন, মুনিক্যে ফেরার পর দুদিন পর্যন্ত

---

১৩ বোধহয় তারই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ স্ট্রাসারকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন 'জোলাপে'র (এটার উল্লেখ আমরা একাধিকবার করেছি) সময় মেরে ফেলা হয়।

হিটলারকে আমি আদৌ দেখতে পাইনি। তাঁর স্বভাব আমি ভালো করেই জানতুম এবং বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতিতে আমি উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলুম যে, তিনি হয়তো নির্জনে একা একা থাকাটাই বেশী পছন্দ করবেন—আমিও তাই তাঁর পাশ ঘেঁষিনি। তারপর হঠাৎ মাঝরাতে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজলো। নিদ্রাজড়িত অবস্থায় আমি গেলুম উত্তর দিতে।

হিটলারের গলা। 'হফ্‌মান, এখনো জেগে আছ কি? কয়েক মিনিটের তরে আমার এখানে আসতে পারো কি?' হিটলারেরই গলা বটে কিন্তু কেমন যেন অদ্ভুত অচেনা।, সে কণ্ঠস্বর ক্লান্ত আর সর্ব অনুভূতি গ্রহণে জড়ত্বে চরমে গিয়ে পেঁচেছে। পনরো মিনিট পরেই আমি তাঁর কাছে পেঁছিলুম।

দরজা তিনি নিজেই খুলে দিলেন। অভ্যর্থনাসূচক কোনো কথা না বলে নীরবে তিনি আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন—তাঁকে দেখাচ্ছে বিরস, যেন সর্ব আত্মজন-বিবর্জিত। বললেন, 'হফ্‌মান, আমাকে তুমি সত্যিকার একটি মেহেরবানি করবে কি? আমি এ বাড়িতে আর টিকতে পাচ্ছি নে, যেখানে আমার গেলী মরে গেছে, ম্যুলার টেগার্নজে হ্রদের উপর তার সেণ্ট কুইরীনের বাড়ি আমাকে থাকতে দিতে চেয়েছে; তুমি আমার সঙ্গে আসবে? গেলীর কবর না হওয়া পর্যন্ত সে কটা দিন আমি সেখানেই থাকতে চাই। ম্যুলার কথা দিয়েছে, সে ও-বাড়ির চাকর-বাকর সব কটাকে ছুটি দিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দেবে। একমাত্র তুমিই সেখানে থাকবে আমার সঙ্গে। আমাকে এ অনুগ্রহটা তুমি করবে কি?' তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল সনির্বন্ধ মিনতির অনুনয়; বলা বাহুল্য, আমি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালুম।

সেণ্ট কুইরীন বাড়ির প্রধান ভৃত্য বাড়ির চাবিটা আমার হাতে তুলে দিল। বিস্ময় এবং সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে শোকাঘাতে ভেঙে-পড়া হিটলারের দিকে একবার তাকিয়ে সে চলে গেল। সোফার শ্রেক্ আমাদের সে বাড়িতে পেঁছিয়ে দেওয়ার পর তাকেও ফেরত পাঠানো হল। চলে যাওয়ার আগে সে কোনো গতিকে সুযোগ করে আমাকে কানে কানে বলে গেল, সে হিটলারের রিভলবার সরিয়ে নিয়েছে, কারণ তার ভয় পাছে নৈরাশ্যের চরমে পেঁছে তাঁর আত্মহত্যা করার প্রলোভন হয়। এবারে রইলুম সুদ্ধ মাত্র আমরা দুজন—আর একটিমাত্র জনপ্রাণী নেই। হিটলার উপরের ঘরে আর আমি ঠিক তার নীচের ঘরটায়।

সে-বাড়িতে হিটলার আর আমি—মাত্র এই দুজন। আমি তাঁকে তাঁর ঘর দেখিয়ে বেরিয়ে যেতে না যেতেই তিনি দু'হাত পিছনে নিয়ে এক হাতে আরেক হাত ধরে পাইচারি করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তাঁর খেতে ইচ্ছে করছে কিনা। একটিমাত্র শব্দ না বলে তিনি শুধু মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালেন। আমি তবু এক গেলাস দুধ আর কিছু বিস্কুট উপরে নিয়ে তাঁর ঘরে রেখে এলুম।

আমি আপন কামরার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিলুম উপরের পাইচারির তালে তালে ওঠা ভারী শব্দ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চললো সেই পাইচারি,—এক-

বারও ক্ষান্ত দিল না, একবারও জিরুলো না। রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এল—আমি তখনো শুনছি তাঁর একটানা পাইচারি, ঘরের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত, ফের ঐ প্রান্ত থেকে এ-প্রান্ত। সেই একটানা শব্দের মোহে আমি অল্প কিছু-ক্ষণের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্নই হয়ে গিয়েছিলুম। হঠাৎ কি যেন আমাকে আচমকা ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ সচেতন করে দিল। পাইচারি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আর যেন মৃত্যুর নীরবতা চতুর্দিকে বিরাজ করছে। আমি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। তবে কি করছেন হিটলার এখন ··? অতি সন্তর্পণে এবং মৃদু পদক্ষেপে আমি যেন লুকিয়ে উপরের তলায় গেলুম। ওঠবার সময় কাঠের সিঁড়ি অল্প অল্প ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করলো। আমি দরজায় পেঁছিতেই—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আবার পাইচারিটা আরম্ভ হল। বুকের বোঝা যেন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল ; আমি চুপিসাড়ে আপন ঘরে ফিরে এলুম।

এবং এইভাবে চললো সমস্ত দীর্ঘরাত ধরে সেই পাইচারি—ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্তহীন দীর্ঘ ঘণ্টা। আমার মন চলে গেল আমাদের বিগত একাধিকবার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-পরিপূর্ণ টেগের্নজে হ্রদের কোলে লালিত বাড়িতে আসার স্মরণে। তখন সব কিছু কতই না সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল!

গেলীর মৃত্যু আমার বন্ধুর গভীরতম সত্তাকে নাড়া দিয়ে কাঁপিয়ে তুলেছে। তবে কি তিনি নিজেকে তার জন্য দায়ী অনুভব করছিলেন? তিনি কি অনুতপ্ত আত্ম-অভিযোগ দিয়ে আপন সত্তাকে কঠোরতম যন্ত্রণা দিচ্ছিলেন? তিনি এখন করবেনই বা কি? এ ধরনের অনেক প্রশ্ন আমার মাথার ভিতরে ক্রমাগত হাতুড়ি পেটাচ্ছিল, আর আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না একটারও উত্তর।

ঊষার প্রথম আবির্ভাব অন্ধকার আকাশকে আলোকিত করে তুলছিল, এবং আমি আমার জীবনে ঊষাগমনের জন্য হৃদয়ের ভিতর কখনো এতখানি কৃতজ্ঞ অনুভব করিনি। আমি আবার উপরে গিয়ে তাঁর দরজায় মৃদু করাঘাত করলুম। কোনো উত্তর এল না। আমি ভিতরে গেলুম কিন্তু হিটলার আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে বিস্মৃতিতে নিমগ্ন হয়ে আমাকে লক্ষ্যমাত্র করলেন না। দেহের পিছনে এক হাত দিয়ে অন্য হাত ধরে, সুদূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কিন্তু কোনো জিনিস না দেখে, তিনি তাঁর অন্তহীন পাইচারি চালিয়ে যেতে লাগলেন। যন্ত্রণায় তাঁর মুখের রঙ পাঁশুটে, ক্লান্তিতে সেটা ঝুলে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি চেহারাটাকে করে দিয়েছে বিসদৃশ, চোখ দুটো ডুবে গিয়েছে কোটরের গভীরে, সেগুলোর নিচের অংশ কালো ছায়ায় কৃষ্ণমসীলিপ্ত, আর ঠোঁট দুটো একটা আরেকটাকে চেপে ধরে এঁকেছে যেন তিক্ত অভিশপ্ত একটি রেখা। দুধ আর বিস্কুট স্পর্শ করা হয়নি।

চেষ্টা করেও সামান্য একটা কিছু খাবেন না তিনি, প্লীজ? আমি শুধালুম। আবার কোনো উত্তর এল না, শুধু সামান্য একটু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন। আমি মনে মনে ভাবলুম, অন্তত অল্প কিছু একটা ওঁকে খেতেই হবে, নইলে তিনি যে হুমড়ি খেয়ে ভিরমি যাবেন। আমি ম্যুনিকে আমার বাড়িতে ফোন

করে শুধালুম, স্পাগেত্তি[১৪] কি করে রাঁধতে হয় ? হিটলারের অন্যতম প্রিয় খাদ্য এটি। সেখান থেকে পাকপ্রণালীর যে দিকনির্দেশ পেলুম বর্ণে বর্ণে সেই অনুযায়ী আমি রন্ধনকলায় আমার নৈপুণ্য আছে কিনা সেই পরীক্ষাতে প্রবেশ করলুম। আমার নিজের মতে ফলটা ভালোই ওৎরালো। কিন্তু আবার আমার ভাগ্য বাম। যদিও এই ধরনের স্পাগেত্তি তাঁর প্রিয় খাদ্য, যদিও আমি আমার রন্ধন-নৈপুণ্য প্রশংসা-প্রশংসায় সপ্তম স্বর্গ অবধি তুলে দিয়ে তাঁকে অনুনয়-বিনয় করলুম, চেষ্টা দিয়েও অতি অল্প একটুখানি মুখে দিতে—আমার মনে হল আমি যা কিছু বলেছি, সে তাঁর দুপাশ দিয়ে চলে গেছে, তিনি তার এক বর্ণও শোনেননি।

ধীরে মন্থরে দিনটা তার সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলল, তারপর এল আরেকটা রাত্রি, সেটা আগেরটার চেয়েও বিভীষিকাময়। আমি আমার সহ্যশক্তি, আত্মকর্তৃত্বের শেষ সীমানায় পেঁছে গিয়েছি। জেগে থাকা আমার পক্ষে এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে ; ওদিকে উপরে সেই পাইচারি চলেছে তো চলেছে অবিরাম, আর তার শব্দ যেন কেউ তুরপুন দিয়ে আমার খুলি ফুটো ক'রে ভিতরে ঢোকাচ্ছে। যেন এক ভয়াবহ উত্তেজনা তাঁকে তাঁর পায়ের ওপর রেখে চলেছে এবং কিছুই তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে না।

তারপর এল আরেকটা দিন। আমি নিজেই তখন যে কোনো মুহূর্তে আপন সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় জড়নিদ্রায় অভিভূত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতে পারি। আমার নড়াচড়া আমার কাজকর্ম করা সব কিছু যন্ত্রচালিত বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত অন্ধশক্তির প্রকাশ মাত্র। কিন্তু মাথার উপর পদধ্বনি কক্‌খনো থামেনি।

সন্ধ্যা ঘনানোর পর আমরা শুনলুম, গেলীর গোর হয়ে গিয়েছে, এবং হিটলারের সে-গোরের দিকে তীর্থযাত্রারম্ভ করতে কোনো অন্তরায় নেই। সেই রাত্রেই আমরা রওয়ানা দিলুম। নিঃশব্দে হিটলার ড্রাইভার শ্রেকের পাশে বসলেন। আমার উপরে যে অসহ্য চাপ আমাকে ধরে রেখেছিল সেটা যেন হঠাৎ ছিঁড়ে দু-টুকরো হয়ে গেল আর আমি গাড়ির ভিতর সেই অবসাদজনিত অঘোর নিদ্রায় ঘণ্টাখানেক কিংবা ঘণ্টা-দুই ঘুমিয়ে নিলুম। ভোরের দিকে আমরা ভিয়েনা পেঁছিলুম, কিন্তু এই সমস্ত দীর্ঘ চলার পথে হিটলার একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করেননি।

আমরা সোজা নগরের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে কেন্দ্রীয় গোরস্থানে পেঁছিলুম। এখানে এসে হিটলার একা গোরের দিকে গেলেন। সেখানে পেলেন তাঁর নিজস্ব দুই এডিকং শ্বার্ৎস এবং শাউব—তারা সেখানে তাঁর জন্য

---

১৪ ইতালিয়দের স্টেপ্‌লফুড্—আমাদের ভারতের মত নিত্য খাদ্য। মাক্কারনী, স্পাগেত্তি, ভেরমিচেল্লি ইত্যাদি। সবই ময়দার তৈরী, অনেকটা মুসলমানদের সেঁওইয়ের মত। রান্না করা হয় নানা পদ্ধতিতে, তার শত শত রেসিপি (পাকপ্রণালী) আছে।

অপেক্ষা করছিলেন। আধঘণ্টার ভিতরই তিনি ফিরে এলেন এবং গাড়ি ওবেরজাল্‌ৎস্‌বের্গে চালিয়ে নিতে হুকুম দিলেন।

গাড়িতে উঠতে না উঠতেই তিনি কথা আরম্ভ করলেন। উইণ্ডস্ক্রীনের ভিতর দিয়ে তিনি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যেন আত্মচিন্তা করছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট কথা বলে বলে। 'আচ্ছা! তাই সই!' বললেন তিনি। 'আরম্ভ হোক তবে এখন সংগ্রাম—যে সংগ্রাম শিরোপরি কৃতকার্যতার বিজয়মুকুট পরবেই পরবে, পরতে বাধ্য।' আমরা সকলেই বিধির এক বিরাট আশীর্বাদ-প্রাপ্ত স্বস্তি অনুভব করলুম।...

এরপর হিটলার ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর বক্তৃতাসফরে। আজ এখানে কাল সেখানে, এমন কি একই দিনে দু'তিন ভিন্ন ভিন্ন নগরে বক্তৃতা দিয়ে যেতে লাগলেন। সেগুলো আগের চেয়ে যেন শ্রোতাদের করে দেয় অনেক বেশী আত্মহারা, যেন তাদের চিন্তাধারাকে তিনি হুকুম দিয়ে বাধ্য করছেন তারা যাবে কোন্ পথে। এবং শ্রোতাকেও বক্তৃতা দিয়ে আপন মতে টেনে আনার শক্তি যেন তাঁর বেড়ে গেছে শতগুণে। হফ্‌মান বলছেন, এই শহর থেকে শহর ছুটোছুটি, প্রথমে জর্মনির সব চেয়ে শক্তিশালী মোটর মের্ৎসেডেজে করে, পরে আপন অ্যারোপ্লেনে (অনেকেই বলেন রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডার জন্য ইওরো-আমেরিকায় হিটলারই সর্বপ্রথম নিজস্ব হাওয়াই জাহাজ ব্যবহার করেন—এই ব্লিৎস্ প্রোপাগাণ্ডা যেন পরবর্তী যুগের ব্লিৎস্‌ক্রীগের পূর্বাভাস!); সেখানে বিরাট বিরাট জনসভা, শ্রোতাদের চিৎকার করতালি, মিটিঙশেষে উন্মত্ত জনতার প্ল্যাটফর্ম আক্রমণ—ফ্যুরারকে কাছের থেকে দেখবার জন্য—এসব হট্টগোল ধুন্ধুমারের ভেতর হিটলার যেন গেলীর শোক নিমজ্জিত করে দিতে চাইছিলেন।

এর তিন সপ্তাহ পরে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ আলাপ-আলোচনার জন্য হিটলারকে ডেকে পাঠান, সে কথা পূর্বেই বলেছি। যাঁরা বলেন, সে আলোচনা নিষ্ফল হওয়ার কারণ গেলীর শোকে হিটলার এমনই মোহাচ্ছন্ন ছিলেন তাঁর দাবী তিনি যথোপযুক্ত ভাষা ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করতে পারেননি, ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমি বরঞ্চ হফ্‌মান যা বলেছেন তার সঙ্গে একমত। আমার মনে হয়, তখনো হিণ্ডেনবুর্গ তাঁর চিরপরিচিত প্রাচীনপন্থী আপন চক্রের ভিতরকার নেতাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হননি। তখনো হিটলারের 'সময় হয়নি'।'

* * *

গেলীর জীবন, তার মৃত্যু, তার স্মৃতি সব কিছু ধর্মে উদাসীন হিটলারকে যেন এক নূতন অনুষ্ঠানবেষ্টিত সংস্কার-বিশ্বাসী করে তুললো। তিনি স্বহস্তে গেলীর কামরা চাবি দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে হুকুম দিলেন, একমাত্র গৃহরক্ষিণী ফ্রাউ ভিন্টারেরই সেখানে প্রবেশাধিকার। বহু বৎসর ধরে তিনি প্রতিদিন গেলীর প্রিয় ফুল তাজা ক্রিসেনথিমাম সে ঘরে রাখতেন। বের্ষটেশ-গাডেনের বাড়িতে এবং পরবর্তী যুগে ফ্যুরার যখন দেশের সর্বাধিকারী (তিনি

প্রথমে চ্যানসেলর বা প্রাইম মিনিস্টার রূপে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, এবং বছর দেড়েক পর প্রেসিডেন্ট গত হলে তিনি সে পদ পূর্ণ না করে নিজেই গ্রহণ করে পরিপূর্ণ ডিকটেটর—নিরঙ্কুশ নেতা—ফ্যুরার হন) তখন রাজভবনে গেলীর ছবি বিরাজ করতো সর্বত্র। বৎসরে দুই দিন—তার জন্মদিন আর মৃত্যুদিন রুচিসম্মত আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হত। সর্বোৎকৃষ্ট চিত্রকর ও ভাস্করদের দেওয়া হল গেলীর নানা অবস্থায় তোলা নানাবিধ ফোটোগ্রাফ। সেগুলোর উপর নির্ভর করে উত্তম উত্তম ওয়েলপেন্টিং ও মূর্তি নির্মিত হল। জর্মনির অন্যতম উৎকৃষ্ট শিল্পী তখনকার দিনের সর্বোৎকৃষ্টদের একজন—গেলীর একটি অনবদ্য ব্রোন্‌জ্‌ মূর্তি নির্মাণ করেন। এদের একটা না একটা হিটলারের প্রতি বাসভবনে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থানে রাখা হত।

এর প্রায় তেরো বৎসর পর এই আর্টিস্টদের অন্যতম, ৎসিক্‌লার যখন যুদ্ধে পরাজয় মনোবৃত্তি প্রকাশের ফলে নাৎসি গেস্তাপো পুলিসের হাতে ধরা পড়ে দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তির আশা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে গিয়েছেন তখন তিনি যে একদা গেলীর ছবি এঁকেছিলেন (যদিও কারো কারো মতে তিনি আর্টিস্ট হিসাবে ছিলেন অতিশয় মামুলী) সে কথা হিটলারকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি তাঁকে তদ্দণ্ডেই মুক্তি দেন।

হফ্‌মানের বিশ্বাস, গেলীর সঙ্গে হিটলারের যদি পরিণয় হত তবে হিটলারের জীবন এরূপ শোচনীয় পরিসমাপ্তি পেত না। তাঁর মতে শতধাবিভক্ত জর্মনিকে একাঙ্গ করে তাকে নবজীবনরস দিয়ে তিনি পুনরুজ্জীবিত করতেন নিশ্চয়ই, কিন্তু জর্মনির বাইরে যে সব বিবেচনাহীন অভিযানে বেরুলেন সেখানে পারিবারিক শান্তি এবং তৃপ্তি—হিটলার যেটাকে অসীম মূল্য দিতেন—তথা গেলীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, হিটলারের উপর তার অসীম প্রভাব তাঁকে সংযত করে নিরস্ত করতো—তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস বীভৎসতাময় পরিবেশে ত্যাগ না করে শান্তিতেই ফেলতে পারতেন।

হফ্‌মান বলেন, তারপর যখনই গেলীর কথা উঠেছে, হিটলারের চোখ জলে ভরে যেত। এবং একাধিক পরিচিতজনকে হিটলার স্বয়ং বলেছেন, জীবনে ঐ মাত্র একবারই তিনি ভালোবেসেছিলেন।

* * *

গেলীর মৃত্যুর চৌদ্দ বৎসর পর, হিটলার, আত্মহত্যা করার প্রায় দেড়দিন পূর্বে, এফা ব্রাউনকে বিয়ে করেন এবং তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল পৃথিবীবাসীর এখনো যায়নি। কিন্তু তার বর্ণনা এর সঙ্গে যায় না।

আমি হিসেব করে দেখেছি, হিটলারের জীবনে তিনটি দুর্দৈব দেখা দেয়। প্রথম দুটিতে তিনি প্রায় ভেঙে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতেন—পাঠক আদৌ ভাববেন না, গ্যাস-চেম্বার নির্মাতার অন্য কোনো দিকে কোনো প্রকারের স্পর্শকাতরতা থাকে না, (তাহলে কসাইয়ের ছেলে মরলে সে কাঁদতো না) এবং এঁরা অসাধারণ জীব বলে যে সব স্থলে তাঁদের স্পর্শকাতরতা হয় অসাধারণ সূক্ষ্ম, তাঁদের বেদনানুভূতি প্রায় অনৈসর্গিক তীব্র—তৃতীয়বারের ঘটনা সকলেই জানেন।

সেবারে তিনি নিষ্কৃতি পাননি। আত্মহত্যা ছাড়া তখন তাঁর আর অন্য কোনো গতি ছিল না। প্রথম দুর্দৈব তাঁর মাতার মৃত্যু। হিটলার তখন বালক, কিন্তু সেই বালকই তার মাকে যা সেবা করেছে সেটা অবর্ণনীয়, অবিশ্বাস্য—শুধু বলা যেতে পারে, স্বর্গজাত ভক্তি-প্রেমরস যেন ঐ মাত্র একবার পৃথিবীতে হিটলার-জননীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাঁর বাল্যবন্ধু তখনকার দিনের হিটলার ও মাতার মৃত্যুর পর তাঁর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। এরকম বর্ণনা আমি আর কোথাও পড়িনি। সেবারে তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাতার শয্যাপার্শ্বে টুলের উপর বসে বসে কাটিয়েছিলেন দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, সেবা করেছেন সমস্ত হৃদয় ঢেলে দিয়ে।

দ্বিতীয় দুর্দৈব—গেলীর আত্মহত্যা।

তৃতীয়বারে—এবং শেষবারের মত—তিনি সুযোগ পেলেন সেই পাইচারি করার।

তাঁর খাস চাকর লিঙে তার বর্ণনা দিয়েছেন। শুধু লিঙে দেখেছিলেন কাছের থেকে বলে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা দিতে পেরেছেন, আর হফ্‌মান নিচের তলা থেকে শুনতে পেয়েছিলেন শুধু।

কিন্তু হায়, তাঁর শেষ পদচারণার পূর্বেই তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। তাঁর শরীরের সম্পূর্ণ বাঁ দিকটা সমস্তক্ষণ কাঁপে (পার্কিনসন ব্যাধি কিংবা সেণ্ট ভাইরাসের নৃত্য রোগ), বাঁ হাতটা এত বেশী স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে ঘন ঘন ওঠে নামে যে পাইচারি না করার সময়ও সেটাকে প্রায়ই তিনি ডান হাত দিয়ে চেপে ধরে শান্ত করার চেষ্টা দিতেন। বাঁ পা-টাকে ঘষ্টে ঘষ্টে টেনে টেনে তাঁকে চলাফেরা করতে হয়, আর দুচোখের উপর কখনো বা ফিল্‌মের মত বাষ্পাভাস, আর কখনো বা অস্বাভাবিক তীব্র, উজ্জ্বল জ্যোতির মত।

এই বেদনাদায়ক অবস্থায় যখন সাধারণ জন শুয়ে বসেও শান্তি পায় না, তখন হিটলার দু হাত পিছনে নিয়ে সজোরে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত চেপে ধরে বাঁ পা টেনে টেনে—যেন কোনো জড়পদার্থ তিনি আপন দেহ দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন—আরম্ভ করলেন সেই প্রাচীন দিনের পাইচারি। মাঝে মাঝে দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে তার ওপর মুষ্ট্যাঘাত করেন—কারাবাসী-জন যে রকম করে থাকে ; তবে কি তিনি শহরের চতুর্দিকে শত্রুসৈন্য বেষ্টিত হয়ে কারাবন্দীর অনুভূতিই অনুভব করছিলেন ? – কিন্তু হায়, এখন তিনি শক্তিহীন জরাজীর্ণ। প্রহরের পর প্রহর, দিনের পর দিন পদচারণা করার দৈহিক শক্তি তাঁর আর নেই। তাই মাঝে মাঝে বসেন চেয়ারের উপর—আর শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন দেয়ালের দিকে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কিন্তু এখন আর কি প্রয়োজন পদচারণের ?

সেদিন গেলীর মৃত্যুর পর উত্তেজিত হয়ে তুমি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাইচারি করে সে উত্তেজনা বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলে। এবারে সে ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার ! শত্রুর হাতে অসীম যন্ত্রণা, অশেষ অপমানের পর হয়তো ফাঁসি। এবারে তোমার আত্মহত্যার পালা।

তবু পদচারণ করো, হিটলার !

একদা গেলী চলে যাওয়ার পর করেছিলে অস্থির পদক্ষেপ, এবার গেলীর সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রাক্কালে অবশ দেহ টেনে টেনে !

লক্ষ মার্কের বরমান

সম্প্রতি জর্মন সরকার ঘোষণা করেছেন যে কেউ যদি এমন খবর দিতে পারে যার সাহায্যে মার্টিন বরমান নামক লোকটাকে গ্রেপ্তার করা যায় তবে তাকে এক লক্ষ জর্মন মার্ক পুরস্কার দেওয়া হবে।

তাই নিয়ে একখানি মাসিক পত্রিকা ফলাও করে উক্ত হ্যার বরমান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। পত্রিকাখানি চোদ্দটি ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং শতাধিক দেশে পড়া হয় বলে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দম্ভ করে থাকেন। প্রবন্ধ-লেখক তাই বলেছেন, হয়তো বা আপনিই বরমানকে ধরার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন, কারণ হিটলারের মৃত্যুর পর বরমান কোথায় যে উধাও হয়ে গিয়েছেন কেউ জানে না। সর্বশেষে প্রবন্ধ-লেখক বরমানের একটি বর্ণনা দিয়েছেন যাতে করে আপনি তাঁকে অল্পায়াসে বা অনায়াসে চিনে নিতে পারেন।

আমরা বরমান সম্বন্ধে যেটুকু জানি, তাতে মনে গভীর সন্দেহ হয়, লেখক বরমানের যে বর্ণনা দিয়েছেন সে অনুযায়ী চললে তাঁকে আদৌ চিনতে পারবেন কিনা,—বরঞ্চ হয়তো তাঁকে পালাবার সুযোগ দেওয়া হবে বেশী।

ইতিমধ্যে আরেকটি কথা বলে রাখি, উক্ত পত্রিকার ভারতীয় সংস্করণ বলেছেন, এক লক্ষ জর্মন মার্ক যে আপনি পাবেন তার ভারতীয় মূল্য এক লক্ষ টাকা। আমরা যতটুকু জানি, তার মূল্য অন্তত এক লক্ষ দশ হাজার টাকা—সাদা বাজারেই। এই হল প্রবন্ধটির বিসমিল্লাতে গলদ। এর পর অন্য সব গলদে আসছি। তার পূর্বে বরমানটির পরিচয় কিঞ্চিৎ দি।

হিটলারের জীবনের শেষের দু বৎসর বরমান ছিলেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। তার পূর্বেই তিনি নাৎসি পার্টির সেক্রেটারি হয়ে গিয়েছিলেন। নাৎসি পার্টিই যে জর্মনি চালাতো সে-কথা সবাই জানেন—অন্য কোনো পার্টির অস্তিত্ব পর্যন্ত বেআইনী বলে গণ্য হত—এবং হিটলার ছিলেন তার সর্বময় কর্তা। এবং তার পরেই বরমান।

আইনত হিটলার হঠাৎ মারা গেলে কিংবা কোনো কারণে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেললে তাঁর জায়গায় বসার কথা ছিল গ্যোরিঙের। ওদিকে নাৎসি পার্টির সশস্ত্র বাহিনীর (এস্ এস্) বড়কর্তা ছিলেন হিমলার। তিনি আবার ছিলেন দেশের সামরিক বেসামরিক সর্ব রিজার্ভ ফোর্সের অধিপতি এবং সর্ব কনসানট্রেশন ক্যাম্প ছিল সম্পূর্ণ তাঁরই জিম্মায়। শেষের দিকে গ্যোরিঙ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং দেশের আপামর জনসাধারণ জানতো, হিটলারের

হঠাৎ কিছু একটা হয়ে গেলে হিমলারই দেশের ফ্যুরার—লীডার—বা নেতা হবেন। আইখমান যা কিছু করেছেন সেসব হিমলারের হুকুমেই।

তা ছাড়া ছিলেন গ্যোবেলস। যদিও তিনি প্রোপাগাণ্ডা মিনিস্টার কিন্তু তিনি হিটলারের বিশেষ প্রিয় আমীর ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ও হিমলার যদি হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন তবে বরমনও সেটা ঠেকাতে পারতেন না। বিশেষ করে গ্যোবেলসকে। বরমান সেটি জানতেন, এবং হিমলারকে যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত কোণ-ঠাসা করে এনেছিলেন তবু গ্যোবেলসকে ঠেকাতে পারবেন না জেনে তাঁর সঙ্গে একটা চুক্তি (ওয়ার্কিং এরেঞ্জমেন্ট—মডুস ভিভেণ্ডি) করে নিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, হিটলারের জীবনের শেষের বছরখানেক বরমান ছিলেন সর্বেসর্বা। হিটলারের তাবৎ হুকুম তাঁরই মারফতে বেরুতো। তাঁর ইচ্ছেমত তিনিও হিটলারকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিতেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী খৃষ্টধর্মের এমনই কট্টর শত্রু ছিলেন যে তাঁরা খৃষ্টানদের দমাবার জন্যে যে-সব ব্যবস্থা করতে চাইতেন তার দু-একটা হিটলারের মত ধর্মদ্রোহীর মনেও বিরক্তির সঞ্চার করেছিল।[১]

এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই, গ্যোরিঙের পতনের জন্য বরমানই দায়ী। এমন কি হিটলারের বিনানুমতিতে তিনি হুকুম পাঠান যেন গ্যোরিঙকে গুলি করে মারা হয়। কিন্তু নাৎসি রাজ্য পতনের দিন আসন্ন দেখে যে-কাপ্তানের উপর সে আদেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি সেটা অমান্য করেন।

হিটলারের মাত্র একটি খাস দোস্ত ছিলেন। চক্রান্ত করে বরমান তাঁকেও প্রায় ছ'মাস ধরে হিটলারের কাছ থেকে দূরে রাখেন। হিটলারকে বলেন, তিনি সংক্রামক টাইফুসে ভুগছেন। হিটলারের মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি কোনো গতিকে হিটলারের সাক্ষাৎ পান—শেষ বারের মত। চক্রান্ত ধরা পড়ে। হিটলার কিন্তু বরমানকে কিছুই বললেন না। বরঞ্চ দোস্ত হফ্‌মানকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন দয়া করে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেন।[২]

---

১ "অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস" বলতে হবে, নাৎসি সাম্রাজ্য পতনের প্রায় এক বৎসর লুকিয়ে থাকার পর বরমানের স্ত্রী এক ক্যাথলিক পাদ্রির সাহায্য নেন, এবং মৃত্যুর পূর্বে আপন ডজনখানেক ছেলেমেয়েকে তাঁরই হাতে সঁপে দেন। এবং "নির্মমতম পরিহাস"—তাঁর বড় ছেলে ক্যাথলিক পাদ্রী হয়েছে!

২ এই দোস্ত হফ্‌মানকেই হিটলার পাঠিয়েছিলেন মস্কোতে, রিবেনট্রপের সঙ্গে, নাৎসি-কম্যুনিস্ট চুক্তি সই করার সময়—স্তালিন কি রকম লোক সে তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করার জন্য। হিটলারের মৃত্যুর পর ইনি 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেণ্ড' নামক একটি পুস্তক লেখেন। ইনিই হিটলারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন তাঁর ফোটোগ্রাফ ল্যাবরেটরির এ্যাসিসটেণ্ট শ্রীমতী এফা ব্রাউনের সঙ্গে। আত্মহত্যা করার চল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে হিটলার এফাকে বিয়ে করেন—পনেরো

এই যে এত শক্তিশালী বরমানকে লোকে খুঁজে পাচ্ছে না কেন? আইবমান তাঁর অনেক নিচের নিচে কর্মচারী ছিলেন। তাঁকেও ইহুদীরা ধরতে পেরেছে। এঁকে পারছে না কেন?

যে বিখ্যাত মাসিকপত্রের উল্লেখ করে এ প্রবন্ধ আরম্ভ করেছি সেখানে এ প্রশ্নটির উল্লেখ নেই। যদিও হিটলার-বরমান নিয়ে যাঁরাই আলোচনা করেন তাঁদের সবাই এর উত্তর জানেন।

তার একমাত্র কারণ বরমান পাবলিসিটি বা খ্যাতি চাইতেন না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শক্তি, ক্ষমতা—মানুষের জীবনমরণের উপর অধিকার আয়ত্ত করা।

হেস্, গ্যোরিঙ, গ্যোবেলস, হিমলার, রিবেনট্রপ এমন কি হিটলারের আমীর-ওমরাহ চুনোপুঁটিরাও কাগজে-কাগজে যখন আপন আপন ফোটোগ্রাফ ছাপাচ্ছেন, যত্রতত্র ভাষণ দিচ্ছেন, বেতারে তরো-বেতরো বক্তৃতা ঝাড়ছেন, মোকা-বেমোকায় কেতাব ছাপাচ্ছেন, পরট্-পার্টি ডে-তে চোখ-ঝলসানো য়ুনিফর্ম পরছেন, তখন বরমান হিটলারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে—তাও বাড়ির বাইরে জন-সমাজে না—কলকাঠি নাড়ছেন, দিনের পর দিন আপন শক্তি বাড়িয়ে যাচ্ছেন। বড় বড় জেনরেল সিভিলিয়ানরা যখন ডাঙর ডাঙর মেডেলের জন্য হিটলারের সামনে হুটোপুটি করছেন তখন বরমান তাঁর স্ত্রীকে লিখেছেন—'এ কী পাগলামি!'[৩]

তাই জর্মন-অজর্মন সাধারণজন তাঁকে চিনতো না। তখনকার দিনে এবং আজও তাঁর ফোটোগ্রাফ দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং আছে।

হিটলার যখন তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে অর্থাৎ স্তালিনগ্রাদের পরাজয় তখনো তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়নি সে সময় খানাপিনার পর হিটলার ইয়ারবক্সীদের সঙ্গে গালগল্প করতেন। অবশ্য হিটলারই কথা বলতেন বেশী। বরমান তখন ব্যবস্থা করেন যে দুজন শর্টহ্যাণ্ড এককোণে বসে সেগুলো

বছরের 'বন্ধুত্বে'র পর। এফাও একই সঙ্গে আত্মহত্যা করেন। উভয়কে একই চিতায় পোড়ানের পর একই কবরে গোর দেওয়া হয়। রাশানরা স্কেলিটেনগুলো খুঁড়ে বের করে।

৩ বরমান এতই গোপনে থাকতেন যে তাঁর সম্বন্ধে কেউই সবিস্তার কিছু লিখতে পারেননি। ন্যুরনবের্গ মকদ্দমায় সবাই তাঁর বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন বটে কিন্তু তথ্য বিশেষ কিছু দিতে পারেননি। এ ছাড়া আছে: ১) 'বরমান লেটার্স'—স্ত্রীকে লেখা বরমানের পত্রগুচ্ছ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। ২) ট্রেভার-রোপার লিখিত 'লাস্ট ডেজ্ অব্ হিটলার'। ৩) প্রাগুক্ত হফ্মান লিখিত, 'হিটলার উয়োজ মাই ফ্রেণ্ড'। ৪) গেরহার্ট বল্ট্ কৃত 'ডি লেৎসতেন টাগে ড্যার রাইষ্স্কান্ৎস্লাই' (অর্থাৎ 'জর্মন প্রধানাবাসের শেষ কটি দিন')। এই বল্ট্ হিটলার ভবন (মাটির গভীরের এ্যার রেড শেলটার বা 'বুঙ্কার') ত্যাগ করেন হিটলারের মৃত্যুর মাত্র ছাব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে।

যেন লিখে নেন। পরে বরমান সেগুলো কেটেছেঁটে ধোপ-দুরস্ত করে দিতেন। এগুলো হিটলারের মৃত্যুর পর তাঁর 'টেব্‌ল্‌-টক্‌' (table talk) রূপে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাগুক্ত বিশ্ববিখ্যাত মাসিকের প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, বরমান যে এ ব্যবস্থা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল so that he could know and fulfil Hitler's every whim. এ উদ্দেশ্যও হয়তো তাঁর ছিল কিন্তু এই টেব্‌ল্‌-টক পড়লেই বোঝা যায় সেটা অত্যন্ত গৌণ। আসলে বরমান মনে করতেন হিটলার যা করেন যা বলেন তার চিরন্তন ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং পরবর্তী যুগের নাৎসি তথা বিশ্ববাসীর জন্য অমূল্য নিধি। নিধি হোক আর না-ই হোক—এ-কথা সত্য, যারা হিটলারকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে চিনতে চান তাঁদের পক্ষে হিটলারের স্বরচিত 'মাইন কাম্‌প্‌ফ্‌' পুস্তকের পরেই এর স্থান। এসব ১৯৪১-৪২-এর কথা।

১৯৪৫ সালে হিটলার যখন আসন্ন পরাজয়ের সম্মুখীন তখন বরমান হিটলারকে দিয়ে আবার কথা বলিয়ে নেন। এ-কথা সত্য, আত্মহত্যার কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত হিটলার জয়াশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেননি। তবু এই শেষ talk-গুলোতে হিটলার যেন আপন মনে চিন্তা করছেন, কেন তাঁর পরাজয় হল? এবং শুধু তাই নয়, পরাজয় যদি নিতান্তই হয়ে যায় তবে ভবিষ্যতে ইয়োরোপ-আমেরিকার কি অবস্থা হবে, তখন জর্মন রাজনীতি কোন্‌ পন্থা অনুসরণ করবে সে সম্বন্ধেও হিটলার ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন। আশ্চর্য, তার অনেকগুলোর আজ ফলে যাচ্ছে। চীন যে চিরকাল জড় হয়ে পড়ে থাকবে এটা তিনি স্বীকার করেননি। বরঞ্চ বলেছেন, চীনের কোটি কোটি লোক ঐ দেশে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল, চীন আমেরিকা-পানে ধাওয়া করবে (তার পূর্বে রুশ-মার্কিনে যুদ্ধ হয়ে আমেরিকা ছারখার হয়ে যাবে); চীন যে ভারতপানে ধাওয়া করবে সে ভবিষ্যৎবাণী তিনি করেননি।

বলতে গেলে এই টেব্‌ল-টক্‌ও বরমানেরই 'অবদান'।

কিন্তু এহ বাহ্য।

প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, 'বরমান মদ এবং কফি খেতেন না, পাতলা চা খেতেন এবং ক্বচিৎ কখনো মাংস খেতেন (drinking neither alcohol nor coffee, just weak tea, and eating sparingly of meat)'।

অর্থাৎ কাল যদি আপনি কলকাতায় (প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন he could be in Canada or Mexico—even in India), কিংবা কেউ যদি আর্জেন্টাইনে দেখে একটা লোক ঢাউস গেলাস-ভর্তি বিয়ারের সঙ্গে বিরাট একটা কট্‌লেট্‌ খাচ্ছে তবে তার বরমান হবার সম্ভাবনা নেই।

বস্তুত বরমান মাংস খেতেন প্রচুর। মদের তো কথাই নেই।

তবে প্রবন্ধ-লেখকের এ ভুল ধারণা এল কোথা থেকে?

সকলেই জানেন হিটলার মাছ মাংস মদ খেতেন না। তিনি যখন সাঙ্গোপাঙ্গ

নিয়ে খেতে বসতেন তখন তাঁর সামনে থাকতো নিরামিষ, এবং অন্যদের জন্য মাছ মাংস মদ। অবশ্য কেউ যদি হিটলারের মত নিরামিষ খেতে চাইত তবে তাকে সানন্দে তাই দেওয়া হত।

হিটলার-সখা হফ্‌মান—যাঁর পুস্তকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি—বলছেন, 'গ্যোরিঙও এসব খানাতে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন না। তিনি বলতেন, "আহারাদির ব্যাপারে প্রভুর সঙ্গে আমার রুচির অমিল।" এবং এসব নিরামিষ অন্য কেউই কখখনো খেতে চায়নি। এক বরমান ছাড়া। প্রভুকে খুশী করার জন্য সেই কর্তাভজাটা তার সঙ্গে ঐ 'কচুঘেঁচু' খেত। এবং তারপর আপন কামরায় গিয়ে—সেটা কাছেই ছিল—পরমানন্দে শুয়োরের চপ্‌ (বিরাট মাংসের টুকরো—এর সঙ্গে আমাদের আলুর চপের কোনো মিল নেই) বা বাছুর মাংসের কট্‌লেট্‌ গবগব করে গিলতো।'[৪]

প্রাগুপ্ত প্রবন্ধ-লেখক তাঁদেরই উপর নির্ভর করেছেন যাঁরা বরমানকে শুধু বাইরের থেকে দেখেছেন। তাই কবি বলেছেন, বাহ্যদৃশ্যে 'ভোলো না রে মন।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, হফ্‌মান আর বরমানে ছিল আদায় কাঁচকলায়। তাই তিনি দুশমনী করে এসব নিন্দে রটিয়েছেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, যখন হফ্‌মানের বইখানি প্রকাশিত হয় তখন বরমানের প্রাইভেট সেক্রেটারি, স্টেনো, চাকর, প্রাপ্তবয়স্ক একাধিক ছেলেমেয়ে স্বাধীন ভাবে জর্মনিতে চরে বেড়াচ্ছেন। তাঁদের কেউই কোনো আপত্তি জানাননি।

এবারে মদের ব্যাপার।

হিটলারের খাস চাকর (ভ্যালে) লিঙে দশ বৎসর রুশদেশে কারাবাস করে, ১৯৫৫ সালে খালাস পেয়ে দেশে ফিরে হিটলার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। হিটলার নাকি প্রায়ই তাঁকে বলতেন, 'দেখো লিঙে, রাত্রে আপন ঘরে তুমি যত খুশী মদ খেয়ে যেমন খুশী মাতলামো করো, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু সমাজে সাবধানে খেয়ো।' বরমানও তাই সাবধানে মদ খেতেন।

আমার এই প্রবন্ধের তিন নম্বর ফুটনোটে যে চার নম্বরের লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তিনি বল্‌ট্‌।

পূর্বেই বলেছি হিটলার আত্মহত্যা করার ছাব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে তিনি হিটলার আর সাঙ্গোপাঙ্গদের ভূগর্ভ-নিবাস (বুঙ্কার) ত্যাগ করে প্রাণ বাঁচান। এই ভূগর্ভ-নিবাস বহু কামরায় বিভক্ত ছিল। তারই একটাতে থাকতেন তিনি আর তাঁর

---

৪ "Goering too was a rare guest. Hitler's culinary confections he declared was not to his taste. But the lick-spittling Borman dutifuly consumed raw carrots and leaves in his master's company,—and then he would retire to the privacy of his own room and devour with relish his pork chop or a fine Wiener Schnitzel (calf cutlet). Hoffmann, p 202.

সহকর্মী লরিংহফেন্। হিটলারের আত্মহত্যার দু'তিন রাত্র পূর্বে ভোরের দিকে তাঁর সহকর্মী তাঁকে জাগিয়ে বলেন, 'কান পেতে শোন্, কি সব হচ্ছে।' পাশের কামরায় তিন ইয়ার—বরমান, জেনারেল বুর্গডর্ফ আর জেনারেল ক্রেব্স্[৫] মদ্যপানের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছেন। রাশানরা তখন বার্লিনে ঢুকে গিয়েছে এবং কয়েকদিনের ভিতর যে তাদের জীবনমরণ সমস্যা দেখা দেবে সেটা জানতে পেরে বিশেষ করে বুর্গডর্ফের আত্মগ্লানি দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য তিনি প্রধানত নাৎসি পার্টি ও তার কর্তা বরমানকে দায়ী করছিলেন। বরমান আত্ম-পক্ষ সমর্থন করতে করতে বলছেন, 'এস, দোস্ত, আরেক পাত্তর হয়ে যাক'—বুর্গডর্ফ অধিকাংশ সময়ই মত্তাবস্থায় থাকতেন।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বল্ট্ তার পর ঘুমিয়ে পড়েন।

দুপুরের দিকে বল্ট্ তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে গেলেন মিলিটারি কনফারেন্স্ রুমে—বুঙ্কারের ক্ষুদ্র-পরিসর কামরাগুলোর মধ্যে এইটেই ছিল সব চেয়ে প্রশস্ত। সেখানে গিয়ে দেখেন, হিটলার, এফা এবং গ্যোবেলস বসে আছেন, আর সামনের তিনখানা সোফাতে হিটলারের তিন ওমরাহ—বরমান, বুর্গডর্ফ, ক্রেব্স্—লম্বা হয়ে, পা ফাঁক করে সর্বাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে, সোফার ফাঁকা জায়গাগুলো কুশন (তাকিয়া-বালিশ) দিয়ে ভর্তি করে ঘড়ঘড় করে প্রচুর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

পূর্বরাত্রির এবং সেই সকালের অত্যধিক সুমিষ্ট দ্রাক্ষারস পানের ধকল কাটিয়ে তখনো তাঁরা জেগে উঠতে পারেননি। মদ্যপানশেষে তিন ইয়ার এক-সঙ্গে শোবার জন্য এই বড় ঘরটাই বেছে নিয়েছিলেন। বল্ট্ বলছেন, 'গ্যোবে-লস তাঁর দিকে এগুতে গিয়ে এঁদের নিদ্রাভঙ্গ না করার জন্যে প্রায় সার্কাস খেলোয়াড়ের মত তাঁদের পা বাঁচিয়ে এক রকম ডিঙিয়ে এলেন। তাই দেখে এফা একটু মৃদু হাস্য করলেন।' (পৃ ৮১, ৮২)

এর পরও যদি প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেন বরমান মদ খেতেন না তাহলে আমরা সত্যিই নিরুপায়।

অবশ্য একথা ঠিক যে বরমান যতক্ষণ না হিটলার ঘুমিয়ে পড়েন ততক্ষণ সচরাচর মদ খেতেন না। পাছে হিটলার ডেকে পাঠান। এমন কি স্বয়ং বরমানই তাঁর স্ত্রীকে লিখছেন (ফেব্রুয়ারি মাসে—হিটলার আত্মহত্যা করেন ৩০

---

৫ অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস, হিটলারের মৃত্যুর দু'দিন পরে যখন বুঙ্কার রাশান সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হয় তখন বুর্গডর্ফ এবং ক্রেব্স্ আত্মহত্যা করেন। বরমান পালান। গোড়ায় তাঁর সঙ্গে পলায়মান যাঁরা পরে বন্দী হন তাঁরা বলেন, বরমান রাশান দ্বারা নিহত হন। পরে নানা সন্দেহের অবকাশ দেখা দিল। তাই আজ জর্মন সরকার এক লক্ষ মার্ক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তাঁর পলায়ন সম্বন্ধে সবিস্তর বর্ণনা, তিনি বেঁচে আছেন কিনা সে সম্বন্ধে সব চেয়ে ভালো আলোচনা পাঠক পাবেন, ট্রেভার-রোপার লিখিত পুস্তকে, পৃ ২২১।

এপ্রিল ১৯৪৫, অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটেয়; হিটলারের ভ্যালে—খাস চাকর—লিঙের মতে ৩'৫০), 'ভাগ্যিস কাল রাত্রে এফার জন্মদিন পরবে আমি মদ্যপান করিনি, কারণ রাত সাড়ে তিনটেয় হিটলার আমাকে ডেকে পাঠালেন ; আমি তাই সাদা চোখেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কইতে পারলুম।'

প্রাগুক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেছেন, 'বরমান হাল্কা চা খেতেন।'

সেও সর্বজন সমক্ষে, হিটলারকে খুশী করার জন্য যেমন তিনি 'কচুঘেঁচু' খেতেন তেম্নি। কারণ, আর-সবাই যখন মদ্যপান করতেন তখন হিটলার ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাল্কা চা খেতেন,—চীনারা, রুশোরা, কাবুলীরা যে রকম করে থাকে।

বরমান যে মদ্যপান করেন সে-কথা হিটলারের অজানা ছিল না। বস্তুত বুঙ্কারের অনেকেই শেষের দিকে পরাজয় আসন্ন জেনে সুরাতে দুশ্চিন্তা ভোলবার চেষ্টা করছিলেন। সখা হফ্‌মান যখন হিটলারকে এপ্রিলের মাঝামাঝি শেষবারের মত দেখতে আসেন তখন তাঁর জন্য স্যাম্পেন অর্ডার দিয়ে হিটলার এই মন্তব্য করেন।

* * *

এ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য আমার এ নয় যে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করে বরমানকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করা। তদুপরি বরমানের এই বঙ্গদেশে আগমন অসম্ভব। ধরা পড়লে ভারত সরকার তাঁকে পয়লা প্লেনেই জর্মনি পাঠিয়ে দিতে কোনো আপত্তি করবেন না। তিনি থাকবেন ঐ সব দেশেই যে সব দেশ আসামী বদলের চুক্তি জর্মনির সঙ্গে করেনি—অর্থাৎ নাৎসিদের প্রতি এখনো যাদের কিছুটা দরদ আছে। অবশ্য বরমান তাঁর প্রাপ্য শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পান সেটাও আমার উদ্দেশ্য নয়।

আমার উদ্দেশ্য, এই সব চোদ্দ আর বাইশ ভাষায় প্রকাশিত মার্কিন কাগজগুলোকে যেন বঙ্গসন্তান চোখ-কান বন্ধ করে বিশ্বাস না করেন। বিশেষ করে যখন তারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা প্রকারের উপদেশ দেয়।

কন্‌রাট্‌ আডেনাওয়ার

চার্‌চিল নাকি একদা বলেছিলেন, বিসমার্‌কের পরবর্তী যুগে জর্মনিতে মাত্র একটি রাষ্ট্রবিদ (স্টেট্‌সম্যান, রাষ্ট্রনির্মাতা) জন্মেছেন—তিনি কন্‌রাট্‌ আডেনাওয়ার।

এ প্রশস্তি আডেনাওয়ারের পক্ষে অবশ্যই আনন্দদায়িনী (এবং আমরাও চার্‌চিলের সঙ্গে একমত), যদ্যপি এ তথ্যটি সর্বজনবিদিত যে স্বয়ং আডেনাওয়ার ইংরেজ জাতটাকে আদৌ নেকনজরে দেখতেন না।

চার্‌চিলের মন্তব্যে কিন্তু একটা স্থূলাঙ্গুলির রূঢ় ইঙ্গিত রয়ে গিয়েছে।

তিনি বলতে চান, বিসমার্‌ক এবং আডেনাওয়ারের মাঝখানে রাজনীতির (স্টেট্‌সম্যানশিপের) শস্যশ্যামল ভূখণ্ড নেই, আছে সাহারার মরুভূমি।

অর্থাৎ বহু বহু বৎসর ধরে জর্মন দেশে রাষ্ট্রনির্মাতার বড়ই অভাব। বিসমার্কের জন্ম ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে, রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ও মৃত্যু ১৮৯৮। যদি ধরা হয়, তিনি রাজনীতি সংগ্রামে নামেন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তা হলে বলতে হয় প্রায় একশ' বছর ধরে জর্মনিতে একমাত্র রাষ্ট্রপিতা ছিলেন বিসমার্কই। জর্মনির মত চিন্তাশীল তথা শক্তিশালী দেশের পক্ষে এক শতাব্দীতে মাত্র একজন রাষ্ট্রস্রষ্টা—এ যেন অবিশ্বাস্য। জর্মনি না কান্ট্, হেগেল, কার্ল মার্কসের দেশ! তাঁদের পরিকল্পনা কেউই বাস্তবে পরিণত করতে পারলো না?

এবং হিটলার?

এর উত্তর সুদীর্ঘ, কিন্তু সংক্ষেপে সারি। যে-ডিক্টেটারের মৃত্যুকালে তাঁর দেশের অধিকাংশ ভস্মস্তূপে পরিণত, যাঁর সংগ্রামনীতির ফলে লক্ষ লক্ষ সৈন্য দেশেবিদেশে নিহত হয়েছে; যুদ্ধে বোমারু আক্রমণে আরো লক্ষ লক্ষ আহত রক্তাক্ত নরনারী চিৎকার করছে—তাঁকে নিশ্চয়ই অতিমানব, নরদানব সবই বলা যেতে পারে; শুধু বলা যায় না—রাষ্ট্রনির্মাতা, পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার যুগযুগ-ধাবিত যাত্রীর 'চিরসারথি' তাঁকে কিছুতেই বলা যায় না।

বিনষ্ট রাষ্ট্রের ভস্মস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে লোক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় তাকে রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রনির্মাতা বলা চলে না।

এমন কি কোনো রাষ্ট্রাদর্শও তিনি রেখে যেতে পারেননি যেটা ভবিষ্যদ্বংশীয়রা মৃন্ময় করে তুলতে পারে। তাঁর রাষ্ট্রাদর্শ ঃ—পররাজ্য জয় করে সে দেশের 'বর্বর' (উন্টর্মেন্ষ্) জনসাধারণকে দাসস্য দাস রূপে পরিণত করে —যে সুপরিকল্পিত পৈশাচিক শোষণ-সংহার পদ্ধতি দর্শনে আন্কল্ টম পর্যন্ত গোরশয্যায় চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান হবেন—আপন দেশের বিলাসব্যসনের জন্য অধিকতর শূকরমাংস, সূক্ষ্মতর চীনাংশুক, অগণিত স্বতশ্চলশকট সংগ্রহ —সাতিশয় বস্তুতান্ত্রিক জড়ত্বের চরম আরাধনা।

এ-প্রসঙ্গে তাই বলে নিতে পারি যদিও এটা সর্বশেষের কথা, হিটলার বারো বৎসরে যে জর্মনিকে বিনাশ করেন, আডেনাওয়ার তাঁর ১৯৪৯ ব্যাপী 'রাজত্ব'কালে সেটি পুনর্নির্মাণ করেন। শুধু পুনর্নির্মাণ নয় এবং চৌদ্দ বৎসরও নয়, আডেনাওয়ার দশ বৎসরেই জর্মনিতে যে সুখসমৃদ্ধি গড়ে তুললেন সেটা হিটলারের ভস্মস্তূপে দাঁড়িয়ে ১৯৪৫ সালে বাতুলতম আশাবাদীও কল্পনা করতে পারেনি। এবং বলতে কি, এহ বাহ্য, তিনি দিলেন এমন ধন যার উল্লেখ করে খৃষ্ট একদা বলেছিলেন—শুধু রুটি খেয়েই মানুষ জীবনধারণ করে না। সে-কথা পরে হবে, আগেই বলেছি।

* * *

কলন[১] শহরের নাম বিশ্ববিখ্যাত। আর কিছু না হোক পৃথিবীর সর্বত্রই

---

১ এখানে রোমান জাত একটা কলনি স্থাপন করে ও নেরোর (যিনি রোম পুড়িয়েছিলেন) মা, মহারানী (Colonia) Claudia Ara Agrippinensis-

Eau de Cologne জিনিসটি পাওয়া যায়, এবং আজকের দিনে ও দ্য কলন্ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই নির্মিত হয়। কলন শহর যে 'কলন-জলে'র (Eau = Water, de = of, Colojne = Coloyne = Koeln) আবিষ্কারক তাও নয়, কিন্তু কলনের ও দ্য কলন্ই এখন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কলন-জল।

কলন জর্মানির অন্যতম বৃহৎ নগর। এর গির্জাটি স্থাপত্যশিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। গম্ভীর এবং মধুর উভয় রস এই বিরাট গির্জাতে সম্মিলিত হয়েছে। দূর-দূরান্ত হতে গির্জার শিখরদ্বয় পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ নগরের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি তার ওবার্বুরগার্মাইস্টার বা প্রধান লর্ড মেয়ার। কলন শহরের উপর তাঁর প্রভাব অসীম। বস্তুত তাঁকে কলনের 'রাজা' বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না। ভাইমারের পূর্ববর্তী যুগে কলনের লর্ড মেয়ার প্রতি পরবে কাইজার কর্তৃক নিমন্ত্রিত হতেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আডেনাওয়ারের জন্ম এই কলন শহরে। আইন অধ্যয়ন করার পর তিনি এ শহরের লর্ড মেয়ারের দফতরে ঢোকেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং ওবার্বুগার্মাইস্টার নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে থেকে তাঁর আপন শহরের সেবা করেন। এ-রকম একাগ্র সেবা তাঁর পূর্বে বা পরে কোনো মেয়ারই করেননি। ১৯৩৩-এ হিটলার জর্মানির প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েই তাঁকে সরাসরি ডিসমিস করে দেন।

আডেনাওয়ারের দীর্ঘ একানব্বুই বৎসরের জীবনকে যদি দুই পর্যায়ে ভাগ করা যায় তবে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তার প্রথম পর্যায় সমাপ্ত। দ্বিতীয় পর্যায়ের আরম্ভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এবং সমাপ্তি ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে।

জর্মানি, হিটলার তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে যাঁদেরই কৌতূহল আছে তাঁদের সকলের মনেই প্রশ্ন জাগবে, হিটলার এঁকে ডিসমিস করলেন কেন? নাৎসি আন্দোলন যখন ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তখন আডেনাওয়ার তার উপর কি কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি?

জীবনের প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯৩৩ অবধি আডেনাওয়ার প্রকৃত পলিটিশিয়ান বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। লর্ড মেয়ারের পদ ছাড়াও তিনি কাইজারের রাজত্বে ও পরবর্তী ভাইমার রিপাবলিকে একাধিক সর্বোচ্চ আসন গ্রহণ করেন বটে কিন্তু কখনো রাইষটাগ বা জর্মন পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য জনসমাজের সম্মুখে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াননি। তিনি ক্যাথলিক সেন্টার পারটির সদস্য ছিলেন এবং সে দলের উপর তাঁর প্রভাব ছিল প্রচুর কিন্তু সেটা প্রধানত তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলে ও প্রখ্যাত কলন শহরের লর্ড মেয়ারের পদমহিমায়। এবং ক্যাথলিক সেন্টার পারটির প্রতি হিটলারের ছিল ক্রোধ ও ঘৃণা।

এর Colony (Colonia) নাম দেয়। এই Colonia থেকে ফরাসী ইংরিজি Cologne, জর্মনে Koeln.

কিন্তু ১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৩৩ অবধি ক্ষমতালাভের জন্য যখন নাৎসি পারটি শহরে গ্রামে, রাস্তায় রাস্তায়, মদের দোকানে লড়াই চালাচ্ছে তখন যে-সব নাৎসিবিরোধী রাজনৈতিকদের নাম শোনা যায়, যেমন ফন পাপেন, হুগেনবুর্গ, শ্লাইষার, ব্রুনিঙ, ট্যালমান, টর্গলার, শ্রোডার—এদের ভিতর আডেনাওয়ারের নাম নেই। ১১৭৪ পৃষ্ঠা জুড়ে শ্রীযুক্ত শাইরার 'নাৎসি আন্দোলনের উদয়াস্ত' সম্বন্ধে যে বিরাট গ্রন্থ লিখেছেন তাতে আডেনাওয়ারের নাম নেই।

অথচ আডেনাওয়ার ছিলেন ধর্মভীরু লোক—হিটলার যে ধর্মমাত্রকেই এবং বিশেষ করে খৃষ্টধর্মকে, জর্মন টিউটন চরিত্রের সর্বনাশা শত্রুরূপে ঘৃণা করতেন সে তত্ত্ব তিনি কখনো গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি।[২] হিটলারের করাল ছায়া যে ক্যাথলিক গির্জা ক্রমেই ছেয়ে ফেলছে সেটা আডেনাওয়ারের দৃষ্টি এড়ায়নি।

কিন্তু আডেনাওয়ার ছিলেন ধর্মভীরু, শিক্ষিত, বিদগ্ধ নাগরিক।

একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। কলন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ; নেপোলিয়নের নেতৃত্বে যখন ফরাসী সেনা জর্মনিতে ঢুকলো তখন সারা জর্মনির শিক্ষাদীক্ষার উপর নামলো দুর্দিনের অন্ধকার। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলন বিশ্ববিদ্যালয়েরও দরজা বন্ধ হয়ে গেল ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে।

আপ্রাণ চেষ্টা করে, লর্ড মেয়ারের সর্ব প্রভাব সর্ব কর্তৃত্ব বিস্তার করে কন্‌-রাট্‌ আডেনাওয়ার ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলনে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২৩ বৎসর পরে।

বন্‌ শহর কলনের অতি কাছে। বন্‌-এর বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত। আডেনাওয়ার বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি বন্‌-কলনের পথে র‍্যোনডর্‌ফে তাঁর আবাস নির্মাণ করেন। এখান থেকেই তারো পরবর্তীকালে—হিটলারের পতনের পর—তিনি মোটরে করে রাজধানী বন্‌-এ রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য সমাধান করতে যেতেন।

সেই ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে, বস্তুত প্রায় ষাট বছর ধরে বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন সুপরিচিত।[৩] বন্‌-এর এত কাছে একটি

---

২ হিটলারের বিশ্বাস ছিল, ইহুদী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নির্বীর্য কাপুরুষের আশ্রয়স্থল খৃষ্টধর্ম ইয়োরোপের সর্বনাশ করেছে, এবং এ ধর্ম ইয়োরোপে ছড়ানোর পিছনে রয়েছে ইহুদীদেরই (!) এক অভিনব কৌশল। আবার হিটলার মনে করতেন খৃষ্টজন্মের পূর্বে যে সব রোমান সৈন্য প্যালেস্‌টাইনে মোতায়েন ছিল খৃষ্ট তাদেরই কোনো একজনের জারজ সন্তান!

৩ ঐ সময়ে আমি বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি ও আডেনাওয়ারের খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্বন্ধে সতীর্থদের কাছ থেকে বহু প্রশস্তি শুনতে পাই। তাঁর সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ খবরের কাগজে ও লোকমুখে এসে পৌঁছত সেগুলো ১৯৩৩ পর্যন্ত যাচাই করে নেওয়া যেত। ঐ বছরে হিটলার ক্ষমতা গ্রহণ করার ফলে

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় খোলাতে বন্-এর কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা হয়নি, কারণ বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আডেনাওয়ারের সখ্য ছিল অবিচল। বস্তুত উত্তর রাইন অঞ্চলের (বন-কলন-ড্যুসেল্ডর্ফ্) প্রায় সব রকমের কৃষ্টি আন্দোলন তথা ক্যাথলিক ধর্মজীবন এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আডেনাওয়ার তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

হিটলারের জন্মভূমি যদিও অস্ট্রিয়ায়, তবু তিনি বেভেরিয়ার ম্যুনিক্ শহর বেছে নিয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্ররূপে। সেখানে বিরাট বিরাট মিটিঙে হিটলার লম্বা লম্বা লেকচার ঝাড়তেন, রাস্তায় রাস্তায় কম্যুনিস্টদের ঠ্যাঙাবার ব্যবস্থা করাতেন, এমন কি গুম্ খুন করাতেও তাঁর বাধতো না এসব পাঠক মাত্রই জানেন।

বেভেরিয়া প্রদেশের পরেই হিটলারের জনপ্রিয়তা ছিল উত্তর রাইনের কয়লা ও লোহা ব্যবসার জায়গা রুর অঞ্চলে—এবং কলনের পাশে এই উত্তর রাইনের ড্যুসেল্ডর্ফ্ শহরে বিশ্বপ্রপাগান্ডা সরদার ডকটর গ্যোব্লসের জন্ম। রুরের গা ঘেঁষে কলন শহর এবং এই অঞ্চলের সব চেয়ে বড় নগর। গ্যোব্লস্ স্বভাবতই চাইতেন তাঁর বাড়ির পাশের কলন শহর যেন প্রভু হিটলারকে উৎকৃষ্ট আসন তৈরী করে দিতে পারেন—হিটলারের কাশী যদি হয় ম্যুনিক তবে কলন হবে বৃন্দাবন।

কিন্তু বাদ সাধতেন আডেনাওয়ার। পূর্বেই বলেছি, ওবার্বুল্গার্-মাইস্টারের ক্ষমতা অসীম। তাই নামমাত্র আইন বাঁচিয়ে তিনি কলন অঞ্চলে এমন সব কলাকৌশল করে রাখতেন যে হিটলার এমন কি রাইনের ছেলে স্বয়ং গ্যোব্লস্ও সেখানে সুবিধে করে উঠতে পারতেন না।

নাৎসি পার্টির ক্ষমতা সঞ্চয় করে উদ্দেশ্য সফল করাতে বাধা দিয়েছিল প্রধানত দুইটি সংঘ: ক্যাথলিক এবং দ্বিতীয়ত প্রটেস্টানট্ যাজক সম্প্রদায়। কিন্তু ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রটেস্টান্দের তুলনায় শতগুণে সংঘবদ্ধ এবং পোপকে কেন্দ্র করে তাদের বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠান। হিটলারও বার বার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গকে বলেছেন, 'ঐ ক্যাথলিকদের সমঝে চলো—প্রটেস্টান্ট্রা এমনিতেই টুকরো টুকরো হয়ে আছে, তাদের খানখান করা এমন কিছু কঠিন কর্ম নয়।'

প্রেসের স্বাধীনতা লোপ পায়। কাজেই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হিটলার-বৈরীদের সম্বন্ধে কোনো পাকা খবর পাওয়া যেত না। যুদ্ধের পর শ্রীযুত ভাইমার আডেনাওয়ার সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ লেখেন। সেখানা যোগাড় করতে পারিনি বলে আমার জানা তথ্য ও তত্ত্ব যাচাই করে নিতে পারছি নে। বিশেষ করে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত আডেনাওয়ার গোপনে নাৎসিদের বিরুদ্ধে কি কি করেছিলেন সে-সব খবর নিশ্চয়ই এই বইয়ে আছে। আডেনাওয়ারের মৃত্যুর পর থেকে কলন রেডিয়ো মাঝে মাঝে ঐ বই থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনায়। এ প্রবন্ধে আমি তার সাহায্য নিয়েছি।

কলন শহরে পোপের অন্যতম আর্চবিশপের বিরাট প্রতিষ্ঠান। আডেনাওয়ার সেখানে সুপ্রীম লর্ড মেয়ার। ক্যাথলিক রাজনৈতিক দলের উপর তাঁর প্রচুর প্রভাব—যদিও, পূর্বেই বলেছি, তিনি সে রাজনৈতিক দলের টিকিট নিয়ে ভোটমারে কখনো নামেননি। তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায় কেটেছে ম্যুনিসিপাল বা করপোরেশন পলিটিক্সে। ক্যাথলিক সংগঠনের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তিনি নাৎসিদের প্রচারকর্মে বাধা দিলেন কলন তথা উত্তর রাইনের সর্বত্র। অথচ হিটলার তাঁরে ধরা-ছোঁওয়াতে পান না, কারণ তিনি রাজনৈতিক কোনো দলের নেতা, এমন কি চারআনী সক্রিয় নিষ্ক্রিয় কোনো মেম্বারও নন। তিনি যদি ভোটমারে নামতেন তবে তাঁকে ভোটে হারিয়ে বিপর্যস্ত অপদস্থ করা যেত। নাৎসি ডন কুইক্সট্ তলওয়ার হানবার মত ড্র্যাগন খুঁজে পায় না—পায় উইন্ড্মিল্!

গ্যোব্ল্স্-এর প্রচারকর্মের একটা প্রধান উর্বরা জমি ছিল ইস্কুল-কলেজ-য়ুনিভারসিটি। কলনের অধিকাংশ স্কুল ক্যাথলিকদের তাঁবুতে—সেকুলার ভাইমার রিপাবলিক জর্মনির শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সেকুলার করে তুলতে পারেনি কিংবা হয়ত সত্য সত্য তা করতে চায়নি—সেখানে আডেনাওয়ারের ধর্মবল অর্থবল দুইই রয়েছে। আর য়ুনিভারসিটির তো কথাই নেই। সোয়াশ' বছরের হারানো মানিক তার বিশ্ববিদ্যালয় ফের ফিরে পেয়েছে—আডেনাওয়ারের তপস্যায়, তখনো পুরো দশ বছর হয়নি। এটাকে কলনবাসী বাঁচিয়ে রাখবে সর্বপ্রকার কট্টরপন্থীর র‍্যাডিকাল ছোঁয়াচ থেকে। গ্যোব্ল্স্ কলনের কলেজে কল্কে পেতেন না।

ওদিকে বেকার সমস্যা দিন দিন তার চরম সংকটের দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে চলেছে—এবং সব চেয়ে বেশী মার খাচ্ছেন রুর কয়লাখনির শ্রমিক দল। তাই দেখা যায়—হিটলারের খাস পাইলট তার পুস্তকে এর বর্ণনা দিয়েছেন—[৪] হিটলার প্রচারকর্মের জন্য প্লেনে উড়ে যাচ্ছেন রুরের এসেন্ শহরে। পাশেই বিরাট কলন। কিন্তু তিনি সেটি বাদ দিয়ে চলে যাচ্ছেন বন্-এর কাছে তাঁর প্রিয় গোডেসবের্গে নামক গণ্ডগ্রামে (এখন শহর এবং এখানেই পরবর্তী যুগে হিটলার প্রাথমিক কথাবার্তা বলেন চেম্বারলেনের সঙ্গে—চেকোস্লোভাকিয়ার সুডেটেন বাবদে)। নিশ্চয়ই হিটলারের এই কলন বর্জনে প্রতিবারই গ্যোব্লস লজ্জায় মাথা নিচু করেছেন। তাঁর সান্ত্বনা এইটুকু—এসেন্ তথা রুর তাঁর প্রতিবেশী, সেখানে তিনি প্রতিবারেই হিটলারকে রাজাসনে বসাতেন।

* * *

হিটলার চ্যান্সেলার হয়েই আডেনাওয়ারকে ডিসমিস করলেন। এটা হবে আমরা জানতুম। কারণ নাৎসিরা বহুদিন ধরে তাঁর নিন্দা-কুৎসা গেয়ে বেড়াচ্ছিল। তার একটা: 'আডেনাওয়ার তনখা টানেন বিরাট (রীজে)! তাঁর মাইনে ঢের ঢের কম হওয়া উচিত।' এবং সব চেয়ে মজার কথা, হিটলার

৪ বাওর, "হিটলার'জ্ পাইলট"।

যাঁকে লর্ড মেয়ার করলেন তিনি তাঁর মাইনে এক পাই তক না কমিয়ে টানতে লাগলেন আডেনাওয়ার যে তনখা নিতেন সেইটেই। এই মহাশয়ের নাম ছিল 'রীজে' (বাঙলায় আমরা বলব 'বিরাট' বাবু)। তখন কলন-বন্-এ একটা শিবরামীয় পান্ চালু হল—'আডেনাওয়ার নিতেন বিরাট তনখা; এখন (মিস্টার) বিরাট নিচ্ছেন আডেনাওয়ার-তনখা!'

* * *

হিটলার কি ভাবে জর্মনিকে বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তার অবশ্যম্ভাবী শেষ ফল যে দেশের সর্বনাশ, সে সত্য আডেনাওয়ার দিব্যদৃষ্টি দিয়েই দেখেছিলেন কিন্তু শান্ত-সমাহিত স্বভাব-ও আচরণ সম্পন্ন আডেনাওয়ার জানতেন, চীনা ঋষি লাওৎসের মতই জানতেন, জর্মন-নিয়তি রহস্যাবৃত তারই কোনো এক মানববুদ্ধির অগম্য 'কারণে'। জর্মনির উপর দিয়ে যে টর্নাডো বল্গামুক্ত করেছেন, সে যেন

"লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ বহির্গত বন্দীশালা হতে
মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে"

তার সামনে দাঁড়ালে সেটাকে বন্ধ করা তো দূরের কথা, তিনিও মহাশূন্যে বিলীন হবেন। এটা ফরাসী সম্রাটের 'আপ্রে মোয়া ল্য দেলুজ' ('আমি মরে যাওয়ার পর বন্যা') নয়, এটা 'দেলুজ পুর শাঁকা আ ল্যাসতাঁ ('বন্যা এখনই, এবং সবাইকে নিয়ে যাবে ভাসিয়ে, কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে'!)।

বরঞ্চ বন্যার পর ফের-ঘরবাড়ি তুলতে হবে, খেতখামার করতে হবে—শিবের তাণ্ডব শেষ হলে অন্নপূর্ণার আবাহন।

পরাজয় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় হিটলার ততই অবিচারে, নির্বিচারে—শত্রুজন, নিরপেক্ষজন, এমন কি মিত্রজনকেও 'মরণ-থানায়' (কন্সান্ট্রেশন ক্যাম্পে) পাঠাতে লাগলেন—হ্যাঁ, ইব্রাহিম তাঁর প্রিয় পুত্রকে, আগামেম্নন্ তাঁর প্রিয় কন্যা এফিগেনিয়েকে দেবতার তুষ্টির জন্য বলি দিয়েছিলেন—কিন্তু আডেনাওয়ারের অদৃষ্টে 'মরণ-থানার' দুর্দৈব লেখা ছিল না। যুদ্ধের শেষের দিকে তাঁকে কিছুদিন কারাগারে, পরে তাঁর আপন গৃহে নজরবন্দী করা হয়েছিল মাত্র। কিন্তু তিনি শত্রুমিত্রনির্বিশেষে এতই অসংখ্য জনের উপকার করেছিলেন যে তাঁরা কলাকৌশলে ছলে (হিটলারকে) বলে আডেনাওয়ারকে কারামুক্ত করেন।

"সাঙ্গ হয়েছে রণ,
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া শেষ হল আয়োজন"
"The fight is ended!
Cries of loss bewilder the sky"

১৯৪৫ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে জর্মনি 'বে-এক্তেয়ার' আত্মসমর্পণ করলো। ঐ বছরেই জুলাই মাসে প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক স্টিভন্ স্পেন্ডারকে ব্রিটিশ সরকার পাঠালে জর্মনিতে, সেখানকার ঝড়তিপড়তি ইনটেলেকচুয়েলদের চিন্তাধারার সম্বন্ধে খবর নিতে। সে-কর্ম সমাধান করে তারই বিবরণী তিনি

প্রকাশ করেন 'ইয়োরোপীয়ান উইটনিস' নামক পুস্তকে।[৫]

বীভৎস বই। কলনের রাস্তার পর রাস্তা, দুদিকে একটি মাত্র বাড়ি নেই—ধ্বংসস্তূপ, ভগ্নস্তূপ। তার তলায় এখনো হাজার হাজার মড়া পচছে গলছে। শহর-জোড়া দুর্গন্ধ থেকে নিষ্কৃতির উপায় নেই। একরকম ক্ষুদে সবুজ পোকা এই সব হাজা-পচা লাশ থেকে জন্ম নিয়েছে এবং শহরময় এমনই ঘন স্তরে ছেয়ে আছে যেন মনে হয় লন্ডনের ধুঁয়াশা। হাত দিয়ে মুখের সামনে থেকে তাড়াতে গেলে মুখে লেগে গিয়ে পিছলে আঠার মত চোখেমুখে সেঁটে যায়।

লড়াইয়ের শুরুতে কলনে বাস করতো প্রায় আট লক্ষ্য লোক। তারা ক' হাজার বাড়ি, ভিলা ফ্ল্যাটে বাস করতো তার হিসেব স্পেন্ডার দেননি। শুধু বলেছেন, মাত্র তিনশ খানা (!) তখনো বাসের উপযোগী। "Actually there are a few habitable buildings left in Cologne, theree hundred in all (!)"

এ শহর তথা গোটা দেশের আর আর শহর গড়ে তুলবে কে, কারা?

দুষ্ট হোক শিষ্ট হোক যে-সব নাৎসি একদা নরওয়ে থেকে ইটালি, আতলান্তিক থেকে ককেশাস পর্যন্ত অধিকার করেছিল তারা কৃতবিদ্য, করিৎকর্মা, অভিজ্ঞ—নির্মাণ-ধ্বংস উভয় কর্মেই সিদ্ধহস্ত। তাদের কিছু মারা গেছে, অধিকাংশ মিত্রশক্তির শিবিরে শিবিরে বন্দী, কিছু পলাতক, অনেক আন্ডার-গ্রাউন্ড।

হিটলারের বৈরীপক্ষের অধিকাংশ অন্যলোকে। হিটলার তার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। আডেনাওয়ার গোত্রের নির্মাণতৎপর নেতা অতিশয় বিরল,—মুষ্টিমেয়।

আডেনাওয়ার ভগ্নস্তূপের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। একদা চার্চিল যেরকম লন্ডনের ভাঙাচোরার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন—যদিও সে বিনাশ কলনের সহস্রাংশও ছিল না।

এখানে আমাকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে হবে। এটি পড়ে নিলে আডেনাওয়ারের চরিত্রগুণটি পাঠকের সামনে স্পষ্ট রেখায় ধরা দেবে। বিশেষত স্পেন্ডারের মত লোক যখন এ ছবিটি এঁকেছেন।

দু'দফে অনুবাদ করে লাভ নেই, এবং বিবেচনা করি এ প্রবন্ধের পাঠক অন্তত আমার চেয়ে ভালো ইংরিজি জানেন।

এটা যুদ্ধবিরতির দু'তিন মাস পরের কথা। স্পেন্ডার বলছেন :—

Adenauer is a prominent Catholic in the Rheinland, who was Mayor of Cologne before Hitler came to power. It is

৫ Stephen Spender, European Witness, 1946. মাসখানেক পূর্বে যখন কেলেঙ্কারি-কেচ্ছা বেরলো যে মারকিন গুপ্তচর বিভাগ "Encounter" কাগজকে গোপনে অর্থসাহায্য করে, তখন তিনি কাগজের সম্পাদকপদ ত্যাগ করেন।

now with a special personal emotion that he takes up the restoration of that Cologne which was a broken trayload of crokery when it was taken out of his hands. When he was last Lord Mayor he was in his fifties, he is now a man of seventy. He has an energetic, though some what insignificant appearance; a long lean oval face, almost no hair, small blue active eyes, little button-nose and a reddish complexion. He looks remarkably young and he has the quietly confident manner of a successful and attentive young man.

'There are two aspects of reconstruction which we consider of equal importance,' he said, 'one, the material rebuilding of the city. But just as important is the creation of a new spiritual life. You can't have failed to notice that the Nazis have laid German culture just as flat as the ruins of the Rheinland and the Ruhr. Fifteen years of Nazi rule have left Germany a spiritual desert, and perhaps it is more necessary to draw attention to this than to the physical ruins, for the spiritual devastation is not so apparent. There is hunger and thirst now for spiritual values in Germany. This is especially true of Cologne because here, in the past, we have had such a significant spiritual life and activity. Here it is possible to-day to do a great deal. Only the best should be our aim. We should have in Cologne the best education, the best books, the best newspapers, the best music.'

The point that Adenauer came back to again and again —his whole position rested on it—was that the Germans were really starving spiritually, and that it was therefore of the utmost importance to give their minds and souls some food.

এ বই যখন আমি পড়ি তখনো আমরা স্বাধীনতা পাইনি।

সে দুর্দিনে কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল, দশ-বারো বৎসর যেতে না যেতেই তিনি কলন তথা সারা জর্মনিতে এমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিল্পোন্নতি, আত্মচর্চা, ধর্মজীবনে নব জাগরণ এনে দেবেন, যে হিটলার তাঁর গৌরবের মধ্যগগনেও সুধমাত্র সাংসারিক দিক দিয়েও এতখানি উন্নতি করতে পারেননি ?

কেউ কল্পনা করতে পারবে না, এ তত্ত্বটা আডেনাওয়ার জানতেন বলেই স্পেনডারকে বিদায় দেবার বেলা তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, 'The imagination

has to be provided for.

কবিগুরুর কথা মনে পড়ে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় ও পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বার বার বলেছেন, 'আত্মার দিকটা অবহেলা করো না।' অধিকাংশ রাজনৈতিকরা তখন মুচকি হেসে বলতেন, 'আগে তো ইংরেজকে খেদাই।'

ইংরেজ তো বহুকাল হল গেছে। তবে ?

আসলে আমাদের 'imagination,' চরিত্র, আত্মা দেউলে।

এর পরের ঘটনাবলী হালে কাগজে কাগজে বেরিয়েছে। সেগুলো সংক্ষেপে সারি।

যুদ্ধশেষের পরই মার্কিন সেনাপতি আডেনাওয়ারকে কলনের লর্ড মেয়ার করে দিল। কিছুদিনের মধ্যেই পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী মার্কিনরা কলন ইংরেজের হাতে দিয়ে সরে পড়ল। যে-ইংরেজ সেনাপতির হাতে কলনের ভার পড়লো তিনি ছিলেন একটি আস্ত গণ্ডমূর্খ গাড়োল। আডেনাওয়ারকে নগর পুনর্নির্মাণ বাবদে এমন সব সর্বনেশে অবাস্তব জঙ্গীলাটী অর্ডার দিতে লাগলেন যে পরাজিত জর্মনির নগণ্য সরদার আডেনাওয়ার বিজয়মদে মত্ত 'প্রভুর' আদেশ পালন করতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। এই নয়া হিটলার তখন তাঁকে স্রেফ ডিসমিস করে দিলেন। বিবেচনা করি সিপাহী বিদ্রোহের আমল হলে তাঁকে বাহাদুর শা'র মত বাকী জীবন জেলে কাটাতে হত!

অনেকের বিশ্বাস, সেই যে আডেনাওয়ার ইংরেজের উপর চটে গেলেন, তার পর তিনি জর্মনির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়তে লাগলেন মারকিন ফরাসীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে—ইংরেজিতে যাকে বলে 'কাট্ হিম্ ডেড,'—ইংরেজকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেলেন।

জর্মনির নব সংবিধান নির্মাণের জন্য যে বৈঠক বসল বছর তিন পরে ১৯৪৮ সালে, তিনি হলেন প্রেসিডেন্ট। ১৯৪৯-এ যে নবীন রাষ্ট্র নির্মিত হল তার প্রথম প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হলেন আডেনাওয়ার। কিন্তু তখন বিশ্ববাসীর মনে প্রশ্ন, জর্মনির জন্মবৈরী ফ্রান্স কি এ রাষ্ট্রকে স্বাধীন সার্বভৌম রাজারূপে স্বীকার করবে ?

আডেনাওয়ার আজীবন ফ্রান্সের প্রতি ভ্রাতৃভাব পোষণ করতেন। তিনি হাত এগিয়ে দিলেন ফ্রান্সের দিকে। যে-ফ্রান্স চিরকাল জর্মনিকে অবিশ্বাস করেছে সে পর্যন্ত বুঝে গেল যুগের পরিবর্তন হয়েছে। দম্ভী দ্য গল আলিঙ্গন করলেন বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে। ইংরেজ মর্মাহত হল। জর্মন ফরাসীকে বিভক্ত রেখে, অর্থ-সংগ্রহার্থে দু'দলকে লড়িয়ে দিয়ে, সে দাবড়াতো ইয়োরোপময়।

জর্মনি ইয়োরোপ আমেরিকার জাতিসমাজে আসন পেল।

যে জর্মন জনসাধারণকে বিশ্বজন নরাধম দানব বলে ধরে নিয়েছিল তারা ভদ্রজনরূপে স্বীকৃত হল।

পশ্চিম ইয়োরোপ তথা আমেরিকা যে-সব অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক সন্ধিচুক্তি তৈরী করছিল তার সর্বোচ্চ স্তরের সব কটিতেই জর্মনি আসন পেল।

এবং আমরা—যারা—এ-দেশে বাস্তুহারা সমস্যা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত—অবিশ্বাস্য বলে মনে করি যে আডেনাওয়ারের নেতৃত্বে পশ্চিম জর্মনি স্থান করে দিল তার আপন শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে, পূর্ব জর্মনি থেকে আগত এক কোটি বিশ লক্ষ্য বাস্তুহারাকে—তাদের জীবনমানে ও পশ্চিম জর্মনির জীবনমানে আজ আর এতটুকু পার্থক্য নেই, আমি স্বচক্ষে ১৯৫৮ এবং পুনরায় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে দেখে এসেছি। কোনো লক্ষ্মীছাড়া দণ্ডকারণ্যে গিয়ে বাস্তুহারাদের বাস্তুভিটে-ঘুঘু-রূপ ধারণ করতে হয়নি।

এবং বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়, এই, আপাতদৃষ্টিতে নৈরাশ্যপূর্ণ গুরুভার আডেনাওয়ার এগিয়ে গিয়ে আপন স্কন্ধে তুলে নিলেন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, রাষ্ট্রজনকরূপে, তেয়াত্তর বৎসর বয়সে।

এ যুগকে সমসাময়িক জর্মন ইতিহাসে বলা হয়, 'আডেনাওয়ার এ্যারা'—'আডেনাওয়ার যুগ'।

এবং এ যুগের এখনো শেষ হয়নি। বিসমার্ককে বিতাড়িত করার পর কাইজার তাঁর রাজনীতি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলেন ; ৮৭ বছর বয়সে বৃদ্ধ (?) অবসর গ্রহণ করার পর যে দুজন চ্যান্সেলার পর পর নিযুক্ত হলেন তাঁরাও বৃদ্ধের কর্মাদর্শ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন।[৬]

অবসর গ্রহণের পর তিনি বৃহৎ তিন খণ্ডে লেখেন তাঁর জীবনস্মৃতি। তৃতীয় খণ্ড প্রেসে পাঠানোর কয়েক সপ্তাহ পর তিনি গত হন।

মৃত্যুর আটদিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষমতা অটুট ছিল। বর্তমান প্রধান-মন্ত্রী কীজিংগার আডেনাওয়ারের শোকসভাতে বলেন, 'কয়েক দিন পূর্বেও র‍্যোনডর্‌ফ্‌ গ্রামে যান, "বৃদ্ধের" কাছ থেকে পথনির্দেশ গ্রহণ করতে।'[৭] এই শেষ দর্শনের সময় তিনি কীজিংগারকে বিভক্ত জর্মনি সম্বন্ধে দুঃখপ্রকাশ করেন। শেষ কথা বলেন, 'আজ যে ধুলো আর কুয়াশাতে পৃথিবী ঢাকা সেটা যখন পরিষ্কার হবে তখন যেন কেউ না বলে, আমি আমার কর্তব্য করিনি।'

* * *

---

৬ জর্মনগণ বৃদ্ধ আডেনাওয়ারকে ভক্তি ও ভালবাসা সহ ডাকনাম দেয় 'ড্যার আলটে (ওল্‌ড ম্যান), তাঁর পরের চ্যানসেলারকে সহাস্যে ডাকনাম দেয়, 'ড্যার ডিকে' (ফ্যাট ম্যান)।

৭ আডেনাওয়ার গত হন ভারতীয় সময় অনুযায়ী বিকেল ৫.৫১ মিনিটে। যে জর্মন বেতার ভারতের জন্য প্রোগ্রাম দেয় সেটি আডেনাওয়ারের প্রিয় কলনেই অবস্থিত—সে ভারতের প্রোগ্রাম আরম্ভ করে বিকেল ৬.৫০ মিনিটে। আমি তখনই খবরটা শুনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এর পর, পর পর কয়েকদিন সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর দরুন হয় বিজলি বন্ধ হয়ে যায় বলে, নয় রিসেপশন খারাপ ছিল বলে ল্যুবকে, গার্‌স্‌টেনমায়ার তথা চ্যানসেলার কীজিংগারের বক্তৃতা ভালো করে বোঝা যায়নি। ২৫ এপ্রিল গোরের দিনও আবহাওয়া খারাপ ছিল।

বিশ্বজন সম্পূর্ণ একমত যে ঃ—

১) আডেনাওয়ার পদদলিত জর্মনিকে লুপ্ত-আত্মসম্মানবোধ এনে দেন ও ইওরোমেরিকার রাষ্ট্রসমাজে তার জন্য গৌরবের আসন নির্মাণ করেন,

২) চিরবৈরী ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা করেন,

৩) এক কোটি বিশ লক্ষ্য বাস্তুহারাকে পরিপূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন।

তিনি মাত্র একটি আশা সফল করতে পারেননি ঃ—

দ্বিখণ্ডিত জর্মনিকে একত্র করতে পারেননি।

* * *

এস্থলে আমি শুধু দুইটি বিষয় উল্লেখ করবো ঃ—

হ্যার ভাইমার স্বর্গত আডেনাওয়ারের উত্তম জীবনী লিখেছেন। আর পাঁচখানা বিদেশী বইয়ের মত এটিও আমার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয়নি—বিদেশী মুদ্রা ও বিদেশী পুস্তক-বিক্রেতাদের 'কৃপায়'।

জর্মন বেতার এই উৎকৃষ্ট পুস্তক থেকে একাধিক অনুচ্ছেদ পড়ে শোনায়।

তারই একটিতে আছে, আডেনাওয়ারের পুত্র উক্ত লেখককে বলেন, 'আমার পিতার মাথার উপর যখন সমস্ত জর্মনির দায়িত্ব তখন আমার মা গত হন। সঙ্গে সঙ্গে পিতা তাঁর দৈনন্দিন রুটিন আমূল পরিবর্তন করে দিলেন, যাতে করে আমরা আরো বেশি সময় ধরে তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারি। এর পর থেকে সফরে গেলে আমাদের জন্য প্রতিটিবার সওগাৎ আনতে কখনো তাঁর ভুল হত না।'

আডেনাওয়ার আপন দেশকে বঞ্চিত করেননি, পরিবারের প্রিয়জনকেও বঞ্চিত করেননি।

যে উচ্চাকাংক্ষা স্বার্থপরতা তথা আত্মম্ভরিতার বিকৃত রূপ ধারণ করে, সে কখনোই কোনো প্রকারের ত্যাগ বরণ করতে পারে না, কিন্তু যে উচ্চাকাংক্ষার সঙ্গে আদর্শবাদ অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত সেখানে প্রকৃত মহাপুরুষ সামান্য শিশুটির দাবীর মূল্যও দিতে জানেন। 'রাজকার্য', 'সমাজসেবা', 'রাষ্ট্রের আহ্বান'—এসব গালভরা কথার দোহাই দিয়ে যারা শিশু, বৃদ্ধ, আতুর-অকর্মণ্য জনকে অবহেলা করে তাদের আদর্শবাদ-এর অস্থিমজ্জা তাদের আপন স্বার্থপরতার উচ্চাকাংক্ষা দিয়ে গঠিত।

শিষ্যসমাবৃত হয়ে প্রভু যীশু ইহজীবনের উচ্চতম আদর্শ, পরজীবনের চরম কাম্য নিয়ে যখন আলোচনা করছেন, উপদেশ দিচ্ছেন, তখনো তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি যে শিশুরা তাঁর কাছে আসতে চায়। আদেশ দিলেন—'শিশুদের আসতে দাও আমার কাছে।'

শিষ্যেরা যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, "Who is the greatest in the Kingdom of heaven ?"

And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them.

* * *

হিটলারের আত্মহত্যার কাহিনী আমি অন্যত্র লিখেছি। তাঁর আত্মহত্যার পর কি হয়েছিল সেটা তার চেয়ে কিছুমাত্র কম বিস্ময়জনক বা কৌতূহলোদ্দীপক নয়, বিশেষত নরদানব মারটিন বরমান তার সঙ্গে বিজড়িত আছেন বলে। কিন্তু সে কাহিনী ভিন্ন এবং এখানেও আমি মাত্র সেইটুকুরই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করবো যেটুকু আডেনাওয়ারের ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নিতান্তই প্রয়োজন।

হিটলার যে সময়ে আত্মহত্যা করেন (বেলা ১৫'৩০।৪৫, ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৫), সে সময়ে রুশবাহিনী মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে তাঁর বাসভবনের চতুর্দিকে ব্যূহ নির্মাণ করেছে। এ ব্যূহ ভেদ করে মারকিন অধিকৃত অঞ্চলে পেঁছিবার চেষ্টা করেন তাঁর নিতান্ত অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ এবং কর্মচারীবৃন্দ যাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। এঁদের ভিতর ছিলেন সেক্রেটারি বরমান, দুই মহিলা স্টেনো, পাচিকা, খাসচাকর লিঙে, দেহরক্ষী-দল, সার্সন, শোফার ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁদের অন্যতম হিটলারের খাস পাইলট বাওর—সৈনবাহিনীতে তাঁর র‍্যাঙ্ক ছিল জেনারেলের। ইনি পালাবার সময় শুধু যে ধরা পড়েন তাই নয়, মেশিনগানের গুলিতে একখানা পা এমনই জখম হয় যে পরে সেটা কেটে ফেলতে হয়।

দীর্ঘ দশটি বৎসর রাশার খ্যাত কুখ্যাত বহু প্রকারের জেল, সেল, বন্দী-শিবিরে অবর্ণনীয় কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করার পর ইনি মুক্তি পান। পূর্বেই বলেছি দেশে ফিরে একখানা বই লেখেন যার নাম, "হিটলার'জ পাইলট"। পূর্ণ দশটি বৎসর বাওর এবং অন্যান্য জর্মন বন্দীরা কী নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে সক্ষম হন তার বর্ণনা দেবার মত কল্পনাশক্তি, স্পর্শকাতরতা, কলমের জোর আমার কিছুই নেই। যে নিপীড়নে মানুষ হাঙারস্ট্রাইক করে, ছুটে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে আত্মহত্যার চেষ্টা দেয় তার বর্ণনা দিয়েছেন বাওর। আমার কাছে যেটা নিদারুণতম বলে মনে হয় সেটা —পরিপূর্ণ নৈরাশ্যের তমিস্র অন্তহীন রজনী—'এ বন্দীদশা থেকে ইহজন্মে আমার মুক্তি নেই'।

এবং আমার মনে হয়, তার চেয়েও 'কষ্টের বিকৃত ভান ত্রাসের বিকট ভঙ্গি' যদি কিছু থাকে তবে সেটা ঐ 'অন্ধকারের ছলনার ভূমিকা'! কি সে ছলনা? মাঝে মাঝে খবর গুজোব রটে বন্দীদের হয়তো বা মুক্তি দেওয়া হবে। আলেয়ার আলো দপ করে জ্বলে ওঠে ক্ষণতরে—আবার আবার সেই সুদীর্ঘ নিরন্ধ্র অমানিশা।

জর্মনিতে চিরকালই দুটি দল। একদল পূর্বপন্থী—রাশার সঙ্গে মৈত্রী কামনা করে। আডেনাওয়ার পশ্চিমপন্থী, রুশবৈরী। বিশেষত যে রুশ হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী জর্মনদের দশ বৎসর পরেও কিছুতেই মুক্তি দেবে না।

রুশ 'ঘোড়া-বিক্‌কিরী'র ব্যবসা করতে চায়। যুদ্ধবন্দী বাওর ইত্যাদি 'ঘোড়া'র বদলে সে চায় আডেনাওয়ার কর্তৃক রুশকে রাষ্ট্রহিসাবে স্বীকৃতিদান,

এবং পূর্ব জর্মানিকেও সে পশ্চিম জর্মানির সঙ্গে সম্মিলিত হ'তে দেবে না। হয়তো এটা অন্যায় নয়। হিটলার রুশ দেশে যা করে গেছেন তার বদলে এ তো সামান্যই। কিন্তু আডেনাওয়ার তো আর হিটলারের প্রিয়পুত্র যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস রূপে পিতার সিংহাসনে বসেননি যে হিটলারের সর্ব অপকর্মের জন্য তার 'মূল্য' দেবেন। বরং হিটলার তাঁকে করেছিলেন লাঞ্ছিত, অপমানিত কারারুদ্ধ।

এবং তার চেয়েও বক্র পরিহাস—যে নাৎসি পারটির মারফৎ তিনি আডেনাওয়ারকে কারারুদ্ধ করেছিলেন সেই পারটিরই বহু গণ্যমান্য সদস্য, জাঁদরেল, অ্যাডমিরাল, হিটলারের আপন বয়স্যসখা রয়েছেন এই যুদ্ধবন্দীদের ভিতর। আডেনাওয়ারকে নতিস্বীকার করতে হবে এদেরও মুক্তির জন্য! এবারে শুনুন বাওর কি বলছেন: "But the-then the much-abused (অর্থাৎ নাৎসি কর্তৃক অপমানিত—লেখক) Adenauer came to Moscow, and our camp was wild with rumours. Our hopes rooketed from zero to feverpoint—and then fell back again This Latter was when Bulganin publicly proclaimed that we were the scum of the earth, and that our crimes had robbed us of all human semblance We cautiously but closely followed the course of Adenauer's hard-fought negotiations, and we could sense that even the Russians respected the determination and integrity of the old man," ('বৃদ্ধ' সাদরে বলা হল—লেখক)

সৃষ্টিকর্তার লীলা বোঝে কে? একদিন সত্য সত্যই খবর এল বাওরাদি অনেকেই মুক্তিলাভ করবেন। একদল বন্দী যাবেন মস্কো থেকে পশ্চিম জর্মানির মুনিক—যেখানে বাওরের মা-বউ আছেন। এ মুক্তি-যাত্রার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাওর বলছেন, 'the memory of that journey is like a film that keeps breaking off.' প্রতিটি জর্মান গ্রামের ভিতর দিয়ে ট্রেন যাবার সময় উল্লাসে উত্তেজিত জনতা ছুটে আসছে ট্রেনের দিকে, বাচ্চাদের হাতে রঙিন ফানুসের জ্বলন্ত মোমবাতি, গির্জায় গির্জায় চলেছে অবিরত হর্ষোল্লাসের ঘণ্টাধ্বনি। নার্সরা ছুটে আসছে খাবার নিয়ে—

থাক্। আমার কলম অতি সাধারণ; এসবের সার্থক বর্ণনা দিতে পারেন যাঁদের লেখনী অসাধারণ, কিংবা বাওরের মত লোক যাঁরা লেখক নন কিন্তু অভিজ্ঞতাটা আছে।

এবং এর করুণ দিকটা বাওর চেপে গেছেন। যেসব পিতা মাতা জায়া এসেছিল আপন আপন আত্মজনের প্রত্যাশায়—যদিও তাদের বলা হয়েছে যে, সেসব আত্মজনের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, কিংবা মিসিং, কিংবা মুক্তি পাবে কিনা স্থির নেই—এবং যারা ফিরেছে তাদের নাম উচ্চকণ্ঠে পড়া শেষ হয়ে গেলে যখন বুঝলো তাদের আত্মজন ফেরেনি, তখন—।

* * *

আডেনাওয়ারের কীর্তিকলাপ একদিন হয়তো বিশ্বজন ভুলে যাবে, কিন্তু বহু বহু জর্মন পরিবার কি বংশপরম্পরা স্মরণে আনবে না—কে তাদের পিতা, পিতামহ, বা প্রপিতামহকে একদা ফিরিয়ে এনেছিল তার বিস্মৃতপ্রায় সুখনীড়ে, দারাপুত্র পিতামাতার মাঝখানে ? যার অবশ্যম্ভাবী গোর ছিল সুদূর সাইবেরিয়ার অন্তহীন তুষারাস্তরণের নিম্নে, সে কার দৈববলে হঠাৎ একদিন ফিরে এসে মুছে দিল জননীজায়ার আঁখিবারি !

জুন, ১৯৬৭ ॥

বিদ্রোহী

ইংরেজ কবি পার্সি বিশ্ শেলির মধ্য-শব্দটি আমরা উচ্চারণ করতুম বিশী, কারণ অন্তে রয়েছে 'ঈ' অক্ষরটি এবং তাই আমরা বাল্যবয়সে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে ইংরেজ কবি শেলির সাদৃশ্য দেখতে পেতুম। তিনি মোলায়েম প্রেমের কবিতা লিখতেন, কিন্তু ওদিকে তিনি আবার ছিলেন মাহমুদ বাদশার মত প্রতিমা-বিনাশধর্মী—এ সংসারে যত প্রকারের false idols, false ideals, অন্ধবিশ্বাস, ভক্তিভরে কুমড়ো গড়াগড়ি, যা-কিছু বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে না—তার বিরুদ্ধে ছিল বিশীদার জিহাদ। তাই তিনি কবিতাগুলিকে পরাতেন প্রাচীন আসামের ছদ্মবেশ। নজরুল ইসলাম তখন সবে ধূমকেতুর মত আত্মপ্রকাশ করেছেন। বিদ্রোহী কাজীকবি পরশুরাম হলে (ক্ষত্রিয়, ফিরিঙ্গি বিনাশার্থে তাঁর অবতরণ) প্রমথনাথ তাঁরই অনবিচ্ছিন্ন পূর্ববর্তী বামনাবতার। তাই তিনি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই হয়ে যান বারনারড শ'র প্রতি আসক্ত। এখানে আরো একটি সাদৃশ্য পাঠক পাবেন। বারনারড শ' ছিলেন প্রতিমা-বিনাশী। তাঁর আদর্শ চরিত্র, সেই ব্ল্যাক গার্ল ওলড টেসটামেনটের দেবতাগুলোকে তার ডাণ্ডা দিয়ে ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে আর খুঁজে বেড়াচ্ছে শাশ্বত ভগবানকে।

প্রমথনাথ তাঁর ডাণ্ডা—নবুকেরি নিয়ে আক্রমণ করতেন—প্রধানত বাঙালীর জড়ত্বকে। শান্তিনিকেতন আশ্রমও রেহাই পেত না।

এটা এল কোথা থেকে !

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের চতুর্দিকে যে-সব অন্ধস্তাবক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথকে প্রায় কর্তাভজাদের গুরুর আসনে বসাতে চাইতেন তার বিরুদ্ধে ছিল কিশোর প্রমথর ঘোরতর 'উষ্মা'। এদেরও ছাড়িয়ে যেতেন বাইরের থেকে—প্রধানত কলকাতা থেকে—আসতেন যে-সব স্তাবক সম্প্রদায়। এঁদের কেউ কেউ বিলিতি ডিগ্রীধারী, জামাকাপড় চোস্তদুরুস্ত—কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো।

এদেরই মুখ দিয়ে ডি এল রায় বলিয়েছিলেন, কবিগুরুর উদ্দেশে :

'মর্তভূমে অবতীর্ণ কুইলের কলম হস্তে
কে তুমি হে মহাপ্রভু নমস্তে নমস্তে !'

কিন্তু এর পর-পরই রায় করলেন ভুল ; রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বলালেন ঝুট কথা :

'আমি একটা উচ্চ কবি, এমনিধারা উচ্চ,
শেলি ভিক্টোর য়ুগো মাইকেল আমার কাছে তুচ্ছ!'

এরকম ধারণা রবীন্দ্রনাথ তো পোষণই করতেন না—বলা দূরে থাক্। তিনি ছিলেন শেলির ভক্ত। বস্তুত তিনি বার বার আমাদের পড়িয়েছেন শেলির কবিতা। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথই বিশীদাকে শেলির প্রতি অনুরক্ত হবার পথ দেখিয়ে দেন।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ এই অন্ধস্তাবকদের নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এবং তাঁর ধৈর্যচ্যুতি যখন ঘটলো তখন দুর্ভাগ্যক্রমে একাধিক সত্য গুণগ্রাহীকেও তাঁর কাছ থেকে অযথা কটুবাক্য শুনতে হল। ইরাণী কবি তাই বলেছেন ঃ

দাবানল যবে দগ্ধদাহনে বনস্পতিরে ধরে
শুষ্কপত্রে, আর্দ্রপত্রে তফাৎ কিছু না করে।

পাঠকের স্মরণে আসতে পারে রবীন্দ্রনাথের অপ্রিয় সত্যভাষণ—যখন তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে বহুলোক শান্তিনিকেতনে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান। আমার যতদূর জানা, বালক প্রমথনাথ সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু এহ বাহ্য। অন্ধস্তাবকদের চিনতে আমাদের বেশী সময় লাগেনি। কারণ এদের কেউ কেউ—বিশেষত বিলেতফের্তারা, শ'র ভাষায় উয়েল শেভ্‌ড্ এ্যান্ড উয়েল সোপ্‌ড্, আসতেন আমাদের মত ডর্মিটারিবাসী নিরীহদের উপর ফপরদালালী করতে। তখন অনেক ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে যেত, শব্দসমন্বয় দ্বারা যে আলিম্পন সৃষ্ট হয়ে লিরিক উচ্ছ্বসিত হয় সে রসে তাঁরা বঞ্চিত, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর এবং কথা কি রকম অদ্ভুত অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে অভূতপূর্ব সমন্বয়জনিত রসসৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে পরিপূর্ণ জড়ভরত। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন আবার পয়লা-নম্বরী ব্লাফমাস্টার। তিনি যে অন্ধস্তাবক নন সেইটে বোঝাবার জন্য একজন আমাকে বলেন, "পুব হাওয়াতে দেয় দোলা, মরি মরি—এই 'মরি মরি'টা কেমন যেন বস্তা-পচা বলে মনে হয় না।" আমি বিস্ময়ে নির্বাক। অতি মহৎ কবিই যে হ্যাকনিড ক্লিশের নূতন ব্যবহার করে নবীন রস সৃষ্টি করেন এ তত্ত্বটা ফিরিঙ্গি-মার্কা গ্র্যাডুয়েট জানে না? আমার তো মনে হত, এস্থলে 'মরি মরি' ভিন্ন অন্য কিছুই মানাতো না।

কিন্তু বিশীদা ছিলেন কালাপাহাড়। আশ্রমের সে সময়কার ভাষায় এদের হুট্ করে দিতে তাঁকে অতিমাত্রায় বেগ পেতে হত না। তাঁকে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হত আশ্রমের ভিতরকার অন্ধস্তাবকদের নিয়ে। বিশেষ করে বিচার-সভায় অর্থাৎ আশ্রম পরিচালনার ব্যাপার নিয়ে।

শান্তিনিকেতনের বয়স তখন কত? একুশ-বাইশের মত। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনো ট্র্যাডিশন, ঐতিহ্য, আচার নির্মিত হতে পারে না। বিশেষত গুরু রবীন্দ্রনাথই করে যাচ্ছেন নানা প্রকারের এক্সপেরিমেন্ট। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আশ্রম প্রবর্তনের সময় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে একই পংক্তিতে ভোজন করতো না, কিছুদিন পরে একজন কায়স্থ শিক্ষক আসছেন শুনে কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত, ব্রাহ্মণ

শিষ্য এই অব্রাহ্মণ গুরুর পদধূলি প্রতি প্রাতে নেবে কিনা! তারই পনেরো বৎসর পর আমি যখন পেঁছিলুম তখন সে-সব সমস্যা অন্তর্ধান করেছে। ইতি-মধ্যে মৌলানা শওকৎ আলী সাধারণ ভোজনালয়ে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ব্রাত্য সকলের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করে গেছেন।

তবু হিন্দু মন সর্বক্ষণ খুঁত খুঁত করে আচারের সন্ধানে। সে চায়, সর্ব সমস্যার সামনে সে যেন নজীর দেখাতে পারে, 'এটা পূর্বে এ রকম পদ্ধতিতে হয়েছে, অতএব এবারেও সেই রকম হওয়া উচিত—এটা এ রকম হয়নি, অতএব এবারে হবে না'; তাতে করে নবাগত ছাত্রের অসুবিধা হোক আর না-ই হোক। মুসলমান যে এ বাবদে দুর্দান্ত প্রগতিশীল তা নয়, সেও ইনোভেশনকে ডরায় এবং তাকে বলে 'বিদা 'ৎ', কিন্তু ইসলাম মাত্র ১৩০০ বছর পুরনো বলে অতখানি লোকাচার দেশাচারের দোহাই দেয় না।

প্রমথনাথ বিশী ছিলেন এই ট্র্যাডিশন নামক প্রতিষ্ঠানটির দুশমন। বিচার সভা তথা অন্যান্য স্থলে তিনি প্রিসীডেনসের দোহাই শুনতে চাইতেন না। তাঁর বক্তব্য—এবং সেটা সব সময়ই উত্তেজিত কণ্ঠে, পঞ্চমে, তদুপরি তাঁর কণ্ঠ-স্বরটি ঠিক আব্দুল করীম খানের মত নয়—শুনে আমার মনে হত, তাঁর নীতি; —নূতন সমস্যা যখন এসেছে তখন তার নূতন সমাধান খুঁজতে হবে—এবং যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগ করে—পূর্বে হয়নি, তাই এখন হবে না. এটা কোনো কাজের কথা নয়। অবশ্য তিনি যে সব সময় 'রেশনালিটি এবাভ্‌ অল' সচেতন ভাবে ভলতেরের মত নীতিরূপে গ্রহণ করতেন তা নাও হতে পারে।...এমন কি গুরু রবীন্দ্রনাথের মতের বিরোধিতাও তিনি করেছেন। এই নিয়ে বোধ হয় গুরু-শিষ্যে মনোমালিন্যও হয়েছে। তবে নিশ্চয় চিরস্থায়ী তো নয়ই, দীর্ঘস্থায়ীও নয়।

প্রমথনাথ জাত সাহিত্যিক। শান্তিনিকেতনে যখন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলেজ স্থাপিত হল—সাধারণ জন একেই বিশ্বভারতী বলে, যেন গোড়ার ইস্কুলটি বিশ্বভারতীর সোপান নয়—তখন রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানালেন বিশ্বাচার্যদের। তাঁরা এসে পুণোদ্যমে আরম্ভ করলেন, প্রধানত প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা (এবং সর্বপ্রধানত ইংলজি)—চীনা, তিব্বতী ভাষাও বাদ গেল না, এবং লাতিন, ফরাসী, জর্মন ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষা চর্চা। সবাই সেই দয়ে মজলেন। বাঘা বাঘা পণ্ডিত যেমন বিধু শাস্ত্রী, ক্ষিতি শাস্ত্রী, সাহিত্যিক অমিয় চক্র, এস্তেক ক্ষিতিমোহনের সহধর্মিণী 'ঠানদি'—কেউ ফরাসী, কেউ জর্মন, কেউ চীনা, কেউ বা তিব্বতী শিখছেন মাথায় গামছা বেঁধে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নোটবই হাতে নিয়ে লেভির ক্লাসে শিখছেন একাক্ষরপারমিতার ঠিকুজি আর অহিবুধনিয় সংহিতার কুলজি।

শুধু শ্রীপ্রমথ নিশ্চল নির্বিকার। তিনি বেঙ্গলি লিতেরাতোর পার একসে-লাঁস (litterateur par excellence) বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক। তাঁর 'কোন প্রয়োজন, রজত কাঞ্চন'? এমন কি সংস্কৃত ব্যাকরণ ঘাঁটতেও তিনি নারাজ। হরিবাবু ইস্কুলে যেটুকু শিখিয়ে দিয়েছেন তারই প্রসাদাৎ তিনি কালিদাস শুদ্রক পড়ে নেবেন'খন। শুনেছি লক্ষ্ণৌয়ের খানদানী ঘরের ছেলেকে

উর্দু ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা বলতে দেওয়া হয় না—পাছে বিজাতীয় ভাষা বলতে গিয়ে উর্দুর তরে বিধিনির্মিত তার মুখের ডোল অন্য ধ্বনির খাতিরে এডজাসটেড হয়ে বিকৃত হয়ে যায় !

বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগকে (কলেজকে) এহেন নিরঙ্কুশ বয়কট করার পিছনে বিশীদার হৃৎ-কন্দরে সেই 'বিদ্রোহ' ভাব ছিল কিনা হলফ করে বলতে পারবো না।

কিন্তু বি. এ এম. এ. তো পাস করতে হয় ; নইলে গ্রাসাচ্ছাদন হবে কি প্রকারে ?

অতিশয় অনিচ্ছায় তিনি কলকাতার কলেজে ঢুকলেন। তাঁর কলেজ-জীবন সম্বন্ধে আমি বিন্দুবিসর্গ পর্যন্ত জানি নে। এই মর্মান্তিক অধ্যায় তিনি বোধ হয় তাঁর জীবন-পুঁথি থেকে ছিঁড়ে ফেলেছেন। তবে আমি নিঃসন্দেহ, প্রক্সি-প্রতিষ্ঠান-প্রসাদাৎ তিনি তাঁর কলেজ-জীবনের ন'সিকে কাটিয়েছেন চায়ের দোকানে, মেসের রকে এবং ইহলোক পরলোকের সর্ববিশ্ববিদ্যালয়কে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ্য অভিসম্পাত অনবরত দিতে দিতে। এবং আমি তার চেয়েও নিঃসন্দেহ, এম. এ পাস করার পর তিনি বঙ্গভাষাসাহিত্য ও তজ্জড়িত তত্ত্ব ও তথ্য ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয়ার্জিত—সাতিশয় বিতৃষ্ণা ও চরম জুগুপ্সাসহ অর্জিত—'জ্ঞানগম্যি' শেষনাগের মত, প্রাগুক্ত অহিবুধনিয় সংহিতায় অহির বাৎসরিক ত্বকবর্জনন্যায় অক্লেশে পরম পরিতোষ সহকারে ত্যাগ করেছেন—চিরকালের তরে। লোকে যখন শুধোয়, কালচার কি—উত্তরে গুণীজন বলেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়লব্ধ 'জ্ঞানগম্যি' বিস্মৃত হওয়ার পর যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেই কালচার। কিন্তু, প্রমথনাথের কালচার অত্যন্ত কনসানট্রেটেড—নির্যাসেরও নির্যাস। মাত্র একবার, তাও অযত্নে ডেসটিল করা গোড়ী (rum) বা মধ্বী (mead, meth) খেয়েই মানুষ হয় গড়াগড়ি দেয় নয় ল্যাম্পপোস্ট ধরে চুমো খায়—যেন লঙ লস্ট ব্রাদার। রাজা জহানগির খেতেন 'ডবল ডেসটিলড্ এরেক'। প্রমথনাথের ব্রুয়ারিতে পাক বড় কড়া—শতগুণে কড়া।

কিন্তু সেই বিদ্রোহীর কি হয় ?

শ'র 'কৃষ্ণা'ও একদিন হৃদয়ঙ্গম করলো, 'এলোপাতাড়ি লাঠির বাড়ি ধুপুস-ধাপুস মারাতে' কোনো তত্ত্ব নেই। নিছক 'বর্বরস্য শক্তিক্ষয়'। প্রমথ তাই প্রমথেশের মত ধ্যানতাণ্ডবে সম্মেলন করেছেন।

কিন্তু বিদ্রোহী থাকবেই।

কেন ?

প্রমথর প্রিয় কবি শেলি। তাঁর প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ নায়ক প্রমিথিয়ুস আনবাউন্ড। তিনি দেবাদিদেব দ্যোঃ পিতর, জুপিটারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বর্গলোক হতে অগ্নি নিয়ে এসে মানবসন্তানকে উপহার দেন—যার জন্য তাবৎ সভ্যতাসংস্কৃতির সৃষ্টি। প্রমথগণ ধূর্জটির অনুচর বা 'ইয়েস-মেন' বটেন কিন্তু প্রমথগণ অগ্নিবাহ রূপেও পরিচিত—এঁরা মরীচির পুত্র ও সপ্ত পিতৃগণের প্রমথ। তাই প্রমথ অগ্নির পুত্র। অপরঞ্চ গ্রীক পুরাণে আছে প্রমিথিয়ুস

নলের (reed,—এবং স্যাকরারা এখনও নল ব্যবহার করে, তথা অগ্ন্যস্ত্র অর্থে নালাস্ত্র, নালিকও ব্যবহৃত হয়) মাধ্যমে পৃথিবীতে অগ্নি আনয়ন করেন। এবং আমাদের কাহিনীতে আছে, নলরাজ ইন্ধন প্রজ্বালনে সুচতুর ছিলেন।[১] এবং এই নলের বিরুদ্ধে দেবতারা যে-রকম লেগেছিলেন (প্রমিথিয়ুসের বিরুদ্ধে জুপিটার) অন্য কারো বিরুদ্ধে না ; আমার পুরাণাদির জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ, তাই শপথ দিতে পারছি না, অন্য কোনো মানবীর স্বয়ংবরে স্বয়ং দেবতারা সপত্নরূপে অবতরণ করেছিলেন কিনা—দময়ন্তীর বেলা যে রকম করেছিলেন। এবং নলের অন্য নাম প্রমন্থ।[২]

প্রাচীন গ্রীকেরা প্রমিথিউস শব্দের অর্থ করতেন ঃ পূর্বে (প্র)+মতি, চিন্তাকারী (methe), কিন্তু অধ্যাপককুল প্রমিথিয়ুস নিয়েছেন সংস্কৃত 'প্রমন্থ' =অরণি বা সমিধ অর্থে ; যে দণ্ড মন্থন, ঘর্ষণ করে অগ্নি জ্বালানো হয়। দ্বিতীয়টিই শুদ্ধ। কারণ—metheus থেকে মথ, মন্থ। নইলে th=থ-এর অর্থ হয় না।

প্রমিথিয়ুস, নল—প্রমথ কখনো বিদ্রোহ করেন, কখনো বশ্যতা স্বীকার করেন। আমাদের প্রমথ শেষ পর্যন্ত কি করেন তার জন্য অত্যধিক অসহিষ্ণু না হয়ে বলি।

শতং জীব, সহস্রং জীব।

প্রোটকল

শ্রীল শ্রীযুক্ত জলসা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাত্মন,

স্বভাবতই সর্বপ্রথম প্রশ্ন উঠবে, উপরিস্থ পদ্ধতিতে আপনাকে সম্বোধন করবার হক্ক আমার আছে কিনা ? অর্থাৎ এটিকেটে বাধে কিনা ? আরো সরল আন্তর্জাতিক পরিভাষা ব্যবহার করতে হলে বলবো, আমার এ আচরণ 'প্রোটকল'-সম্মত কিনা।

ভয় নেই। আমি শব্দতত্ত্ব নিয়ে অযথা মাথা ফাটাফাটি করবো না। সামান্যতম যেটুকু নিতান্তই না হলে চলে না তারই দিকে আপনার তথা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। ভোজনারম্ভে তিক্তবস্তুর ন্যায় যৎসামান্য।

কোনো কোনো শব্দের পরিধি পরিব্যাপ্তি দিন দিন বেড়ে যায়—কোনোটার আবার কমে। এই ধরুন না, 'কনটাক্ট' শব্দটি। একদা বোঝাত নিতান্ত

---

১ 'তিনি (নল) এক মুষ্টি তৃণ গ্রহণপূর্বক সূর্যদেবকে ধ্যান করিবামাত্র ঐ তৃণে সহসা হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।' দময়ন্তী সকাশে সৈরিন্ধ্রী কেশিনীর প্রতিবেদন। বনপর্ব।

২ এ তত্ত্বটি আমার গুরু আমাকে বলেন, কিন্তু আমি এটি কোথাও পাইনি। কেউ জানাতে পারলে বাধিত হব।

স্থূল ভাবে শারীরিক সংস্পর্শে আসা।

সে আমলে যদি কেউ লিখত 'উপমন্ত্রী সুশীলাবালা দাসী গত রাত্রে শ্রীযুক্ত নটবর নায়ককে কনটাক্ট্ করেছেন' তবে সেটা প্রায় অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে যেত। আজ স্বচ্ছন্দে বলি, 'প্রাচীর নব্যন্যায় অধুনা প্রতীচীর এপিস্টমলজির কন্টাক্টে আসাতে উভয়ই উপকৃত হয়েছেন।' অবশ্য তার অর্থ কি, আল্লায় মালুম।

প্রোটকল শব্দটির বেলাও তাই হয়েছে। একদা গ্রীক ভাষাতে বোঝাতো;—যেমন ধরুন, আপনার একখানা টাইম-টেবিল আছে। হঠাৎ ইশ্টিশানে পেয়ে গেলেন, হ্যান্ড-বিল-পারা একখানা নোটিশ। তাতে ট্রেনের সময় পরিবর্তনের নবীন ফিরিস্তি রয়েছে। আপনি সেটি আপনার টাইম-টেবিলের যথাস্থলে গঁদ দিয়ে সেঁটে দিলেন। তখন এ কাগজের টুকরোটি পেয়ে গেলেন পৈতে। হয়ে গেলেন প্রোটকল। গেরেমভারী নাম। এ-পাড়ার মেধো হয়ে গেলেন ভিন্-পাড়ার মধুসূদন।

সরকারি না-হক ট্যাকশো যে রকম বাড়তে বাড়তে পর্বতপ্রমাণ হয়ে যায় এ শব্দটিও আড়াই হাজার বছর ধরে বাড়তে বাড়তে তার 'তনু'টিকে অদ্যকার 'বপু' করে তুলেছে। বেশ এক যুগ পূর্বে এটিকেটের মহানগরী প্যারিসে পররাষ্ট্র বিভাগ বা ফরেন আপিসে একটি ভিন্ন বিভাগ খোলা হয়েছে; তার নাম 'প্রোটকল বিভাগ'। একটা পুরো পাক্কা আস্ত ডিপারট্মেন্ট্।

রাজ্যচালনার কোন্ গুরুভার এঁদের স্কন্ধে সমর্পিত হয়েছে?

বহুবিধ। এমন কি আমার মত লোক না পারলেও আপনি এদের সাহায্য তলব করতে পারেন। অবশ্য কলকাতাতে এরকম পুরো-পাক্কা প্রোটকল বিভাগ আছে কিনা, আমি সঠিক জানি নে। ধরুন আছে। আরো ধরুন, আপনি, সম্পাদক মশাই, কোনো পারটিতে নর্থ পোলের কনসাল জেনরেলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। কথায় কথায় বেরিয়ে গেল তিনি ভারতীয় ফিলমে বড়ই ইনটেরসটেড। পরিচয় নিবিড়তর হল। ইতিমধ্যে তিনি আপনাকে একটি খাসা ডিনারও খাইয়ে দিয়েছেন। সেটি রিটারন্ করতে হয়। কনসাল্ বিপত্নীক। একটি অবিবাহিত মেয়ের বয়স একুশ—অর্থাৎ 'সোসাইটি করা'র বয়স হয়েছে। অন্য মেয়েটি পল্টনের কেপটেনকে বিয়ে করেছেন। তিনি একা এসেছেন কলকাতায়, বাপের কর্মস্থলে। ওদিকে আপনি সাউথ পোলের কনসুলেট জেনরেল শার্জে দাফেরকেও ঐ দিনই নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁর ভামিনী ও এক কন্যাও সঙ্গে আসছেন। কন্যাটির স্বামী ছিলেন। তিনি স্বামীর কাছ থেকে সেপারেশন নিয়ে পিতার সঙ্গে বাস করেন। ডিনারে আরো ইনি উনি তিনি আসবেন।

এইবারে আমরা আসছি—ইংরিজিতে যাকে বলে—থিক্ অব্ দ্য বেট্ল-এ। অর্থাৎ মূল সমস্যায়। আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন প্রিসীডেনস বস্তুটি সাংঘাতিক। আপনার ড্রইংরুমে ককটেলাদি পান করার শেষের দিকে যখন বাটলার এসে আপনার স্ত্রীর সামনে বাও করবে তখন তিনি মুচকি হাসবেন

প্রধান অতিথির দিকে। সেই মসিয়ো ল্য কন্‌স্যুল জেনরেল যেন পবনে ভর করে আপনার স্ত্রীকে এসে দান করবেন তার দক্ষিণ বাহু। তারই উপর 'নির্ভর' করে দুজনাতে এগোবেন খানা-কামরার দিকে। এরপর যাবেন আপনি। কিন্তু দক্ষিণ বাহু দান করবেন কাকে? সাউথ পোলের শার্জে দাফেরের স্ত্রীকে, না নর্থ পোলের অবিবাহিতা কন্যাকে, না কেপটেনের স্ত্রীকে, না কর্নেলের তালাক-প্রাপ্ত মহিলাকে? ··এবং তারপর আসবেন কোন্ জোড়া, তারপর, ইত্যাদি।

তাই আপনি সুবুদ্ধিমানের মত পূর্বাহ্নেই ফোন করেছেন, শ্যাফ্ দ্য প্রোট-কলকে—অর্থাৎ প্রোটকলের বড় কর্তাকে। অতি অমায়িক লোক। তদুপরি আপনি সম্মানিত কাগজের তারই মত শ্যাফ্, বড় কর্তা। কে কতখানি সম্মান পাবেন, তাদের দফতর ফিষ্টি দিলে আপনার প্রিসীডেনস কি—অর্থাৎ কার আগে কার পরে আপনি খানা-কামরায় ঢুকবেন—তার প্রোটকলে আপনার নাম উঁচুর দিকে। অতএব একগাল হেসে বলবেন,—'সে কি মসিয়ো—(ভুললে চলবে না, আন্তর্জাতিক প্রোটকলের ভাষা এখনো ফরাসিস্!)—আপনি অত-খানি আঁবায়াসে (এমবারাস্‌ট্) হচ্ছেন কেন? এ যে একেবারে ডিমের খোসায় কালবোশেখী। আপনি তো আর অফিশিয়াট ডিপ্লোমেটিক ডিনার দিচ্ছেন না। কি বললেন? না, না, না—পারদোঁ, আমি আপনার ব্যান-কুয়েটটাকে মোটেই হেনস্তা করছি নে। তবু বলছি, ওটা তো—'

ঐ আনন্দেই থাকুন, সম্পাদক মশাই, ওঁকে বিশ্বাস করেছেন কি মরেছেন।

যতই 'ঘরোয়া' 'বাড়ির ব্যাপার' 'ফেমিলি ওয়ে' বলে নেমন্তন্ন করুন না কেন, —এবারে খাঁটি দিশী তুলনা দিচ্ছি—সেখানে যদি মাছের মুড়োটা আপনার দিদির শ্বশুরকে না দিয়ে দেওয়া হয় আপনার ভাগ্নের শ্যালাকে, তদুপরি উনি কুলীনস্য কুলীন, আর কালো ছোকরা মৌলিকস্য মৌলিক, তা হলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে? আমি বলছি না, শ্বশুরমশাই বাড়ি ফিরে এ্যাট হিজ আরলিএস্ট কনভিনিয়েন্‌স্ আপনার দিদির পিঠে—ছি, ছি, তিনি আবার বৌমা —দু ঘা, না না, তা বলছি নে।

প্রোটকলের শ্যাফ্ সবিশেষ অবগত আছেন যে আপনি তার স্তোকবাক্য সিরিয়সলি নেননি। তিনিই বলবেন।

'সে তো হল। কিন্তু ঐ যে বললেন সাউথ পোলের ডিভোর্স কন্যা—স্বামী ছিলেন কর্নেল—তিনি এখন কি নামে পরিচয় দেন? ঠিক ডিভোর্স তো হয় নি—হয়েছে সেপারেশন।'

'সেটা কি ইমপরটেন্ট?'

'ভেরি, ভেরি। মহিলাটি যদি স্বামীর নাম ত্যাগ করে পুনরায় তাঁর মেডেন (কুমারী) নাম, অর্থাৎ তাঁর পিতার নাম গ্রহণ করে থাকেন তবে তিনি পাবেন সেই পরিবারের র‍্যাংক, নইলে পাবেন কর্নেলের বিবাহিতা স্ত্রীর র‍্যাংক। তার পর দেখতে হবে—'

ততক্ষণে আপনার মাথাটি তাজ্জিম মাজ্জিম করছে। ভাবছেন, এবারে আর ডিমের খোসাতে টর্ণাডো নয়, আপনার কানের টিম্‌পেনামে চলেছে মহা-

বেগে যুগ্ম রুশমার্কিন নির্মিত স্পুটনিক।

আম্মো ভাবছি আজ যদি ডাচেস অব উইনজর তৃতীয় বারের মত যদি, মানে, ইয়ে হয়ে যান তবে তাঁর নাম কি হবে? শুনেছি, হালে নাকি তিনি লণ্ডনে 'জলচল' হয়ে গেছেন। ড্যুককে বিয়ের পূর্বে মিসেস সিমসন অবস্থাতে তিনি রাজবাড়িতে দাওয়াৎ খেয়েছেন—যদ্যপি রাজমাতা মেরি সে দাওয়াৎ বর্জন করেন। তাঁর সে 'বামনাই' নাকি প্রোটকল-নিন্দিত অপকর্ম হয়েছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি দেহরক্ষা করেছেন। এখন প্রশ্ন, ডাচেস যদি আরেকটা ডিভোর্স নেন তবে তিনি লণ্ডনে সাধনোচিত ধাম পাবেন কিনা, অর্থাৎ বকিংহম ধামে নিমন্ত্রিত হবেন কি না?

হাসছেন? হাসবার জিনিস মোটেই নয়। চাকরি যেতে পারে। রুটি মারা যেতে পারে।

নিন্ হিটলারের যে কোনো প্রামাণিক জীবনী। পড়ুন ঘটনাটা। হিটলার গেছেন ইতালি—স্টেট ভিজিটে। সঙ্গে গেছের ফরেন আপিসের শ্যাফ্ দ্য প্রোটকল। শ্যাফ্টি সাতিশয় খানদানী ঘরের ছেলে। পোষা বেরালটাকে আগে দুধ দিতে হয়, না কুকুরটাকে হাড্ডি—সে প্রোটকল তিনি সাত বছর বয়সেই পারিবারিক কাস্লে যুক্তিতর্কসহ সপ্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

ইতালির রাজা সর্বান্তঃকরণে ঘেন্না করতেন হিটলারকে—অবশ্য অনুভূতিটা ছিল উভয়পক্ষীয়, সাতিশয় 'বরাবরেষু'! রাজা পাতলেন ফাঁদ, হিটলারকে অপদস্থ করার জন্য। শেষ মুহূর্তে কি একটা হয়ে গেল রদবদল। যার ফলে হিটলার উপস্থিত হলেন কি এক পরবে সিভিল ড্রেস পরে, যেখানে আর সবাই য়ুনিফর্মে! কিংবা উল্টোটা!

বিশ্বসংসার জানে হিটলার ছিলেন অত্যন্ত বদ-মেজাজী লোক—যদিও একথাও সত্য যে মিষ্টি ব্যবহার করতে চাইলে তিনি পার্মিট-প্রার্থী মেবার-বাসীকে তিন লেনথে হারাতে পারতেন—দুষ্টলোকে বলে, তিনি তখন মেঝেতে শুয়ে পড়ে কারপেট চিবুতে আরম্ভ করতেন—তাঁকে নাকি বলা হত The Carpet-Eater!

প্রোটকল শ্যাফ্ বরখাস্ত হয়ে প্রথমতম ট্রেনে নাক বরাবর আপন গাঁয়ে। হিটলার তাঁর মুখদর্শন পর্যন্ত করেননি।

অবশ্য এর সরস দিক নিয়েও একাধিক কাহিনী আছে। বাল্যকালে হিটলার যে অস্ট্রিয়ার নগণ্য প্রজা ছিলেন সেই বিরাট অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির মহিমান্বিত সম্রাট ছিলেন কাইজার ফ্রানৎস য়োজেফ। তাঁর 'ভাব-ভালবাসা' ছিল সুন্দরী অভিনেত্রী শ্রীমতী শ্রাটের সঙ্গে। তিনি প্রায়ই কাইজারকে বলতেন, 'আপনি স্টেজের উপর গিরার্ডির রসিকতা শুনে হাসতে হাসতে কাত হয়ে পড়েন। স্টেজে আবার রসিকতা করার সুযোগ পান গিরার্ডি কতটুকু? পাব্-এ, বার-এ, চায়ের মজলিসে তিনি যা একটার পর একটা ছেড়ে যান তার তুলনায় কেউ কখনো করতে পেরেছেন বলে কোনো কিংবদন্তী পর্যন্ত এই বিরাট ভিয়েনা শহরে নেই।' তাই গিরার্ডিকে কফি পানে নিমন্ত্রণ করা হল। কাইজার তো এলেন বিরাট

প্রত্যাশা নিয়ে। ওদিকে কী আশ্চর্য! গিরার্ডির কোটের বোতাম ওপরবাগে উঠতে উঠতে যেন তাঁর ঠোঁট দুটোকেও বোতামিত করে দিয়েছে! নিজের থেকে কথা কন না আদৌ, প্রশ্ন শুধলে মহা সসম্ভ্রমে যেটুকু বলেন সেটি তার গোঁপের ছাঁকনিতেই আটকা পড়ে যায়।

কফি পান খতম হতে চলেছে। শেষটায় থাকতে না পেরে হতাশ কাইজার ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'মাই ভেরি ডিয়ার গিরার্ডি! আপনার মজলিস-জমানো কথার ফুলঝুরি সম্বন্ধে আমি কত মুখে কতই না বেহদ্দ তারিফ শুনেছি—আর এ কি?'

রুমাল দিয়ে মাথার ঘাম মুছতে মুছতে এক্কেবাম্যে গ্রাম্য ভাষায় গিরার্ডি বললেন, 'হুজুর জাঁহাপনা! অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির কাইজারের লগে এ্যাগ্‌বার আপনে কফি খাইতে বহয়া দ্যাহেন্ না!'

বেচারি গিরার্ডি প্রোটকলকে কনসল্ট করে কফি খেতে এসেছিলেন!

তাঁর শেষ বাক্যটি ঠিক প্রোটকলসম্মত কিনা সে নিয়েও আমার মনে ধোঁকা আছে।

একদম হালের ঘটনায় চলে আসি।

এই গত ৯।১০ই জুন তারিখে আরব রাষ্ট্রগুলো এবং ইজরাএল সকলেই যখন অস্ত্রসম্বরণ (সীস ফায়ার) করতে রাজী হয়ে গেছেন তখন রাশা ইউনাইটেড নেশনের সিকুরিটি কৌনসিলের বিশেষ জরুরী সভা ডাকার জন্য প্রস্তাব পাঠালে; তার অভিযোগ, ইজরাএল সীস ফায়ার করেনি—ক্রমাগত সিরিয়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সীটিং বসলো সকাল ন'টা-দশটায়। এদেশে তখন রাত বারোটা। মিটিঙে বসানো মাইকের মারফত তার প্রত্যেকটি বাক্য ভইস অব আমেরিকার নিউজ রুমে আসছে। সেইটে ফের বেতারিত হয়ে রিলের পর রিলের মারফত ভারতে পেঁচচ্ছে। অধমের অনিদ্রা ব্যাধি আছে।

এই সিকুরিটি কৌনসিলের কর্মপদ্ধতি অতিশয় ছিমছাম। যে যার বক্তব্য বলে যান সাধারণত অতিশয় শান্ত-কণ্ঠে। কেউ কাউকে বাধা দিয়ে আপন কথা বলতে চায় না—অতি দৈবেসৈবে কেউ যদি কখনো করে তবে বার বার মাফ চেয়ে, ও বাধাপ্রাপ্ত বক্তাও সঙ্গে সঙ্গে থেমে যান। চেল্লাচেল্লি হৈ-হুল্লোড়ের কথাই ওঠে না।

প্রেসিডেণ্ট গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি এখন সোভিয়েত রাশিয়ার মহামান্য ('ডিস্‌টিংগুইস্‌ট্‌' শব্দটি প্রতিবার প্রতি মেম্বারের উল্লেখ করবার সময় ব্যবহার করাটা প্রোটকলানুযায়ী নিরঙ্কুশ বাধ্যতামূলক) ডেলিগেটকে "ঘরের ফ্লর" ছেড়ে দিচ্ছি।' অর্থাৎ তখন ঘরের ফ্লর—মেঝেটাতে দাঁড়িয়ে কথা বলার হক্ক সোভিয়েত ডেলিগেটের। অবশ্য তিনি ফ্লর গ্রহণ নাও করতে পারেন।

মহামান্য রাশান ডেলিগেট দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্পাসিব'—কিংবা 'স্লাগোদারিয়ু ভাস'ও বলে থাকতে পারেন। অর্থ একই; 'থ্যাঙ্ক্যু'। অর্থাৎ তিনি ফ্লর গ্রহণ করলেন।

তারপর এখন যে বিবৃতি নিবেদন করছি সেটা স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর

করে। 'সন্দেহপিচেশ' পাঠক আমার অত্যল্পই। তাঁরাও ঐ সময়কার খবরের কাগজ পড়ে চেক্-অপ্ করে নিতে পারবেন, তাঁদের হাত দিয়ে আমি দা-কাটা তামাক অর্থাৎ সাতিশয় স্থূল ভুল—খেয়েছি কিনা। কিন্তু আমি অতি সংক্ষেপে সারছি।

রুশ ঃ 'থ্যাঙ্ক্যু, মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমি বলতে চাই, এই সম্মানিত কৌনসিল আরব এবং ইজরাএল উভয়কে আদেশ দিয়েছে সীস-ফায়ার মেনে নিতে। সিরিয়ার মহামান্য ডেলিগেট বলেছেন, সীস-ফায়ার মেনে নেওয়া সত্ত্বেও ইজরাএল সিরিয়ায় অনুপ্রবেশ করে, ট্যাংক সাঁজোয়া গাড়িসহ ক্রমাগত রাজধানী দিমিশকের (ডিমেস্কাস্, দামা, ডামাস্কুস) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বোমারু বিমান অনবরত রাজধানীর উপর বোমাবর্ষণ করছে! আমি প্রস্তাব করি, কৌনসিল সর্বসম্মতিক্রমে ইজরায়েলের এ আচরণের নিন্দা করুক। ধন্যবাদ, মিঃ প্রেসিডেন্ট!'

(বক্তৃতা শেষ করে কোন কোন সদস্য ভবিষ্যতে তাঁর বক্তৃতার কি ভাষ্য হবে না হবে সে বাবদে তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার দাবী জানান। পক্ষান্তরে বক্তব্য স্পষ্ট 'হ্যাঁ', 'না' বা নিতান্ত দ্ব্যর্থহীন হলে সে অধিকার যে রাখছেন না, সে-কথাও বলে দেন। এটার প্রয়োজন এই কারণে যে কৌনসিলের বাহান্ন রঙের নানান চিড়িয়া নানান বুলি কপচান। অনুবাদ নিয়ে পরে তাই নানা হক্ক না-হক্ক তর্ক ওঠে)।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমি এখন ইজরাএলের মহামান্য ডেলিগেটকে ফ্লর ছেড়ে দিচ্ছি!'

ইজরাএল ডেলিগেট ঃ 'আমার মহামান্য সরকার যখন সীস-ফায়ারে স্বীকৃতি দেন তখন তিনি স্পষ্ট বলেন, "আমরা সীস-ফায়ার মানবো, কিন্তু শর্ত (অন কন্ডিশন) যে আরবরাও তাই মানবে।" অতএব সীস-ফায়ারটা ম্যুচুয়াল করতে হবে। ইতিমধ্যে আমার মহামান্য সরকার তাঁর সেনাবাহিনীতে সীস-ফায়ারের হুকুম দিয়েছেন।'

এ উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে হয়তো বা রুশ ডেলিগেট নিন্দাসূচক প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারেন। সে-সম্ভাবনা দেখে প্রেসিডেন্ট ফের রুশকে ফ্লর দিলেন।

রুশ ঃ (অতি সামান্য অসহিষ্ণু কণ্ঠে) 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! এ তো বড় তাজ্জবকী বাত! এই "ম্যুচুয়াল সীস-ফায়ার" রহস্যটা কি? মহামান্য ইজরাএল ডেলিগেট কি বলতে চান, প্রথমে, পয়লা, সিরিয়া সিস-ফায়ার করবে, তবে ইজরাএল অস্ত্রসংবরণ করবেন? তদুপরি, মিঃ প্রেসিডেন্ট, 'ম্যুচুয়াল' শব্দটাই আমাদের অনুশাসনে নেই। এবং আসল তত্ত্ব, ইজরাএলই আক্রমণ করেছে প্রথম। সীস-ফায়ার করতে হবে তাকেই প্রথম। আচমকা ঐ ম্যুচুয়াল শব্দ আমদানি করে ইজরাএল কথার মারপ্যাঁচ (কজিস্ট্রি) আরম্ভ করে মূল সত্য এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন? (তারপর অতি সামান্য ব্যঙ্গের সুরে—লেখক) এরপর বুঝি সফিস্ট্রি আরম্ভ হবে! (কথার প্যাঁচে সত্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণের ভদ্র নাম সফিস্ট্রি—রুশ সদস্য ফেদেরেন্কো 'কজিস্ট্রি' ও 'সফিস্ট্রি'

দুটো শব্দই ব্যবহার করেছিলেন যৎসামান্য ব্যঙ্গের সুরে —কারণ ইজরাএল সদস্য যে সত্যিসত্যিই পাঁকাল মাছের গা মোচড়ানো আরম্ভ করে দিয়েছেন সেটা ততক্ষণ শত্রুমিত্র সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে—লেখক)। মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমি আদৌ অবিশ্বাস করছি নে যে, ইজরাএল সরকার তাঁর সেনাবাহিনীকে সীস-ফায়ারের হুকুম দিয়েছেন, কিন্তু মহামান্য ইজরাএল সদস্য বলুন, তারা সেটা মেনে নিয়েছে কিনা, তিনি বলুন, তারা সিরিয়ায় ক্রমাগত আরো অনুপ্রবেশ করছে কিনা? থ্যাঙ্ক্যু মিঃ প্রেসিডেন্ট।'

প্রেসিডেন্ট: 'আমি মহামান্য ইজরাএলের ডেলিগেটকে ফ্লর দিচ্ছি।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর শোনা গেল ফের প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর: 'আমি মহামান্য বুলগেরিয়ার ডেলিগেটকে ফ্লর দিচ্ছি।' স্পষ্ট বোঝা গেল মহামান্য ইজরাএল 'ফ্লর গ্রহণ' করলেন না। প্রোটকলানুযায়ী প্রেসিডেন্ট তাঁকে হুকুম দিতে পারেন না।

বুলগেরিয়া (ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে—বস্তুত একমাত্র ইনিই কিঞ্চিৎ উত্তেজনা দেখান—যদিও সর্বভদ্রতা বজায় রেখে। ইজরাএল কথা বলেছে স্বভাবতই বিজয়ীর গর্বিত কণ্ঠে, সিরিয়া করুণ ফরিয়াদভরা সুরে—আর ইজরাএলের জয়ে খুশীতে ডগমগ মার্কিন তথা তার ফেউ ইংরেজ করেছে, 'হে*-হে*-হে*-হে*') : 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! ইজরাএল উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আমি শুধু জানতে চাই, ইজরাইলি বাহিনী এখন কোথায়? সিরিয়াতে? "হ্যাঁ" কি "না" তিনি স্পষ্ট বলুন! তিনি যদি কথা বলেন তবে আমাদের যা বলার বলবো, তিনি যদি না বলেন তবে আমরা ভেবে নিয়ে জেনে যাবো।' (ডিলেমাটি সুন্দর "If Israel speaks, we shall speak; if Israel does not speak we shall know,"—লেখক)

প্রেসিডেন্ট পুনরায় ইজরাএলকে ফ্লর দিলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

প্রেসিডেন্টর গলা: 'আমি মালির মহামান্য ডেলিগেটকে ফ্লর দিচ্ছি।'

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, ইজরাএল ফ্লর গ্রহণ করেননি, করতে চানও না। এরপর বোধ হয় কর্মসূচীতে মালি রাষ্ট্রের নাম ছিল।

মালি: 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! আমরা সবাই এখানকার সদস্য। এক সদস্য যদি অন্য সদস্যের কাছে কিছু জানতে চান তবে আপনি তাঁকে সেটা শুধোচ্ছেন না কোন্ বিধি অনুসারে? থ্যাঙ্ক্যু!' (বা ঐ ধরনের)

প্রেসিডেন্ট: 'আমি সম্মানিত মালি সদস্যের কাছে জানতে চাই, আমি যে সম্মানিত ইজরাএলী সদস্যকে সম্মানিত রুশের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো তা কোন্ বিধি অনুযায়ী?' মালি কোন উত্তর দিতে চান কিনা ঠাহর হল না। কারণ ইতিমধ্যে রুশ সদস্য ফ্লর চাইলেন। প্রেসিডেন্ট সসম্মানে তাই দিলেন।

রুশ: 'মিঃ প্রেসিডেন্ট! সভার কাজ সুষ্ঠুরূপে চালাবার জন্য আমরা ওয়ার্কিং এরেঞ্জমেন্ট মেনে নিয়ে থাকি। সেই অনুযায়ী যে কোনো সদস্য যে কোনো খবর যে কোনো সদস্যের কাছে চাইতে পারেন। এই তো আমরা

সভার সদস্য সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্তকে অনুরোধ করলুম সিরিয়া থেকে তাজা খবর আনিয়ে দিতে। তিনি দিলেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি!

তৎসত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট সম্মানিত ইজরাএলী সদস্যকে প্রশ্নটি শুধোলেন না। তিনি কিন্তু একাধিক বার তাঁকে সসম্মানে ফ্লর ছেড়ে দিলেন। ইজরাএল ফ্লর গ্রহণ করলেন না।

তবেই বুঝুন, সম্পাদক মশাই, প্রোটকলের ঠেলা কী চীজ!

কিন্তু চিন্তা করলে দেখতে পাবেন: প্রেসিডেন্ট—থুড়ি—সম্পাদক মশাই (ক্ষণতরে ভাবছিলুম, আমি বুঝি সেকুরিটি কৌনসিলে পেঁছে গিয়েছি!) এটা কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। আমি প্রাচীনপন্থী পদি পিসির অপজিট পুংলিঙ্গ। যা নাই ভারতে—! খুলে বলি।

সেকুরিটি কৌনসিলের কার্যকলাপ যখন আমি সরাসরি বেতারে শুনছি তখন ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল এই রকমই একটি ধুন্ধুমার যেন আমি সশরীর কোথাও দেখেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ ধুন্ধুমার কথাটাই সব মনে করিয়ে দিল। যে মধুকৈটভ-নিধন শ্রীবিষ্ণুকে আর্যভদ্রগণ সায়ংপ্রাতঃ স্মরণ করেন সেই বিষ্ণু তথা অন্যান্য দেবাদিকে প্রচণ্ড নিপীড়ন আরম্ভ করে মধুকৈটভের পুত্র ধুন্ধুমার এবং অবশেষে নৃপতি কুবলাশ্ব কর্তৃক নিহত হয়। মহাভারতের আপ্তবাক্যমধ্যে সেটি লিপিবদ্ধ আছে।

ধুন্ধুমার স্মরণ করিয়ে দিলে সেই সভা, যেখানে দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন। আমি জাতিস্মর। আমি সে-সভায় উপস্থিত ছিলুম তখনকার দিনের পি-টি-আই চীফ রিপর্টার মুলগায়েন সঞ্জয়ের দোহার রূপে।

পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে দুইটি নিরপরাধ ব্যক্তি যেভাবে আত্মসমর্থন করেছেন তার তুলনা আজো ইহসংসারে অলভ। ঐতিহাসিক যুগে সোক্রাতেস, তার বহু পূর্বে দ্রৌপদী।

কিন্তু অবিস্মরণীয় তত্ত্ববাক্য:—সোক্রাতেস জাত দার্শনিক, পাঁড় তার্কিক। তিনি যে আত্মপক্ষ সমর্থনকালে শাণিত শাণিত তর্কবাণে অ্যাথিন্স্ নগরীর নভোমণ্ডল দিবাভাগে তমসাচ্ছন্ন করে দেবেন তাতে আর বিচিত্র কি? সেকুরিটি কৌনসিল প্রসঙ্গে পূর্বেই নিবেদন করেছি রুশ প্রতিনিধি ফেদেরেনকো ইজরাএলকে 'সফিস্ট্' আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। সোক্রাতেস এই সব সফিস্ট্-দেরই নগরীর মুক্ত হট্টে বাক্যেতর্কে নিত্য নিত্য অমৃতক্র পান করাতেন। তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন অত্যাশ্চর্য অবিস্মরণীয় হলেও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য নয়।

কিন্তু একবস্ত্রা যাজ্ঞসেনী আত্মসমর্থন হেতু দুর্যোধনের সভামধ্যে যে যুক্তি-জাল বিস্তার করে কতিপয় সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন তার সম্মুখে তদানীন্তন ভারতের গুনীজ্ঞানী শূরবীর সমন্বিত সর্ববৃহৎ সভা নিরঙ্কুশ নিরুত্তর। অসূর্যম্পশ্যা কৃষ্ণা যে আইনকানুন প্রোটকল সম্বন্ধে কতখানি অনভিজ্ঞা ছিলেন তা তাঁর সভামধ্যে রোদনের সময়ই ধরা পড়েছে: 'হায়, আমি স্বয়ংবরকালে রঙ্গমধ্যে ক্রমাগত ভূপালগণের নেত্রপথে একবার নিপাতিত হইয়াছিলাম, ইতিপূর্বে যাঁহারা আর আমাকে দেখেন নাই, এক্ষণে আমি তাঁহাদেরই

সম্মুখে সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি, যাহাকে পূর্বে বায়ু ও আদিত্য পর্যন্ত দেখিতে পান নাই…' (আমরা বলি) তিনি যে সোক্রাতেসের মত সেকালের কোন প্রটো-আকাডেমির সদস্যা ছিলেন না অথবা ডক্টরেট অব্ জ্যুরিসপ্রুডেন্স পাস করেননি সে বাবদে আমরা স্থিরনিশ্চয়, দৃঢ়প্রত্যয়। তাই পাঞ্চালীর ডিফেন্স আমাদের কাছে 'ঘৃত-লবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধনসমস্যাহীন কলিকাতা মহানগরীর' মত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

এ যেন সেকুরিটি কৌনসিলের ঠিক উল্টো পিঠ। হেথায় তাবৎ সভা কা কা রবে চিৎকার করছে কিন্তু ডিসটিংগুইশ্ট্ ইজরাএল প্রতিনিধি নিশ্চুপ, নীরব। অথচ তাঁর জিভে ফোস্কা পড়েনি, তাঁর টনসিলে বাত হয়নি। সভায় ৯৫ নয়াপয়সা মেম্বর কোনো প্রোটকল খুঁজে পাচ্ছেন না যেটা গজাঙ্কুশের মত প্রয়োগ করে ইজরাএলের দাঁতকপাটি খুলতে পারেন।

আর হেথায় দ্রুপদতনয়া বারংবার একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন, ধর্মরাজ দ্যূতক্রীড়ায় 'অগ্রে আমাকে কি নিজেকে বিসর্জন করেছেন?' (ইজরাএলকেও মাত্র একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 'ইজরাএলি বাহিনী এখন কোথায়?') যুক্তিটি অতি সুস্পষ্ট। ধর্মরাজ যদি নিজেকে স্টেক্ করে আগেভাগেই খুইয়ে ফেলে দুর্যোধনের দাস হয়ে গিয়ে থাকেন তবে যেহেতু দাসের কোন সম্পত্তিতে অধিকার থাকতে পারে না অতএব 'দাস' যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাকে স্টেক করতে পারেন না (দাস হবার পূর্বেও তিনি মাত্র ২০% মালিক—কিন্তু এ ল'পইনট্ বোধ হয় তখন ওঠেনি)।'[১]

তা সে যা-ই হোক, ঐ একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তরই তিনি পাচ্ছেন না। এবং হা অদৃষ্ট! কোনো প্রোটকলও খুঁজে পাচ্ছেন না যার চাপে তিনি সভাসদদের মুখ খোলাতে পারেন। বরঞ্চ ভীষ্ম যে প্রোটকল উত্থাপিত করলেন তার মোদ্দা: ডিস্টিংগুইশ্ট্ দ্রুপদতনয়া তাঁদের প্রশ্ন শুধিয়েছেন (ইংরিজিতে এস্থলে বলে 'বার্কিং আপ দি রং ট্রী')। তাঁর উচিত তাঁর স্বামী ধর্মরাজকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা। তিনিই বলতে পারেন, কৃষ্ণা 'জিতা বা অজিতা'।

কিন্তু বিদুর যে জিনিসের আশ্রয় নিলেন, সেটাকে প্রীসিডেনস, নজীর বা হদিস বলা যেতে পারে, ঠিক প্রোটকল নয়। তাঁর মতে মহর্ষি কশ্যপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদকে অনুশাসন দেন 'হে প্রহ্লাদ, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও প্রশ্নের প্রত্যুত্তর না দেয় এবং যে সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে তাহারা সহস্র সংখ্যক বারুণ-পাশ দ্বারা বন্ধন পায়।'[২] অর্থাৎ silence সর্বাবস্থায় golden নয় (অবশ্য এস্থলে gold is silent, কারণ সভাসদদের আয় সকলেই দুর্যোধনের

---

১ ইসলামে দাস যেমন আইনত পূর্ণ নাগরিক নয় (সেখানেও সে কোনো কিছু স্টেক করতে পারে না) ঠিক তেমনি সে কোনো আইনভঙ্গ করলে (চুরি, ডাকাতি) তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয় না। খেসারতি দিতে হয় মুনিবকে।

২ জ্বর-জ্বালাদি রোগকেও 'পাশ' বলে ধারণা করা হত বলে অথর্ববেদে ঋষি পাশমুক্তির জন্য বরুণদেবকে আহ্বান জানাতেন।

gold পেয়ে silent !)।

কিন্তু এ নজীর ধোপে টিকল না। মহাভারতকার বলছেন, বিদুরের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া সভাস্থ পার্থিবরা কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না !!!

কিন্তু এ সব চুলচেরা বাগ্‌বিতণ্ডার মূলে কে ?

দ্রৌপদী যে প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন সেটা তো কেউ সেকেণ্ড করবে। নইলে সেটা উল্‌ট্রা ভিরেস, নাকচ।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে সেকেণ্ড করে বসল দুর্যোধনের ছোট ভাই চ্যাংড়া অর্বাচীন বিকর্ণ ! তিনি স্পষ্ট গলায় বললেন, 'যাজ্ঞসেনী যাহা কহিয়াছেন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ইঁহারা আসিয়া এ বিষয়ে কিছু বলুন।' তারপর তিনি যখন দেখলেন 'সভাসদবর্গের কোনো ব্যক্তিই সাধু অসাধু কিছুই কহিলেন না' তখন 'হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন', অর্থাৎ অনেক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে রায় দিলেন, 'এইসকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।'

সর্বনাশ ! আজকের দিনের ভাষায় বলতে গেলে এ যেন নিতান্ত চ্যাংড়া ঘানা বা মালি রাষ্ট্র সেকুরিটি কৌনসিলে বলে বসল, 'এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে (অর্থাৎ যেহেতু ইজরাএলই প্রথম আক্রমণ করেছে) সাইনাইকে ইজরাএলের (প্রাচীন দিনের ভাষায় দুর্যোধনের) জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।'

ধুন্ধুমার লেগে গেল সভায়, মহাভারতের ভাষায় 'সঙ্কুলরবে' (একসুরে) 'তুমুল নিনাদ' উঠলো সভাস্থলে। এখানে আমার বলা উচিত যে, বিদুরাদি কেউ কিছু বলার পূর্বেই বিকর্ণ আপন রায় দিয়ে বসে আছেন। তাঁর ভয় হয়েছিল, প্রবীণরা নীরবতা দিয়ে দ্রুপদনন্দিনীর প্রশ্নটি পিষে ফেলবেন— 'নীরবতা' যে শুধু মাত্র 'হিরন্ময়' তাই নয়, সরব প্রশ্নকে নিধন করার মারণাস্ত্রও বটে।

অনেকেই বিকর্ণের পক্ষে সায় দিচ্ছেন দেখে কর্ণ 'ফ্লর' গ্রহণ করলেন। বললেন, 'হে বিকর্ণ এই সভায় বহুবিধ বিকৃতি দৃষ্ট হইতেছে বটে—'

আমরাও বলি, 'সেই কথাই কও।' 'বিকৃতি' মানে প্রোটকল-সম্মত নয় !

কর্ণ বললেন, 'তুমিই কেবল বালস্বভাবসুলভ অসহিষ্ণুতায় অধৈর্য হইয়া স্থবিরোচিত বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। তুমি দুর্যোধনের কনিষ্ঠ, পর্ব বিষয়ে যথাবৎ অভিজ্ঞ হও নাই—'

এইবারে কর্ণ মারলেন পেরেকটার ঠিক মাথার উপর মোক্ষম ঘা। এই পর্ব বস্তুটি কি ? কারণ মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের যে নির্ঘণ্ট আছে তার প্রথমটার মতে বিকর্ণের নম্বর আট, দ্বিতীয়টার মতে উনিশ।

আর 'পর্ব' অর্থই হচ্ছে 'নির্দিষ্ট'—আমাদের 'পরব' মাত্রই হয় নির্দিষ্ট দিন ক্ষ্যাণে। তাই 'পর্ব'ই হচ্ছে প্রোটকল। যা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যার থেকে নড়চড় নেই। বিকর্ণ সেই প্রোটকল ভঙ্গ করেছেন। কিন্তু তাঁর ও

দ্রৌপদীর কার্যোদ্ধার অংশত হয়ে গেছে। ওদিকে আবার কর্ণ স্বয়ং করে বসেছেন প্রোটকলে গলদ!

কারণ সভারম্ভেই মিঃ প্রেসিডেন্ট দুর্যোধন প্রোটকল ধার্য করে দিয়েছেন—কর্ণ যাকে 'পর্ব' বলেছেন—যে, 'কৌরবগণ দ্রৌপদীর সমক্ষে তাহার প্রশ্নের উত্তর করুন।' অর্থাৎ তিনি ফ্লর দিয়েছেন কুরু সদস্যদের। অপিচ কর্ণ আইনতঃ (ডে জুরে) রথচালক শ্রেণীর লোক—আজকের ভাষায় 'শোফার সর্দারজী ক্লাস' [যদ্যপি প্রকৃতপক্ষে (ডে ফাক্টো) তিনি কুন্তীনন্দন প্রথম পাণ্ডব; কিন্তু সদস্যগণ সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলে এ-বিবেচনা এস্থলে উঠতে পারেনি, কস্মিনকালে ওঠেওনি] তিনি ফ্লর গ্রহণ করতে পারেন না। তবে বিকর্ণ যে প্রোটকল ভঙ্গ করেছেন সেটা হয়তো তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন—কারণ পইন্ট্ অব্ অরডার সভাসীন যে-কোনো সদস্য যে-কোন সময়ে তুলতে পারেন। কিন্তু তারপর কর্ণ যখন বললেন, 'দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের যাহা কিছু আছে সে সমুদয়ই শকুনি ধর্মতঃ জয় করিয়াছেন' তখন তিনি বিলকুল আউট অব্ প্রোটকল কারণ প্রেসিডেন্ট রুলিং দিয়েছেন, উত্তর দেবেন কৌরবরা।

অতএব দ্রোণ যে ফ্লর গ্রহণ করেননি সেটাও অতিশয় করেক্ট্। কারণ তিনি ও অন্যান্য কৌরবেতররা অবগত আছেন ব্যাপারটা বহুলাংশে কুরু-পাণ্ডবের ঘরোয়া ব্যাপার। যে শকুনি সর্বস্ব জয়লাভ করেছেন তিনিও তাঁর হক্কের দাবী করে ফ্লর চাননি।

বস্তুত সভাপতিরূপে ডিস্‌টিংগুইশ্‌ট্ প্রেসিডেন্ট মিঃ দুর্যোধনের আচরণ অক্ষরে প্রোটকলসম্মত। তিনি কুরুকুলকে ফ্লর দিয়েছেন কিন্তু কী ভীষ্ম কী বিদুর কাউকে কিছু বলার জন্য কোনো চাপ দিচ্ছেন না।

অবশেষে তুমুল বাগ্-বিতণ্ডার পর প্রেসিডেন্ট দুর্যোধন যখন স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে কুরুকুলের কেউই আপন সুচিন্তিত অভিমত দিচ্ছেন না, যাজ্ঞসেনী যে 'জিতা' সে রায় দূরে থাক (কর্ণের রায়ের মূল্য নেই, এবং দুঃশাসন তখন 'প্রতিহারী' বা 'বেলিফ' বা সভার 'মারশাল'; এবং তিনিও সুদ্ধমাত্র দ্রৌপদীকে অপমানার্থে 'দাসী দাসী' বলে সম্বোধন করছেন, যুক্তিতর্ক দ্বারা শকুনির লিগেল-রাইট্ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি। তখন তিনি যে রুলিং দিলেন সেটাও অতিশয় ন্যায্য। তিনি জানতেন যে যদিও তিনি আইনত প্রেসিডেন্ট, তবুও এ-তত্ত্ব অনস্বীকার্য যে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম কুরুকুলের সর্বোচ্চ আসন ধরেন। তিনি যখন স্পষ্ট বলেছেন, স্বয়ং ধর্মরাজ এর মীমাংসা করুন তখন এ সিদ্ধান্ত এক হিসাবে তাবৎ কুরুবংশের সিদ্ধান্ত। এবং যেহেতু দুর্যোধন সভারম্ভেই বলেছেন কুরুকুল উত্তর দেবেন তখন যুক্তিযুক্তভাবেই শেষ উত্তর দিলেন, কুরুকুলের সিদ্ধান্ত; ধর্মরাজ উত্তর দেবেন। কিন্তু ধর্মরাজ যখন ফ্লর গ্রহণ করলেন না, তখন তিনি দ্রৌপদীকে বললেন, (ধর্মরাজ যখন ফ্লর নিচ্ছেন না তখন প্রোটকলানুযায়ী তাঁর কনিষ্ঠেরা ফ্লর পাবেন—হুবহু যেরকম অপর পক্ষে বিকর্ণ পেয়েছিলেন) 'হে যাজ্ঞসেনী, ভীষ্ম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের

মত-ই আমার মত।'

এবং এঁরাও ফ্লর গ্রহণ করলেন না। অর্থাৎ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন না।

এখানেই সভা শেষ।

সম্পাদক মহাশয়, যতই চিন্তা করি, পুনরায় মহাভারত অধ্যয়ন করি, পুনরায় চিন্তা করি, তখন দেখি, সেই অতি প্রাচীনকালে আমরা কতখানি ন্যায়-ধর্ম ও প্রোটকল মেনে সভা চালাতুম! যদি দুঃশাসনের অনাযাচরণের কথা তোলেন তবে বলবো সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়, দুর্যোধন কর্তৃক দ্রৌপদীকে 'উরুমধ্য' প্রদর্শন অনুচিত কিন্তু সেগুলো 'ইনট্রিগেল পার্ট অব দি প্রসীডিংস অব দ্য মিটিং' নয়, 'সভার কর্মসূচীর অন্তর্গত অবর্জনীয় অংশ' নয়। দুঃশাসন ও দুর্যোধন শুধু অতিশয় রূঢ় পদ্ধতিতে দেখাতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মতে দ্রৌপদী জিতা। সভার কার্যকলাপে প্রোটকল আদৌ লাঞ্ছিত হননি।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সম্পাদক মহাশয়, সে-যুগে ফিলিমি ছিল না, তার মাসিক ছিল না, তস্য সম্পাদক ছিলেন না। কাজেই তাঁকে কি ভাবে সম্বোধন করতে হয় সে-বাবদে কোনো প্রোটকল খুঁজে পেলুম না। তবু খুঁজছি, কারণ 'দুধ' না পেলেও 'পিটুলি' পাবো নিশ্চয়ই !!

পপ্‌লালের মগডালে

দুই মহা 'চাণক্যে' বিশ্রম্ভালাপ হচ্ছিল। নিদাঘের মধ্যরাত্রি আসন্ন। প্রচুর সুরা পান হয়েছে। ফলে সর্বাঙ্গ দিয়ে অজস্র স্বেদ ও তজ্জনিত বাষ্প বিনির্গত হচ্ছে। এমতাবস্থায় সেই স্টীম থেকে যে স্পিরিট বেরুচ্ছে সেটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সামান্যতম স্পর্শ পেলেই দপ করে জ্বলে উঠবে ব'লে চাণক্যদ্বয় সিগার ধরাচ্ছেন না।

ইতিমধ্যে একজন গভীরতম চিন্তায় নিমজ্জিত থাকার পর দ্বিতীয়জনকে প্রশ্ন করলেন, "একটা সমস্যা নিয়ে আমি অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, ভ্রাতঃ! ভেবে ভেবে কোনো কুলকিনারা পাচ্ছি নে। মার্শাল থেকে শুমপেটার হয়ে কেইনস রবিনস সবাইকে চষেছি—বেকার বেকার। তা আপনার কাছে তো কিছুই অজানা নেই—"

"হুম।"

"এই ডাক-বিভাগটা চলে কি প্রকারে? অত অঢেল টাকা পায় কোথায়? ভাবুন দিকিনি, বিরাট বিরাট মাইনের ডাঙর ডাঙর আপিসাররা রয়েছেন, দশাসই সব আপিস দপ্তর, অগুনতি ভ্যান, লম্বা দৌড়ের রেলগাড়ি হলেই তার আধখানা জুড়ে ডাকের জন্য খাস ব্যবস্থা—এ তো আর ফোকটেমুফতে হয় না! হ্যাঁ, মানলুম, তারা কোটি কোটি টাকার ডাকটিকিট বেচে। কিন্তু ওটাকে তো আর ব্যবসা বলা চলে না। ১০ পয়সার ডাকটিকিট বেচে ১০ পয়সায়, ১৫ পয়সার টিকিট বেচে ১৫ পয়সায়, কুড়ির কুড়ি পয়সায়ই। এক কানাকড়িও তো মুনাফা নেই ওতে,—যা দর তাতেই বিক্রি! লাভ রইল

কোথায় ? তা হলে ডাক-বিভাগটা চলে কি করে ?"

"অতি হক কথা কয়েছেন, আমিও সানন্দে স্বীকার করছি, টিকিট বিক্রি করে ডাক-বিভাগের রত্তিভর মুনাফা হয় না। যে দাম আছে, তাতেই সে বিক্রি করতে বাধ্য। কিন্তু জানেন তো, দাদা, বড় বড় মুনাফার ব্যবসা মাত্রেই লাভের পথটা থাকে লুকানো—যেদিকে সরল জনের নজর যায় না, তার মনে কোনো সন্দেহই হয় না। আচ্ছা! এইবারে দেখুন সমস্যাখানার রহস্য। পনেরো গ্রাম ওজনের খামের জন্য পোস্টাপিস চায় পনেরো পয়সা টিকিট—নয় কি ? এইবারে আপনাকে আমি শুধোই—হক্ক কথা কন। প্রত্যেকখানি চিঠির ওজনই কি টায়-টায় পনেরো গ্রাম ? হাজারখানার ভিতর একখানারও হয় কি না হয়—এ তো কানায়ও দেখতে পায়। একটার ওজন হয়তো বারো গ্রাম, কোনোটার আট, কোনোটার বা তেরো। এইবারে বুঝলেন তো, এই যে তফাতটা—এই যে ফারাকটুকু, এর থেকেই ডাকবিভাগের নিরেট লাভ—ঐ দিয়ে তার দিব্যি চলে যায়।"

পাঠক ভাবছেন, আমি অর্থশাস্ত্রের জটিলতম সমস্যায় কণ্টকিত এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত করলুম কেন ? আমিও তাই ভাবছি। বস্তুত আমি মেহতা-চৌধুরী-জনসুলভ এই পঞ্চতন্ত্র কাহিনীটি যখন শ্রবণ করে কৃতকৃতার্থ হই তখন, কিংবা আমার বাতুলতম মুহূর্তেও আমি ওহেন সম্ভাবনার কণামাত্র আভাস পাইনি যে, ইটি একদিন আমার কাজে লাগবে।

লেগেছে। টায়-টায় না হলেও হরেদরে। সর্ব কাহিনী, তাবৎ উপমাই দাঁড়ায় তিন ঠ্যাঙের উপর ভর করে। চার পায়েই যদি দাঁড়ায়, তবে তো সে হুবহু একই বস্তু হয়ে গেল। উপমা রূপক, প্রতীক হতে যাবে কেন ?

বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ দেখি, এক দরদী সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় বিকট চিৎকার করে চিল্লি দিয়ে কেঁদে উঠেছেন, বিদেশী পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য। হায় হায় হায়, এদের কি হবে ? এরা কোজাবে, মা !

কান্নার বহর দেখে মনে হল, এঁরা যেন ফুটপাথের পুরনো বই বিক্রিরী-ওলাদের চেয়েও বিকটতর বিপাকে পড়েছেন। এদের দুরাবস্থা (প্রেস ! হ্যাঁ, আমি আকার দিয়ে দুরাবস্থাই লিখছি) দেখে সেই সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলছেন।

আম্মো দরদী। কিন্তু এই ডুকরে-ওঠা, চিল-চ্যাঁচানো মড়া-কান্না শুনে আমার হৃদয়ে 'মিলক অব হ্যুমেন কাইণ্ডনিস' না বয়ে লেগে গেল সেথায় অন্য ধুন্ধুমার। খাঁটি মড়া-কান্না আমি বিলক্ষণ চিনি। আমার বসত-বাসা শ্মশানের লাগোয়া।

* * *

মহাকবি হাইনরিষ হাইনের মরমিয়া প্রেমের গীতি কবিতা সম্বন্ধে একাধিক বার লেখবার সুযোগ আমি পেয়েছি। ইনি সাক্ষাৎ চণ্ডীদাস। পাঠককে শুধোই, 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু', 'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' শুনে কি তোমার কখনো মনে হয়েছে, এ কবি '…চিঠির' মত

(এ-মাসিকের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো ফরিয়াদ নেই—অস্মদ্দেশে শত্রু মিত্র উভয় ভাবেই পুজো করার পদ্ধতি ঐতিহ্যসম্মত) কিংবা কংগ্রেস কম্যুনিস্টের মত কটুকাটব্য কস্মিনকালেও করতে পারে ?

তাই যখন বিঘ্নসন্তোষী, পরশ্রীকাতর একপাল (লুমপেন-পাক) ফেউ লাগলো হাইনের পিছনে তখন তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। সবাই ভাবলে, যার মুখ দিয়ে সদাই মধু ঝরে সে আবার এসব বেতালা বদখদ বেক্তমীজী বাতের কীই বা জবাব দেবে। ভুল ভুল ! সম্বাই করলেন ক্ষ-তে গলদ।

এঝদিন তাঁর হল ধৈর্যচ্যুতি।

কি যেন একটা—আমার ঠিক স্মরণে আসছে না—ভ্রমণ-কাহিনী না কি যেন কিসে মোলায়েম প্রাকৃতিক বর্ণনা দিতে দিতে তিনি বললেন, সবাই জানেন, আমি সাতিশয় সাধারণ কবি, তাই আমার খাঁইও অতিশয় সাধারণ। কবি মানুষ, দয়াময় ভগবান যদি নদীপারে আমাকে একখানা কুঁড়েঘর দেন, তা হলেই আমার দিব্যি চলে যাবে। আর ঘরের তৈরি সাদামাঠা কিঞ্চিৎ রুটি—শহুরে বান, ক্রোআঁশা[১] কিসসুটি না—আর ঘরেই তৈরি মাষা পরিমাণ মাখম, ব্যস। তদুপরি দয়াময় ভগবান যদি আমাকে আরো খুশী করতে চান, তবে তিনি যেন ঐ নদীপারে উঁচাসে উঁচা একসারি পপ্‌লার লাগিয়ে দেন। সর্বশেষে, তাঁর অসীম করুণাবশে যদি দয়াময় আমাকে পরিপূর্ণ কৈবল্যানন্দ দিতে চান, তবে তিনি যেন আমার পিছনে যারা লেগেছে ঐ দুশমনদের পপ্‌লারের মগডালে ফাঁসি দেন। অন্তবিহীন আনন্দরসে ভরপুর হৃদয় নিয়ে, কুটিরের দাওয়ায় বসে আমি তখন উপরপানে তাকিয়ে দেখব, সাতিশয় মনঃসংযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করবো, আহা কী রমণীয় দৃশ্য ! দুশমনদের পাগুলো মৃদুমন্দ পবনে দুলছে—দোদুল দোলায় হিল্লোল লাগিয়ে।[২] হ্যাঁ, আলবৎ প্রভু যীশুখৃষ্ট আদেশ দিয়েছেন[৩] শত্রুকে ক্ষমা করবে, তাকে প্রেম দেবে। নিশ্চয় করব, নিশ্চয়ই দেব—আমার সর্বসত্তা উজাড় করে, কিন্তু ঐ যে বললুম, ওদের ফাঁসি হয়ে যাবার পর।"

* * *

---

১ ক্রোআঁশা = ক্রেসেণ্ট—অর্ধচন্দ্রের ন্যায় দুধেমাখমে তৈরি ফিনসি রুটি। তুর্করা ভিয়েনা যুদ্ধে পরাজিত হলে পর, ভিয়েনাবাসী তুর্কদের পতাকা-লাঞ্ছন অর্ধচন্দ্র আকারে রুটি বানিয়ে তাদের জয় সেলেব্রেট করে। আজ যদি ইস্টবেঙ্গল একটি কেকের উপর মার্শপেনের "বাগান" বানিয়ে সেটা খায়—অনেকটা সেই রকম ! আমি কিন্তু মোহনবাগানী।

২ যাঁরা আর্ট হিস্ট্রির চর্চা করেন, তাঁদের স্মরণে আসবে গোয়ার ছবি, যেখানে গাছে ঝোলানো শত্রুকে পর্যবেক্ষণ করছেন এক অফিসার—টেবিলে কনুই রেখে হাতে আরামসে মাথা রেখে। বস্তুত এ ছবি বেরোবার (১৮১০—১৩) কয়েক বছর পরই হাইনে তাঁর প্রবন্ধ লেখেন।

৩ হাইনে ইহুদি। ইহুদিরা খৃষ্টকে স্বীকার করে না।

কিন্তু যে গল্পটা দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম সেটা গেল কোথায় ?

যাঁরা বিদেশী বই বেচনেওলাদের তরে ঘটি ঘটি অশ্রু বর্ষণ করছেন তাঁদের একজনের ভাবখানা অনেকটা ঃ পাঁচ শিলিঙের বই যদি তারা তারই ন্যায্য এক্সচেঞ্জে ভারতীয় টাকায় বেচে, তবে তাদের মুনাফা রইল কোথায় ? এক ডলারের দাম সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা (কথার কথা কইছি, আমি সঠিক ভাও জানি নে), যদি সাত টাকা পঞ্চাশেই বেচে, তবে লাভ রইল কোথায়—ঐ সেই ডাকটিকিট বিক্রির মত !

তিনি তারপর আরেক ঘটি এক্স্ট্রা চোখের জল ফেলে বলছেন, তাদের কত খর্চা। চিঠি লিখতে হয় (মরে যাই !), ডাকমাশুল দিতে হয় (ও বাছারে !) এবং তারপর আর কি সব ধানাইপানাই করেছেন আমার মনে নেই। কিন্তু এইবারে অসহিষ্ণু পাঠক, ক্ষণতরে মেহেরবানী করে তুমি নিচের মোক্ষম তত্ত্বটি মনোযোগ সহকারে পড়ো।

উপরের উল্লিখিত ঐ একজনই না, যাঁদের হাত দিয়ে বিলিতি বইওলারা তামাক খাচ্ছেন তাঁদের কেউই তো বলছেন না (কিংবা আমার হয়তো চোখে পড়েনি)—অন্তত সেই সরল বিপ্রসন্তান (ইনি পণ্ডিত তথা বিপ্র—এ দুয়ের সংযোগে মানুষ বড় সরল, neif হয়) বলেননি—

বিলিতি বইওলারা কত কমিশন পায় ?

আমানউল্লার মাতা রাণীমার আদেশে তাঁর বন্দী চাচা নসরউল্লাকে খুন করা হয়। সর্বত্র খবর রটলো, কফি খেয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

সংবাদদাতা বিলকুল ভুলে গেলেন মাত্র একটি সামান্যতম তথ্য পরিবেশন করতে। কফিতে ছিল সেঁকো বিষ।

এঁনারা এই সেঁকো বিষ অর্থাৎ কমিশনটির বাৎ বেবাক ভুলে যাচ্ছেন।

কত কমিশন পায় ? জানি নে। তবে বঙ্গসন্তানদের ধারণা ২৫% ৩০%-এর বেশী হবে না, কারণ বাঙলা পুস্তক বিক্রেতা সচরাচর এর বেশী পায় না (হালে জনৈক প্রখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা গুদোম সাফ করার জন্য শতকরা ৪০।৫০ দিচ্ছেন বলে—পাঠক পরম পরিতোষ পাবেন, ওর মধ্যে আমার বইও ছিল—বাঙলা বইয়ের বাজারে ধুন্ধুমার লেগে যায়)। তাই প্রশ্ন, যে-স্থলে বাঙালী প্রকাশক দু' হাজার বই ছাপিয়ে শতকরা ২৫।৩০ কমিশন দেয়, সে স্থলে মার্কিন ইংরেজ এক ঝটকায় পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ ছাপিয়ে কত দেয় ? কুইক টার্নঅভার নামক একটি বস্তুও আছে। শুনেছি এরা ষাট পার্সেণ্ট পর্যন্ত দেয়। আমি বলতে যাচ্ছিলুম আশী। তা বলবো না কেন ? তোমরা যখন এই জীবনমরণ ভাইটাল তত্ত্বটি চেপে যাচ্ছো। দেখাও না কাগজপত্র। আমি অবশ্য বিশ্বাস করবো না। তোমরা সব পারো।

ঈশ্বর সাক্ষী, স্বরাজ লাভের পর থেকে সরকার বিস্তর বিস্তর আইন পাস করেছেন—আমি চাঁদপানা মুখ করে সব সয়েছি, রা-টি কাড়িনি। কিন্তু সরকার যখন এই কমিশন ব্যাপারের গুহ্য, সযত্নে লুক্কায়িত কমিশন তত্ত্বটি জানতেন বলে হুকুম দিলেন, "বাপধনরা যখন দশ টাকার বই চার টাকায়

পাচ্ছো তখন আর লাভ করতে যেয়ো না, শিলিঙের দাম ১'০৫, এক পাঁচেই বেচো, কিনছো তো অষ্ট গণ্ডা পোহা দিয়ে—" তখন উল্লাসে নৃত্য করে উঠলুম। আহা হাহা হা! কী আনন্দ, কী আনন্দ!

সস্তায় বই পাবো বলে? মোটেই না। বই এমনিতে পাবো না, অমনিতেও পাবো না। ডিভ্যালুয়েশনের পূর্বেও পাইনি, এখনো পাবো না। শুনবেন, কেন? বছর দুই ধরে আমি ধন্না দিচ্ছি, কয়েকখানা ফরাসী ও জর্মন বইয়ের জন্য (হিটলারের জীবনীটি সম্পূর্ণ করবো বলে। যুদ্ধের কয়েকটা বছর বাদ দিলে ১৯৩৪ থেকে অবধি আমি এ-বিষয়ে বই কিনেছি—কয়েক হাজার টাকার)। সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে এক ঝাণ্ডু শ্রী—রায় (ইনি এম-এ, সুশিক্ষিত সুপণ্ডিত) আমাকে জানালেন, আমি যদি প্রত্যেক বইয়ের—অর্থাৎ একই বইয়ের—পাঁচখানা করে কপি কিনি (!), তবে বিলিতি বইয়ের বুকসেলার আমাকে আমার প্রার্থিত বই আনিয়ে দিতে পারবেন। তাঁর 'যুক্তি', একসঙ্গে পাঁচখানা বই না কিনলে বুকসেলার কমিশন পান না!

এ প্রস্তাবটি এমনই উন্মাদের বাতুলতা যে, কোনো পাঠকই এটা বিশ্বাস করবেন না। একই বইয়ের পাঁচখানা করে কপি নিয়ে আমি করবো কি? পঞ্চবীর-পতিগর্বিতা দ্রৌপদীর পাঁচটি স্বামীই যদি একই রবর স্ট্যাম্পের পঞ্চ-লাঞ্ছন, পাঁচ এ্যানকোর হতেন তবে তিনিও যে খুব সন্তুষ্ট হতেন না, অনুমান করা যায়। পাঁচ কেন, দুটো হলেই চিত্তির। আমার শোনা মতে এক রমণীর বিয়ে হয়, যমজ ভাইয়ের একজনের সঙ্গে। ভাশুর ভাদ্রবধূ উভয়ই সন্ত্রস্ত। শেষটায় সাবধানী ভাশুর আরম্ভ করলেন টিকিটিতে পুজোর সময় একটি জবা ফুল বেঁধে নিতে। শয্যায় পদ্মনাভকে স্মরণ না করা পর্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে চৈতন-প্রত্যন্তে হাত বুলিয়ে চেক অপ করে নিতেন, ফুলটি স্থানচ্যুত হয়নি তো! কাহিনীটি শুনে 'ইন্দ্রজিৎ' শিব্রামীয় একখান 'পান' ছেড়ে মন্তব্য করলেন, "টিকিতে ফুল! তাহলে স্বামী নিয়ে fooling বন্ধ হল।"

পাঁচখানা বই—একই বই (পাঁচখানা ভিন্ন ভিন্ন বই নয়, যে-ব্যবস্থাতে তো আমি হরবকৎ রাজী)—না কিনলে নাকি বাবুরা কমিশন পান না!

তবে আইস পাঠক, শুন্বন্তু বিশ্বে—

কারণ বিশ্বজোড়া ছড়িয়ে-পড়া একটি মাসিক থেকে (জুলাই, ১৯৬৮) বিজ্ঞাপনটি তুলে দিচ্ছি:

"Published in England at Rupees 105·00 you have the chance of buying them (the book is in six volumes)—under our NO-RISK money-back guarantee for a mere Rs. 72·00—a saving of 30% on the published price."

অস্য বিগলিতার্থ—সাদামাটা খদ্দের হিসাবেই তুমি ৩০% কমিশন পাবে; এবে শুধোই—অনাথা, অবলা বিলিতি বুকসেলাররা কত পাবেন? যে দিশী কোম্পানি বোম্বায়ে বসে, বিলেত থেকে প্রাগুক্ত বই আনিয়ে এ-দেশে বিক্রি করছেন, তিনি বুঝি আলা খয়রাতি হাসপাতাল খুলেছেন। তা হলে সাধু!

সাধু !! সাধু !!!

বিস্ময়ে অধম নির্বাক ! তবু অতি কষ্টে ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁ চিঁ করে বলছি, অবিশ্বাস্য, অবিশ্বাস্য, স্বপ্ন নু মায়া নু মতিভ্রম নু—আপনাকে শ্রীরায়ের তম্বী. মাফিক একই বইয়ের পঞ্চগব্য খেতে হবে না,—হল না—পাঁচ ঢ্যালা গোবর খেতে হবে না—একই বইয়ের পাঁচ কপি কিনতে হবে না।

এস্থলে আরেকটি নিবেদন—বিলিতি পুস্তক-বিক্রেতার বিরুদ্ধে আমার পুঞ্জীভূত বহুবিধ আক্রোশ আছে, গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে জমে উঠেছে ঘোরতর বিতৃষ্ণা এবং আমি তাই আদৌ নিরপেক্ষ নই, আমি প্রাইভেট এবং পাবলিক প্রসিকিউটর উভয়ই—দিশী পুস্তক বিক্রেতা ২৫% কমিশন পেয়ে, রোক্কা টাকা ঢেলে বই কিনে নিয়ে যায় আপন রিস্‌কে ; সে-বই বিক্রি না হলে তার পুরোপুরি সমুচিত লোকসান। প্রকাশক বই ফেরত নেবে না। বিলিতি বাবুরা অর্ডার নিয়ে, কোনো কোনো স্থলে পুরো দাম বায়না পকেটস্থ করে বইয়ের জন্য বিদেশে অর্ডার দেন। সিকি কানাকড়ির রিস্‌ক নেই। এ যে কত বড় ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্য সে জানে বিক্রেতা।

* * *

এবারে একটি ব্যক্তিগত নিবেদন ; একমাত্র তাঁদেরই উদ্দেশে—যাঁরা আমার অক্ষম লেখনীপ্রসূত মন্দ-ভালো পড়েন। তাঁরাই বলুন, এই যে প্রায় কুড়ি বৎসর ধরে আমি লিখছি, কখনো দলাদলিতে ঢুকেছি ? কখনো কাউকে আক্রমণ করেছি ? এমন কি আমি যখন আক্রান্ত হয়েছি, তখন আত্মপক্ষ সমর্থন করেছি ? হ্যাঁ, দু'একবার বাদ-প্রতিবাদে নেমেছি, যখন দেখেছি কোনো নিরীহ, বেকসুর, অখ্যাত লেখক আক্রান্ত হয়েছেন কোনো 'বুলি' দ্বারা, যিনি তাঁর নামের পিছনে জুড়ে দিয়েছেন তাঁর সবকটা ডিগ্রীর ফিরিস্তি যাতে করে সাধারণ পাঠক, প্রাগুক্ত নিরীহ লেখক এবং সম্পাদক স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং সর্বোপরি আতঙ্কিত হন—সেই নিরীহের পক্ষ সমর্থন করে। তখন সেই ফিরিস্তি-পুচ্ছধারী হামলা করেছেন আমার প্রতি। আমি তদ্দণ্ডেই নিরুদ্দেশ, কারণ, আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোনো প্রয়োজনবোধ করিনি, সেকথা পূর্বেই সবিনয় নিবেদন করেছি। ইতিমধ্যে সেই নিরীহ কিছুটা সান্ত্বনা পেল যে এ-দুনিয়ায় অন্তত আরেকটা মূর্খ আছে, যে তার মতে সায় দেয়।

কেন নামিনি ? আমার কলমে বিষ নেই ?

কিন্তু এবারে নামতে হল। ১৯২১ সালে যখন সর্বপ্রথম জর্মন ফরাসী পাঠ্যপুস্তক কিনতে গিয়েছি, তখন বিলিতি বই বিক্রি করতো শুধু বিলিতিরা, এবং তারা কান পাকড়কে নিয়েছে ঢালাও হিসেবে এক শিলিঙের জন্য এক টাকা। তখন বোধ হয় শিলিঙের দাম ছিল দশ আনা। এটা নিশ্চয়ই 'দুর্নীতি' নয়। সেই সবল বিপ্রসন্তান বলেছেন, 'এতদিন পর্যন্ত বই এর ব্যবসার মধ্যে দুর্নীতি ছিল না বললেই হয়।' মোক্ষম তত্ত্ব এবং তথ্য। কারণ সে যুগে, এবং এই পশ্চাদ্দিন তক সরকার পুস্তকের ব্যাপারে কোনো নিরিখ, প্রাইস-শেডুল বা কেনা-বেচার সময় এক শিলিঙের জন্য কত ভারতীয় মুদ্রা নেবে তার কোনো

আইন করে দেননি (controlled price)। কাজেই 'দুর্নীতির' কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু সাধারণ গেরস্ত এ নীতিটি মানবে কি? তুলনা দিয়ে শুধোই, আজ মাছের বাজারে আর কন্ট্রোল নেই; মাছওলা যদি কাদা চিংড়ির জন্য ১০ টাকা কিলো চায় তবে তো সেটা 'দুর্নীতি' নয়—মানবে গেরস্ত? দমদমা তো মানছে না। তাদের উপর এ-বৃদ্ধের আশীর্বাদ রইল।

তখন কলকাতায়, বিলিতি বইয়ের ব্যবসাতে প্রাক্তন 'সুনীতিতে' টেটম্বুর টাকার হরিলুট দেখে সে-বাজারে নাবলেন 'লেটিভ'রা।

কিন্তু সেই ১৯২১ থেকে -র ইতিহাস লিখতে হলে তো এক কিস্তিতে হবে না। তবে লিখব।[৪]

এ-সুবাদে সদাশয় সরকারকে আবার বলি তোমার রেশনের চাল অখাদ্য, তুমি ভেজাল কালোবাজার ঠেকাতে পারছো না, বিদেশ গিয়ে দু'মাসের জন্য রিসার্চ করে আমার দু'খানা বই শেষ করার জন্য কুল্যে দু হাজার মার্ক চেয়েছিলুম তুমি দাওনি, বিদেশী বই কেনার জন্য তুমি ক্রমাগত একসচেঞ্জ কমাচ্ছো (এবং যা দিচ্ছো সেও ছুতোর-কামারের টেকনিকাল বই আর পাঠ্য পুস্তকের জন্য—আমার কাজে লাগে না), ফলে মৃত্যুর পূর্বে আমাকে তুমি বিদেশী বইয়ের দুর্ভিক্ষ লাগিয়ে অন্নহীনবৎ মারছো—আমি রত্তিভর প্রতিবাদ করিনি, করছি না, করবোও না। কিন্তু তুমি যে সেই বিদেশী বইয়ের দাম কন্ট্রোল করছো, তার জন্য আমি তোমাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করি। শঙ্কর তোমাকে জয়যুক্ত করুন।

ভেবো না আমি স্বার্থপর। আমি বই পাবো না, এমনিতে না, অমনিতেও না। তুমি অঢেল হার্ড কারেন্সি ছেড়ে দিলেও না, না ছেড়ে দিলেও না। কেন, তার ইঙ্গিত বক্ষ্যমানে দিয়েছি। বারান্তরে সবিস্তর।

হায়! কোথায় সেই কুটির আর সামনের সুদীর্ঘ পপলার গাছ! সরকার না একবার বলেছিলেন, তাঁরা কালোবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন! পপলার গাছ অনেক ভালো। অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

হ্যাঁ, আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। যদ্যপি আমি বৃদ্ধ এবং শঙ্কর খেদ করেন, 'বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন' আমি কিন্তু 'তরুণে আরক্ত'। তাদের প্রতি এই সুবাদে একটি সদুপদেশ দিই; দুষ্টেরা তোমাদের বিদেশী ভাষা শেখার জন্য উপদেশ দেবে; সরল কনস্যুলেটগুলো তার জন্য ব্যবস্থা করবে এবং করছে।

---

৪ এস্থলে নিবেদন, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতা তথা দুর্বলতাবশত আমাকে মাঝে মাঝে পত্রিকায় 'পঞ্চতন্ত্র' বন্ধ করতে হয়। সাতিশয় শ্লাঘা সহকারে স্বীকার করছি তখন কোনো কোনো পাঠক সম্পাদকও আমার কাছে কৈফিয়ত চেয়ে কখনো মিঠে কখনো কড়া চিঠি লেখেন। (যে সব বিচক্ষণ জন আমার লেখা অপছন্দ করেন, তাদের সান্ত্বনার্থে বলি, I am a fool; এবং প্রবাদ আছে "One fool raiseth a hundred")। কাজেই পরের কিস্তির গ্যারাণ্টী দিতে পারি না বলে আমি সন্তপ্ত।

কিন্তু অমন কম্মটি কোরো না। বিদেশী বই না কিনতে পারলে বিদেশী ভাষা শিখে তোমার লাভ? এ যেন একগোচ্ছা চাবি নিয়ে বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছ—সিন্দুক কিন্তু একটাও নেই! এ যেন রশি নিয়ে হাওয়ার কোমর বাঁধার মত বন্ধ্যাগমন? এবং পারলে বাঙলাটাও শিখবে না। বলা তো যায় না, সে-বাজারেও কোনদিন কি হয় না হয়! হয়তো একই বই পাঁচ কপি কেনবার বায়নাক্কা বাঙলা পুস্তক বিক্রেতাও করবেন এবং—অথবা পাঁচ টাকার বইয়ের জন্য সাত টাকা চাইবেন। আগের থেকে সাবধান হওয়া বিচক্ষণের কর্ম। কেন, নিরক্ষরদের দিন কাটে না এদেশে? টিপসই দিয়ে চালাবে।

আমি ভালো করেই জানি, এ প্রবন্ধ ইংরিজিতে লিখলে ধুন্ধুমার লেগে যেত। কারণ, তাহলে হয়তো বিদেশী পুস্তক বিক্রেতাদের চাঁই, বোম্বাইবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত সদানন্দ বিটকল এটি পড়তেন (শুনেছি, বোম্বাইওয়ালারা নাকি এ বাবদে কলকাতাকে কল্কে দেয় না—বড় আনন্দ হল)। যাঁরা বাঙলা জানেন, তাঁরা যদি হুহুঙ্কার সচিৎকার 'যুদ্ধং দেহি' রব ছেড়ে আসরে নামেন তবে আমি প্রস্তুত।

শুধু দয়া করে পরের হাত দিয়ে তামাক খাবেন না।[৫]

সুপণ্ডিত বিপ্রসন্তানকে ডোবাবেন না। অবশ্য তাঁর যদি ব্যবসাতে শেয়ার থাকে তো আলাদা কথা। আমার বিশ্বাস তাঁর নেই।

আর সরকার যদি শেষটায় কণ্ট্রোল তুলে নেন—মাছের বেলা যা হয়েছে—তা হলে আম্মো শেয়ারের সন্ধানে বেরুব। টাকা নিয়ে কথা, মশাই। তার আবার সুনীতি দুর্নীতি কি?

ঝুলবই না হয় একদিন পপলারের মগডালে। ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইস্টের দুদিকে আরো কে যেন দুজন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল।

হাতে কমণ্ডলু, মাথায় তুর্কী টুপি

প্রবাসের লোক বড়ই অনাড়ম্বর। তাই স্যুটের বড়ফাট্টাই নিয়ে সেখানে মস্করা জমে ভালো।

স্যুট বাবদে একদা মহামুশকিলে পড়েছিলেন লর্ড কার্জন।

আমি জানি আমার নগণ্যতম—অর্থাৎ আমার প্রিয়তম পাঠকও প্রত্যয় যাবেন না যে, লর্ড কার্জনের মত বিলেতের খানদানী পরিবারের নিকষ্যি কুলীন

---

৫ যেসব ভারতীয় বিদেশী বইয়ের ব্যবসা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে একটি আপ্ত বাক্য প্রযোজ্য। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে এসেছেন এক সদ্য বিলেত-ফের্তা—ইভনিং জ্যাকেট, বয়েলড শার্ট পরে। অতি কষ্টে পিঁড়িতে বসতে বসতে বললেন, 'মুশকিল, বাঙলাটা ভুলিয়া গেইছি।' রবিঠাকুর নাকি শুনে বললেন, 'সত্যি মুশকিল হে ভড়, ইংরিজিটাও শিখলে না; বাঙলাটাও ভুলে গেলে!'

স্যুটের মত ডালভাত—সরি, আই মীন বেকন-আণ্ডা—নিয়ে গর্দিশে পড়তে পারেন। টাকাকড়ির অভাব এমনিতেই ছিল না, তদুপরি বিয়ে করেছিলেন মার্কিন কোটিপতির দুহিতা—নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়িতে আসার সময় (আবার ভুল করলুম, মার্কিনিংরেজ মেয়ে শাদি করে শ্বশুরবাড়ি যায় না, স্বামীকে সেখান থেকে ছোঁ মেরে শিকার করে ঘর বাঁধে অন্য মোকামে) পিতাকে উত্তমরূপে দোহন করেই এসেছিলেন। তাই স্বীকার করে নিচ্ছি গল্পটি অন্য কারো বাবদে হতে পারে এবং ডিটেলে ভুল থাকবে এস্তের। কিন্তু আমার নিপীড়িত কর্মক্লান্ত স্মৃতিশক্তি তবু যেন ক্ষীণ কণ্ঠে বার বার অভিমানভরে বলছে, এটা লর্ড কার্জন অব্ কিডলস্টনেরই কাহিনী—কার্জনের মুসলমান-প্রীতি দেখে অনেকেই বলতেন লর্ড কার্জন অব্ খিদিলস্তান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কীকে কচুকাটা করা হল সেভ্র্-এর সন্ধিচুক্তিতে (তখনই এ-দেশে খেলাফত আন্দোলনের দানা বাঁধে), কিন্তু ঐ সময় উদয় হল মুস্তফা কামাল পাশার, (পরে আতা তুরক) এবং তিনি সে সন্ধিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে খেদিয়ে বার করে দিলেন গ্রীকদের তুর্কী থেকে। তখন আবার নয়া করে সন্ধিপত্র তৈরী করতে হবে। ইউরোপময় হাহাকাররব উঠেছে, 'বর্বর' মুসলমান তুর্ক 'সুসভ্য' খ্রীষ্টান গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছে তার 'হক্কের' (বে-) দখলী জমি থেকে- নূতন সন্ধিতে এটা মানা চলবে না (ফ্যাতাঁক'প্লি নয়)। তাই নয়া সন্ধিটা যাতে চোস্ত-দুরস্ত হয় সেজন্য লজান বৈঠকে পাঠানো হল তামাম ইওরোপের কুটিলস্য কৌটিল্য মহামান্য কার্জনকে।

গণ্ডা দশেক স্যুটকেশ ট্রাঙ্ক নিয়ে নামলেন পরমপ্রতাপান্বিত কার্জন লজান শহরে। দুনিয়ার রিপোর্টার জড় হয়েছে তাঁর অবতরণভূমিতে।

মালপত্র যখন নামছে তখন দেখা গেল, সেই বাষট্টি ভাজা লগেজের সঙ্গে আলাদা করে অতি সন্তর্পণে নামানো হল একখানি ছোট্ট ফুট-স্টুল—লর্ড কার্জন মিটিং-মাটিং সর্বত্রই এই জিনিসটির উপর পা না রেখে দু'দণ্ড বসতে পারেন না। ঐটে দেখা মাত্রই এক ঠোঁট-কাটা ফরাসী সাংবাদিক টিপ্পনী কাটলে—"ভোয়ালা ল্য ত্রোন দ্য দামা!" (Voila le trone de Damas!) —"ঐ হেরো, দামাস্কাসের সিংহাসন"—অর্থাৎ নয়া মাহমুদ কার্জনের 'চলচৌকি, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন নগর (স্থান পরিবর্তন না করে একটানা এক জায়গায় আছে) দমস্কের সমতুল্য।...তা সে যাক্ গে, এটা ঈষৎ অবান্তর।

তুর্কীর পক্ষ থেকে এসেছেন জেনারেল ইসমেৎ পাশা (পরে প্রেসিডেন্ট ইনেনু)।

জোর কনফারেন্স, জোরালো উপ-কনফারেন্স, সাবকমিটি আরো কত কী। কার্জন বজ্রনির্ঘোষে—থানডারিং—লেকচার ঝাড়লেন টেবিল থাবড়ে। ইসমেৎ দিব্য ইংরিজি বোঝেন,—ভান করলেন বোঝেন না, তদুপরি তিনি কানে খাটো। থানডারিং লেকচারের প্রতিটি তাঁর কানের কাছে অনুবাদ করে দিতে হয়—গণ্ডার ততক্ষণে ঠাণ্ডা। গরমাগরম উত্তর দিতে হল। সেপাই ইসমেৎ

পারবেন কেন অরেটর কার্জনের সঙ্গে ? তবু চললো লড়াই।[১]

সন্ধ্যেবেলা এঁরা সবাই একটুখানি আমোদ-আহ্লাদ করে নিতেন। আজ এখানে ডিনার, কাল সেখানে ডান্স, পরশু জীনিভা হ্রদে নৈশভ্রমণ।

এক সন্ধ্যায় কার্জনের ভ্যালে তাঁকে যথারীতি অত্যুত্তম ডিনার স্যুট পরিয়ে দিয়ে, সাদা বো-টি নিখুঁত বেধে দিলে পর সদাশয় লর্ড বললেন, "আজ আর তুমি আমার জন্যে জেগে থেকো না ; ফিরতে অনেক রাত হবে। আমি কোনো রকমে ম্যানেজ করে নেবো'খন।" এ যে কত বিরাট সদাশয়তা সেটা সাধারণ পাঠক বুঝতে পারবেন না। এসব লর্ডরা ভ্যালে-র সাহায্য বিনা জামা-কাপড় পরতে তো পারেনই না—আর বো বাঁধার বেলা তো ৯৯% স্রেফ ঘায়েল—ছাড়তে পর্যন্ত পারেন না।

ভ্যালেটি ছিল কার্জনের চেয়েও খানদানী—অবশ্য তার আপন ভ্যালে সম্প্রদায়ে। বো বাঁধাতে তার ছিল বিশ্ব রেকর্ড। ১১ সেকেন্ডে সে যা বো বাঁধতো, মনে হত, একদম মেশিনে তৈরী, রেডিমেড বো। অন্য লোক এ স্থলে সে সন্দেহ এড়াবার জন্য বো-টি একটু ট্যারচা করে নেয়। খানদানী কার্জনের বেলা অবশ্য এ সন্দেহ করতে যাবে কে ? বহু বৎসর পরে হিটলারের ভ্যালে লিঙে এর কাছাকাছি অর্থাৎ ১২ সেকেন্ডে আসতে পেরেছিলেন। লিঙে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, হিটলার প্রতিবার চোখ বন্ধ করে এক, দুই গুনতেন এবং লিঙের বো বাঁধা হলে সোল্লাসে বলতেন, "লিঙে, এবার কেল্লা ফতে করেছ —মাত্র বারো সেকেন্ড !"···উপস্থিত এ বো অনুচ্ছেদ থাক।

কার্জন তো গেলেন ব্যানকুয়েটে wined and dined হতে—সঙ্গে 'ত্রোন দ্য দামা' বা 'দিমিশ্কের ময়ূর সিংহাসন বগলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে ইংরেজী এন্সাইক্লপীডিয়া, ফরাসী লিত্রে, জর্মন ব্রকহাউস—চরম পরিতাপের বিষয়—সবাই নীরব। বিবেচনা করি নিমন্ত্রণ-কর্তাই সেটি সাপ্লাই করেছিলেন। কিন্তু সে রাত্রে কিসে যেন কি হয়ে গেল, কার্জন অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন এবং রাত দশটা-এগারোটার মধ্যেই হোটেলে ফিরে এলেন।

হোটেলে ঢুকতেই দেখেন বিরাট হল জুড়ে লেগেছে ধুন্ধুমার নৃত্য—সে রাত্রে সে হোটেলে ছিল গ্যালা ড্যান্স। তারই এক পাশ দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে উঠতে হবে লিফ্টে। যেতে যেতে হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন—কে ঐ লোকটি ? বড্ডই যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। উৎকৃষ্টতম স্টাইলের নিখুঁত ফুল ডিনার-ড্রেস পরে সাতিশয় রুচিসম্মত পদ্ধতিতে নাচছে একটি সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া যুবতীর সঙ্গে।

সর্বনাশ ! ও গড ! ! এ যে তাঁরই ভ্যালে !! নাচছে তাঁরই ঈভনিং

১ কার্জন-ইসমেতের দ্বন্দ্বযুদ্ধে ইসমেতের শেষ পর্যন্ত নিরঙ্কুশ জয় হলে পর সাংবাদিকরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে আসেন। অতিশয় সবিনয় তিনি নিবেদন করেন, "না, না, আমার আর কী কীর্তি ! আমি কালা—আল্লাকে অসংখ্য শোকরীয়া ধন্যবাদ।"

ড্রেস পরে।

আহা, সদয় সহৃদয় পাঠক, তুমিও আমার সঙ্গে সবেদন কণ্ঠ যোগ দিয়ে বলবে, আহা, বেচারী ভেবেছিল কত্তার ফিরতে যখন দেরি হবে তখন সে-ই বা দু'চক্কর নেচে নেয় না কেন?

কিন্তু এ যে ডবল মহাপাপ—খাস বিলেতে নিশ্চয়ই, এ স্থলে ডবল ফাঁসির চেয়েও কড়া আইন আছে।

তুলনা দিয়ে কি প্রকারে বোঝাই? কোনো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ যদি হঠাৎ কোন এক পরিচিতের বাড়িতে গিয়ে দেখেন তাঁরই এক চেনা চাঁড়াল তাঁরই গরদ পরে বামুন সেজে পুজোর ঘণ্টা বাজিয়ে ধুমধাম লাগিয়েছে আর বউ-ঝিরা তাকে ঢিপঢিপ করে পেন্নাম করছে তা হলে তাঁর মনের অবস্থাটা কোন্ রস দিয়ে বর্ণাতে হয়?

* * *

কার্জন হুকুম জারি করলেন, ব্যাটাকে যেন অতি ভোরের ট্রেনে চাপিয়ে দেওয়া হয়—নাক বরাবর লণ্ডন। একটা ঠিকে ভ্যালে যেন তদ্দণ্ডেই যোগাড় করা হয়।

এখানেই শেষ? আদৌ না। এ তো সবে শুরু।

পরদিন সকালে কার্জন খাটে শুয়ে শুয়ে দেখেন, ঠিকে ভ্যালে ওয়ার্ডরোবের দরজা খুলে তার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় চুলকোচ্ছে। অচেনা, নয়া ঠিকে—কার্জনও দরদী-দিল আদমী শুধোলেন, "কি হল?"

কাঁচুমাচু হয়ে বললে, "হুজুর, সঠিক ঠাহর হচ্ছে না। পাতলুনগুলো গেল কোথায়!"

লম্ফ মেরে কার্জন গিয়ে দেখেন, সত্যিই তো পাতলুনগুলো গেল কোথায়? আছে বটে অনেকগুলো, কিন্তু স্ট্রাইপ্‌ট্ অর্থাৎ ডোরাকাটা পাতলুনগুলো কোথায়? সেগুলোর যে এক জোড়াও নেই। আর সেই পরেই তো তিনি যাবেন দুপুরের কনফারেন্সে। খাঁটি ফুল মর্নিং ড্রেস। সামনের দিকে ট্যারচা করে কাটা হাঁটুঝুল কোট, সেই কাপড়েরই তৈরী ম্যাচ করা কিংবা ফেনসি ওয়াস-কিট—এই ওয়াসকিটেই সাদা পাইপিং লাগাবেন কিনা তাই নিয়ে জীবনমরণ সমস্যায় পড়েছিলেন আমার সুবন্ধু স্যার সিরিল হবজন-জবসন ফর্বস-রবার্টসন লণ্ডনে—এবং তাঁর সঙ্গে সাদায় কালোয়, কিংবা ঈষৎ ধূসর রঙের ডোরাকাটা স্ট্রাইপ্‌ট্ ট্রাউজারজ—তার তো কোন চিহ্নই নেই।

সর্বনাশ! এখন উপায়?

গাঁইয়া পাঠক—যতই ধানাইপানাই করি না কেন, আম্মো এখনো তাই—তুমি বলবে, কেন অন্য পাতলুন পরে গেলে হয় না? নিশ্চয়ই হয়। যান না আপনি নিচে কম্পিন, উপরে দুশালা-শাল, মাথায় তুর্কী টুপি, হাতে কমণ্ডলু নিয়ে আধুনিকদের ব্যুফে লানচ পার্টিতে টালিউডে—কে বারণ করছে? সে কথা থাক।

কিন্তু ব্যাটা ভ্যালের চুরি করারই যদি মতলব ছিল তবে কোর্ট-ওয়েসকিট

ম্যাচিং-টাই-কলার পেটেন্ট-লেদার জুতো মায় স্প্যাটস এগুলো ফেলে গেল কেন? এস্তেক ডাইমণ্ড পিনও যথাস্থানে রয়েছে। উঁহু, তা নয়। নিশ্চয়ই সুধমাত্র তাঁকে রাম-ইডিয়েট বানাবার জন্য।

ঝাড়ো টেলিগ্রাফ। পাকড়ো রাসকেলকো কঁহী ভী হোয় টেরেন্ মে—চাহে প্যারিস, চাহে লনদন!

সে না-হয় হল। কার্জনের রোআবে বাঘের দুধের অর্ডার আকছারই যায় টেলিগ্রামে।

কিন্তু স্ট্রাইপ্‌ট্ ট্রাউজারজ তো আর বাঘের দুধ নয়, বাঘিনীর দুধও নয়। আপাতক সে বস্তু মেলে কোথা? ওদিকে প্লেনারি কনফারেন্সের সময় যে ঘনিয়ে আসছে। হে ভগবান! প্রতি মুহূর্তের এ কী গন্ধযন্ত্রণা!

* * *

এমন সময় করিডোরে শতকণ্ঠে বাইশটে ভাষায় চিৎকার হই-হুল্লোড়।

পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে! কোথায়? কোথায়?

যে মেয়েটি ভ্যালে, চাকরবাকরদের কুটুরিগুলোতে তাদের বিছানাপত্র ঝেড়ে-ঝুড়ে দেয়, সে কার্জনের ভ্যালের তোশক ঝাড়তে গিয়ে দেখে তার নিচে পরিপাটিরূপে টান-টান করে সাজানো চার জোড়া স্ট্রাইপ্‌ট্ পাতলুন। আমরা, গরীব দুঃখীরা যাদের বাধ্য হয়ে মাঝেমধ্যে স্যুট পরতে হয়, তারা জানি, পাতলুনের ক্রীজ দুরস্ত করার জন্য এর চেয়ে মহত্তর মুষ্টিযোগ নেই।

কিন্তু সর্বজ্ঞ কার্জনের সেদিন নবীন জ্ঞানসঞ্চয় হল॥[২]

ভূতের মুখে রাম নাম

যে-কোনো ভদ্রসন্তান স্তম্ভিত হবে। প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঝাড়া দশটি মিনিট গা-গা রব ছাড়বে। অপেক্ষাকৃত রোগাপটকা ভিরমি যাবে। খবরটা এমনই অবিশ্বাস্য।

মানুষের তৈরী বেঙ্গল ফ্যামিনের সময় এক অজানা কবি রচেন,

দেখো না আজব হ্যায়,
এ হেন ভূতের পায়
স্বস্তিবাচন
করা নিবেদন।
এ যেন প্রেতের গায়
উম্‌দা উম্‌দা আতর মাখানো ভুরভুরে খুশবায়।
এ যেন দুখিনী মায়
Amerya র কাছে শিশুটির তরে
ভিক্ষার চাল চায়।

২ কাহিনীটি যিনি আমাকে সর্বপ্রথম বলেন তাঁর মতে লিটন স্ট্রেচিই নাকি ইটি সঙ্কলের পয়লা লিপিবদ্ধ করেন। আমি ভিন্ন ভিন্ন কীর্তন শুনেছি।

খবরটা এর চেয়েও বিৎকুটে।

ফ্রান্সের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফ্লোবেরের[১] বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস মাদাম বভারি ফ্রান্সে এখন থেকে ছাপা যাবে, বেচা যাবে বটে কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়া তথা বইয়ের দোকানে পেটি রেখে খদ্দের আকৃষ্ট করা বেআইনি!

কেন?

বইখানা এ্যামরাল, ইমরাল (immoral) অর্থাৎ দুর্নীতিপূর্ণ, এক কথায় অশ্লীল। বইখানা লিখতে ফ্লোবেরের লেগেছিল পূর্ণ চারটি বৎসর—কিঞ্চিৎ অধিক—১৮৫২ থেকে ১৮৫৬। প্লটটি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন তার পূর্বে তিনটি বৎসর। এই ছোট বইখানা লিখতে ফ্লোবারের এতখানি সময় লাগলো কেন? তার প্রথম কারণ, তিনি ছিলেন মাত্রাধিক পিটাপিটে পারফেক্শনিস্ট। বাস্তব জগতের পরিবেশ যেমন তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন, (অন্য উপন্যাসে একটি রোমান ভোজের নিখুঁত বর্ণনা দেবার জন্য তিনি নাকি প্রাচীন ক্ল্যাসিক্স ঘাঁটেন—কেউ বলে ছ'মাস, কেউ বলে দু'বছর)[২] ঠিক তেমনি তাঁর স্বপ্নলোক কাগজকলমে মৃন্ময় করার সময় তিনি চাইতেন সেটা যেন বাস্তবের চেয়েও বাস্তব হয়, এবং সর্বশেষ প্রত্যেকটি বাক্য, প্রত্যেকটি সেন্টেন্স যতক্ষণ না তার নিখুঁত ভারসাম্য পায়, তার প্রত্যেকটি শব্দ অন্য শব্দগুলোর সঙ্গে মিলে গিয়ে যতক্ষণ না উন্নয়নাতীত হয়, নিটোল সুডোল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পরের সেন্টেন্সে যেতেন না, কিংবা বলবো, যেতে পারতেন না, যেন আগের সেন্টেন্স্ তাঁকে জোর করে আঁকড়ে ধরে বলছে, 'আমাকে পরিপূর্ণতায় পেঁছে দিয়ে তবে তুমি এগোও।'

এমন দিন বহুবার গেছে, যে দিন ফ্লোবের মাত্র একটি ছত্রের বেশী লিখতে পারেননি! এটা কিংবদন্তী নয়। নইলে চারশ' পাতার বই লিখতে চারটি বৎসর লাগবার কথা নয়। এবং স্মরণ রাখা উচিত, 'ফ্লোবের যখন কোনো বই লিখতে আরম্ভ করতেন, তখন সেইটে নিয়েই অষ্টপ্রহর মেতে থাকতেন। পেটের ধান্দা তাঁর ছিল না, তাঁর দেখভাল করার জন্য লোকের অভাব ছিল না, তিনি চিরকুমার, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে লেখার টেবিলে বসতেন, বাড়ি ছেড়ে পারতপক্ষে রাস্তায় পর্যন্ত নামতেন না, অথচ চল্লিশ বৎসর সাধনার ফলস্বরূপ তিনি লিখেছেন মাত্র খান-আষ্টেক বই।

---

১ উচ্চারণ ফ্লো, তার পর ব্যার। ফ্লোব্যার লিখলে সাধারণ বাঙালী ফ্লোব্ব্যার পড়ে বসতে পারে; সেটা হবে ভুল। ঐটে বাঁচাবার জন্য পূর্বসূরিগণ লিখতেন ফ্লোবেয়ার বা ফ্লোবের।

২ এদেশের উপন্যাসে প্রায়ই পড়ি, বিলিতি বড়সাহেব বা বিলেতফের্তা ন'সিকে এটিকেট-দুরস্ত সাহেব 'জুতো মস্ মস্ করে চলে গেলেন।' জুতো জোড়া মস্ মস্ করলে এদেশের ট্যাঁশসাহেবও সেটা ভেজাছালার উপর রাতভর পেতে রাখে। সামান্যতম মস্ করলেও বন্ধুজন মস্করা করে বলে, 'দাম দাওনি বুঝি! বেচারী যে চিৎকার করে করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।'

মোটামুটি ভালো বই হলেই আমরা সেটাকে বলি 'রসোত্তীর্ণ', খেয়াল না করেই বলি 'পীস অব আর্ট', কিন্তু সত্য সত্য যদি কোনো একখানি বইকে শব্দার্থে পীস অব আর্ট বলতে হয় তবে সে মাদাম বভারি। এর সর্বোৎকৃষ্ট পরিচিতি লিখেছেন ফ্লোবেরের পুত্রপ্রতিম প্রিয়শিষ্য মোপাসাঁ। তাঁর ভুবন-বিখ্যাত 'নেকলেস' গল্পে পাঠক ফ্লোবেরের প্রভাব দেখতে পাবেন। বস্তুত বভারি বেরুবার পর সে-যুগের ফরাসী কৃতী লেখকদের বড় কেউই এর প্রভাব থেকে নিষ্কৃতি পাননি। একমাত্র এরকম বইকেই পীস অব আর্ট বলা চলে। সিপাহী বিদ্রোহের বছরে এই 'কাব্য' প্রকাশিত হয়—আজো নবীন লেখক নবীন পাঠক এ-পুস্তকের শরণ নেন।

মোপাসাঁ তাঁর গুরু সম্বন্ধে দু'টি প্রবন্ধ লিখেছেন। আজো যাঁরা ফ্লোবের নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা এ দু'টি প্রবন্ধের বরাত না দিয়ে পারেন না।[৩]

---

৩ প্রবন্ধ দুটি বেরোয় মোপাসাঁর চিঠি-চাপাটির (করেস্পঁদাস্) সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারে। এ-পুস্তকে পাঠক পাবেন মোপাসাঁর অন্যান্য রচনা সংগ্রহ। গল্প-লেখক মোপাসাঁর খ্যাতি 'ব্যাল্ ল্যাংরিস্ং' ('রম্যরচনা' তথা প্রবন্ধ-লেখক) মোপাসাঁকে এমনই ম্লান করে দিয়েছে যে, ফ্রান্সের বাইরে কেউ মোপাসাঁর এসব লেখার সন্ধান বড় একটা করে না। এ পুস্তকে পাঠক পাবেন, বালজাক, জোলা, তুর্গেনিফ (একাধিক), সুইনবার্ন এবং অন্যান্য সম্বন্ধে প্রামাণিক প্রবন্ধ। এবং সব চেয়ে কৌতূহল-উদ্দীপক—পাঠক এতে পাবেন, মোপাসাঁ কোন্ আকস্মিক যোগাযোগের ফলে কথাসাহিত্যে প্রবেশ করেন। জোলার গ্রামের বাড়িতে একদিন গল্প বলার আর্ট, এবং সে আর্টের রাজা তুর্গেনিফ ও মেরিমে (চারু বাঁড়ুয্যে এঁর বই 'কলবাঁ' 'আগুনের ফুলকি' নাম দিয়ে প্রায় ৪৫ বৎসর হল অনুবাদ করেন,) সম্বন্ধে কথা উঠলে জোলা প্রস্তাব করেন, সে-মজলিশের সবাইকে একটি একটি করে গল্প বলতে হবে। গল্প বলেন জোলা, হ্যোসমান্স সেআর, এনিক এবং সব চেয়ে বড় কথা মোপাসাঁ স্বয়ং। সেই তাঁর প্রথম গল্প। সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় অন্যান্য গল্প-লেখকদের রচনাবলী সংগ্রহের সঙ্গে। যেহেতু জোলার বাড়ি মেদাঁতে গল্পগুলো বলা হয়, চয়নিকার নাম হয় 'মেদাঁর সোয়ারে'। সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি মোপাসাঁ ফ্রান্সে বিখ্যাত হয়ে যান। ফ্লোবের তখনো বেঁচে। আন্তরিক অভিনন্দন ও অকুণ্ঠ প্রশংসা জানালেন তরুণ লেখককে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, জোলার চাপে না পড়লে কি হত! কারণ এর পূর্বে মোপাসাঁ নিজেই জানতেন না, কথাসাহিত্যে তিনি কী অভূতপূর্ব সৃজনীশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মোপাসাঁর চিঠি-চাপাটি ও প্রবন্ধাবলীর পরিচয় আমি অন্যত্র অতি সংক্ষেপে দিয়েছি। এ বাবদে দু'টি সংকলন আছে এবং যেহেতু এ-দুটির ইংরিজি অনুবাদ আমার চোখে পড়েনি, তাই পুনরুল্লেখ প্রয়োজন বোধ করি:

* 1. Rene Dumesnil, chroniques, Etudes, Correspondance de Guy de Maupassant, publiees pour la premiere fois

এ ছাড়াও তিনি কাগজে-কলমে ফ্লোবেরের মৃত্যুর পর তাঁর হয়ে একাধিক লড়াই দিয়েছেন। এসব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আইস, পাঠক, প্যারিস যাই।

কিন্তু প্যারিসের বর্ণনা দেবার মত কোথায় আমার বীর্যবল, কীই বা অধিকার! তাই আমার যেটুকু দরকার সেটুকু নিবেদন করি।

সেই ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে প্যারিস যত না কাজ করেছে তার চেয়ে বেশী চেঁচিয়ে দুনিয়া ফাটিয়েছে, লিবেরতে (liberty), লিবেরতে, তুজুর (চিরন্তন) লা লিবেরতে। সে চিৎকারে মোহাচ্ছন্ন হয়েছেন গ্যেটে থেকে শুরু করে মিশর-ইণ্ডিয়া পেরিয়ে চীন দেশের সুন ইয়াট সেন পর্যন্ত। ক্রমে ক্রমে তার বিকৃত রূপ দেখা দিল তার সামাজিক জীবনে তার আমোদ-আহ্লাদে। পুরীর নুলিয়ারা যে বহ্বাড়ম্বর পরিপূর্ণ বহ্বাভরণ পরিধান করে সমুদ্রে নামে, কিংবা আমাদের জেলেরা মাছ ধরার সময়, সেই পরে মেয়েরা প্যারিসে নৃত্যাদি আরম্ভ করলেন। এবং শুধু যে আপন-ভোলা নটরাজের জটার বাঁধন খুলে যায় তাই নয়, দিব্য সচেতন অবস্থায়—যাক্ গে, পূর্বেই বলেছি, যতখানি 'জ্ঞাতাস্বাদো বিপুল-জঘনাং' হলে পর প্যারিস বর্ণনের শাস্ত্রাধিকার জন্মে, আমার ততখানি নেই।

এই বাতাবরণের মাঝখানে ফ্লোবের এতই সংযত সমাহিত যে, আজকের দিনের 'মডার্ন'রা তাঁকে রীতিমত চেঁচিয়ে গালাগাল দেবেন, কাপ্রুস তোমার সাহস নেই (কাপুরুষ! তোমার সাহস নেই—পাঠক 'সামবাজারের সসীবাবুর' মত 'স'-গুলো উচ্চারণ করবেন!)।

বইখানা পত্রিকায় কিস্তিতে কিস্তিতে বেরিয়ে পুস্তকাকারে ছাপা হবে এমন সময় ঘটলো বিপর্যয়।

আল্লায় মালুম কোন্ শুকদেব ঠাকুরের সুপরামর্শে—তখনো তো দ্য গল জন্মান নি—ফরাসী সরকার লাগিয়ে দিলেন ফ্লোবেরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। ফরাসী সরকারের শিক্ষা বিভাগ—মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইন্‌সট্রাকশন, ওই সময় থেকেই বোধ হয় প্যারিসের যদো-মেধো ওর নাম দেয়, মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ডিস্‌ট্রাক্‌শন।

ফ্লোবেরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি বভারি পুস্তকের মাধ্যমে দেশের দশের নীতিধর্মের সর্বনাশ করছেন! সোজা বাংলায় তাঁর বইখানা অশ্লীল, কদর্য!!

'অশ্লীল' শব্দটা এ-কথা শুনে হেসে উঠলো না তো?

সেই যে-রকম ঢাকাতে সোয়ারি কম ভাড়া হাঁকলে রসিক কুট্টি কোচম্যান ফিসফিস করে বলে, 'আস্তে কন, কত্তা, ঘোড়ায় হাসবো!'

এবং কার মুখে এই অভিযোগ?

---

avec de nombreux documents inedits, Gruend, Paris, 1938.

2. Artine Artinian & Edouard Maynial, Correspondance inedite de Guy de Maupassant Wapler, Paris, 1951.

প্যারিসের মুখে ! তাজ্জব, তাজ্জব ! গজব, গজব !!
প্যারিসিনীর পরনে তখন কি ? A la নুলিয়া নয় তো ?
তাই বলছিলুম,

এ যেন প্রেতের গায়
শানেল আর উ (h) বিগাঁ মাখানো
ভুরভুরে খুশবায় !

কিংবা রাষ্ট্রভাষায় ঃ

আরে তেরা লড়কেকা
আজব তরেহ্ কা খেল
ছুচ্ছুন্দর কা সিরপর
চামেলী কা তেল !

("তোর ছেলেটার আজব কীর্তি ! ছুঁচোর গায়ে মাখিয়েছে চামেলির তেল।" কি রকম চামেলি ? 'বাদল শেষে করুণ হেসে, যেন চামেলি কলিয়াঁ !')

পাঠক ভাবছেন, আমি রগড় দেখে, the utter absurdity of it ভূতের মুখে রামনাম শুনে বে-এক্তেয়ার হয়ে উচ্ছ্বসিত গঞ্জিকা বিলাস করছি ?

আদৌ না। আর করলেও আমি আছি সৎসঙ্গে, ইন গুড কামপনি !

মোপাসাঁ মোকদ্দমার সাতাশ বৎসর পরে মস্করা করে বলেন, "সরকারী পক্ষের উকীল যে-ভাবে ফ্লোবেরকে আক্রমণ করে বজ্রনির্ঘোষ 'বস্তিমে' ঝাড়েন, একমাত্র সেই কারণেই তাঁর নাম মার্কা-মারা (marque) হয়ে থাকবে। কিন্তু প্রশ্ন, উকিল মসিয়োটি মোকদ্দমা আরম্ভের প্রাক্কালে তাঁর নাম — Pinard-টি—বদলালেন না কেন ?"[৪]

পিনার এক রকম মদ।

মোপাসাঁর বক্তব্য ঃ বস্তিমে ঝাড়বি ঝাড়। হামলা করবি, কর। কিন্তু দোহাই ধর্মের, সাদা চোখে কর। পিনার—হুঃ—শুঁড়ি এলেন শ্লীলতা বাঁচাতে। এ যে দুঃশাসন এল নুলিয়াকে জোশ্ব পরাতে।

এর পরও মোপাসাঁ আরেকখানা সরেস মাল ছেড়েছেন। কিন্তু হায়, সেটা তুলে দিলে লালবাজার চোখ লাল করেই ক্ষান্ত হবে না !! দে উইল বি আফটার মাই রেড্ ব্লাড !!!

---

৪ ফ্লোবেরের মৃত্যুর পর জর্জ সান্ড্ (George Sand)-কে লিখিত তাঁর পত্রাবলীর ভূমিকারূপে মোপাসাঁ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন ; উদ্ধৃতিটি সেই প্রবন্ধ থেকে।

সান্ড্, সাঁড, সাঁদ—এ তিনটেই শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু দিল্লীবাসীর সদম্ভ-প্রদত্ত ফতোয়া যে ইটি স্যান্ড্—কোথাও নেই। সাদামাটা "a" হরফটির উচ্চারণ একমাত্র ইংরিজী ছাড়া কোনো ভাষাতেই এ্যা হয় না। অবশ্য ai, au, ae বা a-র উপর দুটি ফুটকি থাকলে (উমলাউট) ভিন্ন কথা।

"শিলা জলে ভাসি যায়/বানরে সঙ্গীত গায়"

স্বাধীনতা বলুন, উচ্ছৃংখলতা নাম দিন, প্যারিস একটি সৎ গুণের জন্য বিখ্যাত। সে চিরকালই স্বাধীন চিন্তা, তথা পীড়িত বিদ্রোহী জনকে আপন নগরে আশ্রয় দিয়েছে। জর্মন কবি হাইনের প্রগতিশীল মতবাদ কাইজার সহ্য করতে পারেননি বলে তাঁকে আশ্রয় নিতে হল প্যারিসে—এবং জীবনের বেশীর ভাগই তিনি কাটান সেখানে। আর এই বছর পঞ্চাশ পূর্বেই বীর সাবরকরকে ফ্রান্সভূমি থেকে ইংরেজ ধরে নিয়ে যায় বলে ফরাসী সরকার তারস্বরে প্রতিবাদ জানায়।[১]

এ শতকে আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় আরামদায়ক তত্ত্ব-কথা ছিল এই যে, যেসব কূপমণ্ডুক দেশ কোনো বিশেষ ধরণের বই ছাপতে দিত না, সেগুলো ছাপা হত প্যারিসে। তার কিছুটা পাচার হত—যেমন ধরুন লেডি চ্যাটার্লি—ইংলণ্ড, আমেরিকা, ভারত ইত্যাদিতে, আর বাদবাকিটা ফ্রান্সাগত ইংরিজী পড়নেওয়ালা টুরিস্ট গিলত গোগ্রাসে। তখনকার দিনে রোক্কা একটি টাকাতে উত্তম উত্তম গ্রন্থ পাওয়া যেত। এদেশে যারা বিলিতী বই বিক্রী করে, তারা চিরকালই ছিল শাইলকের বাবার বাবা (আশা করি শাইলক জীবিত থাকলে অপরাধ নেবেন না)। 'ওয়ান সিনার রেইজেৎ এ হানড্রেড'—'এক পাপীকে দেখে এক'শ জন পাপ পথে যায়' আমিও তাই তাদেরই অনুকরণে, যত পারি এসব বই পাচার করে দেশে নিয়ে আসতুম। আমার পক্ষে প্রক্রিয়াটি কঠিন ছিল না। আমি তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র। কস্টম কর্মচারী সে-যুগে সচরাচর হত গোয়ানীজ ক্যাথলিক। আমি ট্রাঙ্কের সর্বোচ্চ স্তরে রাখতুম একখানা ক্যাথলিক প্রেয়ার বুক এবং একটি মনোহর রোজারি—অর্থাৎ ক্যাথলিক জপ-মালা। ম্লেচ্ছ মুসলমানদের খৃষ্টপ্রীতি দেখে ক্যাথলিক কর্মচারী বে-এক্তেয়ার।

সেই প্যারিস মহানগরীতে শত বৎসর পূর্বে ডকে উঠলেন ফ্লোবের—মাদাম বোভারি বগলমে*। অভিযোগ! তিনি "ইমরাল" (দুর্নীতি প্রচারকারী), অশ্লীল কেতাব লিখেছেন। সরকার পক্ষের উকীল গাঁটের ছ পণ খেয়ে যে বক্তৃতা ঝাড়লেন, সেটা শুনে সকলেরই মনে হল, গাঁয়ের পাদ্রীকে বউবাচ্চাসহ খুন করে ঐ গাঁয়ের যে একটিমাত্র কুয়ো আছে, তাতে সে লাশগুলো ফেলে

---

১ সাবরকরকে যখন বন্দী করে ইংরেজ ভারতে পাঠাচ্ছে, তখন তিনি ফরাসী বন্দরে পালিয়ে গিয়ে ডাঙায় উঠেন। ইংরেজ সেলার তাড়া করলে সাবরকর ফরাসী পুলিসম্যানকে বোঝাতে পারলেন না যে, তিনি রাজনৈতিক বন্দী—ফরাসী ভাষা জানতেন না বলে। সাধারণ খুনী আসামী ভেবে পুলিস তাকে ইংরেজের হাতে সমর্পণ করে। পরে ইংরেজ বলে, ফরাসী পুলিস ফরাসী সরকারের প্রতিভূরূপে সাবরকরকে ইংরেজের হাতে যখন সমর্পণ করেছে, তখন পরে ফরাসী সরকারের আপত্তি করার কোনো হেতু নেই।...এ সব কিন্তু আমার শোনা কথা।

দিয়ে জল বিষিয়ে দিলেও বুঝি ফ্লোবেরের অপরাধ এর তুলনায় সোনার পাথর বাটিতে আকাশকুসুম সাজানোর মত হত।

মোপাসাঁ লিখলেন, "ধন্য ধন্য এডভোকেট জেনারেল পিনার! (শুঁড়ি মশাই—অবশ্য তিনি মীন করেছেন "শুঁড়ির শালা চামার!")। ফ্রান্সের ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে রইলে!"

ফ্লোবের খালাস পেয়েছিলেন। আদালতের উপর জনমত হয়তো প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ শুধু ফ্রান্স নয়, ফ্রান্সের বাইরেও তখন ঐ বই এমনই চাঞ্চল্য জাগিয়েছে যে, তার পূর্বে বা পরে এমনতরো কবার হয়েছে সেটা আঙুলে গুনে বলা চলে। গুণীরা বললেন, "যা বলো, যা কও, বইখানা নিঃসন্দেহে পীস অব আর্ট, শেফ দ্যভ্র্, মাস্টারপীস।"

মোপাসাঁ অতিশয় সবিনয় লিখলেন, "সাহিত্যে নীতি? সে আবার কী চীজ? বেরুলুম সেই চীজের সন্ধানে যাঁরা মহামানব, যাঁরা সাহিত্যাচার্য তাঁদের কাছে। আরিস্তোফানেস, তেরেনৎস, প্লাউট্স, আপুলেয়ুস, ওভিড, ভের্গিল, শেকসপীয়ার, রাবলে, বক্কাচ্চো, লা ফঁতেন, স্যাঁতামাঁ, ভলতের, জ্যাঁ জ্যাঁক রুসো, দিদেরো, মিরবো, গোতিয়ে, ম্যুসে[২] ইত্যাদি ইত্যাদি—একটিমাত্র উদাহরণও পেলুম না এঁদের কাছে।"

ফিরিস্তিটা উচ্চাঙ্গের সন্দেহ নেই। গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়, ইংরেজ এবং সর্বোপরি ফরাসী—কারণ মোপাসাঁ স্বয়ং ফরাসিস—মহারথীরা এতে রয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, চীনা কোনো মহারথীর নাম তিনি করেননি। আরব্য রজনী পর্যন্ত না। কিন্তু আমার আশ্চর্য বোধ হয়, ওল্ড টেস্টামেণ্টটির কথা মোপাসাঁর স্মরণে এলো না কেন? যদিও আশ্চর্য হবার বোধ হয় কোনো কারণ নেই। অধুনা আমি আঁদ্রে জিদ-এর "জুর্নাল" বা রোজনামচাখানা ফের উল্টে-পাল্টে দেখছিলুম, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত।[৩]

---

২ Aristophanes, Terence. Plautas, Apleus, Ovid, Virgil, Shakespeare, Rabelais, Boccacio, La Fontaine, Saint-Amant, Voltaire, J. J Rousseau, Diderot, Mirabeau, Gautier, Musset etc. etc.

ফরাসি জাতটা বিদেশী নাম বিকৃত করতে ওস্তাদ—অনেকটা বাঙালীর মত কিংবা বলতে পারেন, পরকে "আপনাতে" জানে॥

৩ অধুনা এদেশে নাকি 'তুলনাত্মক সাহিত্যচর্চা" পড়ানো হয়। এ চর্চাতে যাদের হাতখড়ি হচ্ছে, তাদের স্মরণ করিয়ে দি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনেক লোকই রোজনামচা লেখেন। এদের ভিতর একজন ফরাসী—জিদ, দ্বিতীয়জন জর্মন—য়্যুঙার (স্ট্রালুঙেন) এবং তৃতীয়জন স্যুইস—ফ্রিশ (টাগেবুখ)—যদিও যুদ্ধের পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তবু তার মূল Weltanschauuang যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী ধ্বংসকে কেন্দ্র করে। এঁরা তিন দেশের সর্বোত্তম না হলেও তারই কাছাকাছি লেখক।...পাঠক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন, ফরাসী

পুস্তকান্তের নিঘণ্টুতে দেখি, জিদ প্রায় ছ'শ জন লোকের নাম করেছেন। শতকরা আশিজন সাহিত্যস্রষ্টা। প্রাচ্যদেশীয় একজন লেখকের নামও তাঁর আত্মচিন্তায়, বন্ধুমিলনে, সাহিত্য পাঠে উল্লিখিত হয়নি। অথচ গুণগ্রাহী এই জিদই "গীতাঞ্জলি" অনুবাদ করেন। ইয়োরোপের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবদের কথা হচ্ছে না ; ম্যাক্সমুলার, লেভি, উইনটারনিৎস, সাষাও (অল-বীরুনীর অনুবাদক) এঁদের কথা আলাদা, কিন্তু যাঁরা সাহিত্য-রস, কলাসৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের অল্পজনই সে-সব বস্তুর জন্য অস্তাচলে বসে পূর্বাচলের পানে তাকান—গ্যোটে রোলাঁ (তিনিও সুন্দরের চেয়ে সত্যের সন্ধান করেছেন অধিকতর) বড়ই বিরল। প্রতিদিন বিরলতর হচ্ছে। কিছুদিন পরে অবশ্য এঁদের সম্বন্ধে আমরা আর কোনো খবরই পাবো না। বিদেশী বই আসবে না। বিজলি বন্ধ হয়ে গেলে রেডিয়ো সেটের মত অবস্থা হবে আমাদের।

মূল কথায় ফিরে যাই ঃ মোপাসাঁ লিখছেন, "রীতিমত চটে যেতেন ফ্লোবের, যখন আর্ট সমালোচকরা সাহিত্যে "নীতি" "সাধুতার" দোহাই পাড়তেন। তিনি (ফ্লোবের) নিজেই বলেছেন, 'যবে থেকে মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছে, সর্বমহান লেখকই তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমে এই সব ক্লীবদের 'সদুপদেশের' (উদ্ধৃতি চিহ্ন অনুবাদকের) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।'

("Depuis qu'existe I'humanite, disait-il, tous les grands ecrivains ont proteste per leurs oeuvres contre ces conseils d'impuissants")[৪]

গুরুদত্ত এই আপ্তবচনটি সসম্মান উদ্ধৃত করে মোপাসাঁ বলছেন, "সুষ্ঠু, প্রতিষ্ঠিত সমাজজীবনের জন্য সুনীতি তথা সাধু আচরণ অপরিহার্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের তো কোন সম্পর্ক নেই। ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য, মানুষের প্রবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে সেগুলো বর্ণনা করা—তা তার প্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তিই হোক আর কুপ্রবৃত্তিই হোক। নীতিগর্ভ উপদেশ বিতরণ করা

জিদ কী মৈত্রীর চোখে জর্মনদের এবং জর্মন য়ুঙার ফরাসীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন ! এর সঙ্গে পাঠক আইজেনহাওয়ারের ক্রুসেড ইন ইয়োরোপ মিলিয়ে পড়লে উপকৃত হবেন।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি, শেষের ইংরিজি বই ভিন্ন বাদবাকি তিনখানা বই আমি এদেশের বিদেশী-পুস্তকবিক্রেতাদের 'কেরপায়' পাইনি। ঈশ্বরাদেশে যারা পপলার গাছ পোঁতে, তাদেরই একজনের বদান্যতায়। তা সে যাক গে। কিন্তু এই সুবাদে আমি আমার বিশেষজ্ঞ পাঠকদের শুধোই—আমার বাস মফস্বলে -আচ্ছা আজ যদি কোনো বন্টু বা হটেনটট বিদেশী বই কিনতে চায়, তবে তাকেও কি একসচেঞ্জের জন্য পণ্টকদের পায়ে তেল দিতে হয় ? বোধ হয় না। কারণ তারা যে বর্বর। আর আমরা সভ্য। "মহামানবের তীরে" বাস করি।

৪ Dumesnil, Correspondance, পৃ ১০৯।

কিংবা অভিসম্পাত দেওয়া, অথবা তত্ত্বতথ্যের প্রচার করার জন্য জীবন উৎসর্গ করা তো তার কর্ম নয় (অর্থাৎ এসব প্রচারকর্মের 'মিশনারি' সে নয়)। এ জাতীয় উদ্দেশ্যমূলক কোনো গ্রন্থই আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারে না।

তৎসত্ত্বেও কোনো সার্থক গ্রন্থ যদি সুশিক্ষা দানে সক্ষম হয়, তবে সেটা লেখক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থ লিখেছিলেন বলে নয় (সেটা 'malgre l'auteur' 'inspite of the author', সেটা লেখকের ইচ্ছা—এমন কি অনিচ্ছাবশত নয়), তিনি যে-ভাবে ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছিলেন, তার অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই সে সেই সুশিক্ষা দানে সক্ষম হয়েছে।"

অর্থাৎ "আন্‌কল টম'স্‌ ক্যাবিন" যদি দাসত্ব প্রথাকে নির্মম আঘাত দিয়ে থাকে, যদি এমিল জোলার 'জাঁ ক্যুজ' ('আই একুজ' = 'আমি ফরিয়াদ জানাই') ৫ মিলিটারি স্বৈরতন্ত্রকে দ্বিখণ্ডিত করে থাকে, তবে তার কারণ, পুস্তকদ্বয় অনুভূতি সঞ্চারণে এমনই কৃতকার্য হয়েছিল যে, এগুলি তখন আর্টের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আরোহণ করেছে।

মোপাসাঁ বিশুদ্ধ আর্ট, আর্টে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে আরো অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু সেগুলো উপস্থিত থাক।

ছুঁৎবাই রোগে আক্রান্ত 'পদি পিসি' সব দেশেই আছেন—তবে ফ্লোবের-মোকদ্দমায় হেরে গিয়ে ফ্রান্সের পদি পিসিরা বড়ই মুষড়ে যান। বস্তুত ফ্লোবের-শতাব্দীর শেষের দিকে পেণ্ডুলাম অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছে। ফ্রান্সের যে মিনিস্ট্রি অব পাবলিক ইনসট্রাকশন একদা ফ্লোবেরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করেছিলেন, তাঁরাই তখন আইন করেছেন, যে-সব পুস্তকে ভগবানের উল্লেখ থাকবে, মিনিস্ট্রি সেগুলো তাঁদের পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য কিনবেন না। সে খবর শুনতে পেয়ে কট্টর জাত-নাস্তিক আনাতোল ফ্রাঁস উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, "এ আবার কি রকমের লিবার্টি—যে লিবার্টি মানুষকে ভগবানের নাম প্রচার করতে দেয় না ?"

বভারি মোকদ্দমার একশ' বছর পর আবার পেণ্ডুলাম অন্য প্রান্তে গেছে। টপ্‌লেস ডাইনি পোড়াবার জন্য ফ্রান্সেই এখন সব চেয়ে পুলিসের দাপট, নাইটক্লাব টাইট দেওয়াতে এদের উৎসাহ-উত্তেজনার অন্ত নেই। আমাদের অবশ্য তাতে কিচ্ছুটি বলবার নেই।

কিন্তু একশ' বছর পূর্বে যে বভারির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করে মার খেল

---

৫ বইখানা অবশ্য মোপাসাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়ে শুধু ফ্রান্সে নয়, সর্ব সভ্য বিশ্বে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমি বিশেষ করে এ-বইখানা যে উল্লেখ করলুম তার কারণ, প্রবাদে আছে "পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সর্ড" "লেখনী তরবারি অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী"—এবং এই বইখানি তৎকালীন ফরাসী সেনাবাহিনীর স্বেচ্ছাচারী মদমত্ততাকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে প্রবাদবাক্যটি সপ্রমাণ করে। আমার জানামতে এটি লেখনী তরবারিতে একমাত্র সরাসরি যুদ্ধ।

ফ্রান্স, সেই ফ্রান্সই চেষ্টা করছে এখন, আবার মাদাম বভারির সর্বাঙ্গে বোরকা চাপিয়ে তুর্কীপাশার হারেমবন্ধ করতে! হিটলার যখন 'পবিত্র' জর্মন ন্যাশনালিজমের দোহাই কেড়ে ইহুদি বই পোড়াতে আরম্ভ করেন তখন এক মার্কিন গুণী বলেছিলেন, "জর্মনী-পুটস দি ক্লক ব্যাক!" ফ্রান্সে যে তারই পুনরাবৃত্তি! এ-ও এক নয়া নাৎসিবাদ।

দ্য গল লোকটিকে আমার খুব পছন্দ নয়। যদ্যপি গত যুদ্ধের সময় তাঁর আদর্শ এবং চার্চিলের আদর্শে কোন পার্থক্য ছিল না, তবু চার্চিল পদে পদে দ্য গলের দম্ভ দেখে অতিষ্ঠ হতেন। প্রধান অভিনেত্রী বা প্রিমা দন্নার মত তিনি এমনই অতি অল্পেতে ঠোঁট ফোলাতেন, গোসাঘরে আশ্রয় নিতেন[৬] যে, আইজেনহাওয়ারের মত মাথা ঠাণ্ডা মানুষ পর্যন্ত—যিনি কি না মণ্টীর মত দেমাকি লোককেও সামলাতে পেরেছিলেন—তাঁর এদিকটা লক্ষ্য করে লেখেন "We felt that his qualities were marred by hypersensitiveness and an extraordinary stubbornness in matters which appeared inconsequential to us. My own wartime contacts with him never developed the heat that seemed to be generated frequently in his meetings with many others."[৭]

মোগল পাঠান হদ্দ হল ফার্সী পড়ে তাঁতী। চিতে বাঘের চিত্তির মুছতে লেগে গেছেন মঁসিয়ো ল্য জেনেরাল শার্ল দ্য গল। না হলেই তো 'চিত্তির'! তবে শুনেছি, এ রবির পিছনেও নাকি একটি বিরাট ছায়া আছে। তিনি নাকি মাদাম। তিনিই নাকি ফ্রান্সের নব জোয়ান অব আর্ক পদি পিসি।

এ-সুবাদে আমার মনে পড়লো, এমিল জোলারও নাকি কয়েকটি পদি পিসি দোস্ত ছিলেন। তাঁরা নাকি একাধিকবার বায়না ধরে তাঁকে বলেন, "ভাই, তুমি লেখো ভালো; কিন্তু তোমার কোন বই-ই নিঃসংকোচে পুত্রকন্যার হাতে তুলে দেওয়া যায় না। একখানা 'ক্লীন' বই লেখো না কেন?"

জোলা ঢোঁক গিললেন।

সে বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে আনাতোল ফ্রাঁস বলেন, মসিয়ো জোলা যখন শুয়ারটার মত কাদাতে গড়াগড়ি দেন তখন তিনি সেটি করেন বড়ই গ্রেসফুলি (অর্থাৎ প্রকৃত সমঝদার আর্টিস্টের মত), কিন্তু তিনি যখন বন্ধুজনের অনুরোধে পাখনা গজিয়ে দেবশিশুপারা স্বর্গোপানে ওড়বার চেষ্টা করেন তখন সেই "এলোপাতাড়ি ড্যানার বাড়ি" দেখে হাসি সামলানো রীতিমত মুশকিল হয়—হি ডাজ ইট্ মোস্ট গ্রেস্‌লেস্‌লি। তারপর তিনি বলেন, আই

---

৬ আজকের দিনের সম্মানিত মহিলারা যে খাস কামরায় অতিথি-অভ্যাগতকে "আপ্যায়িত" করেন তার নাম 'বুদোআর'। শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে সন্দেহ আছে। অনেকেই মনে করেন এই "বুদোর"="to Sulk"="অভিমান করা" থেকে এসেছে।

৭ ক্রুসেড ইন্ ইউরোপ, পৃ. ৪৫৬।

প্রেফার মসিয়ো জোলা ওয়ালোইং ইন মাড্—মসিয়ো জোলার নর্দমাতে হুটো-পুটি করাটাই আমি পছন্দ করি বেশী ।।৮

* * *

প্যারিস ড্যানা গজিয়ে ফেরেশতার মত বেহেশৎ পানে ওড়বার চেষ্টা করছে—ইয়াল্লা !!

'অভাবে শয়তানও মাছি ধরে খায়'

অভিজ্ঞতাজনিত বিজ্ঞতা আসে ল্যাটে। তখন ওটা আর কোন কাজে লাগে না। বিলকুল বেকার। কিরকম? প্রকৃতির নিয়ম ঃ মাথায় বিপর্যয় টাক পড়ে যাওয়ার পর চিরুনি-প্রাপ্তি। ইরানী কবি একটু ঘুরিয়ে বলেছেন ঃ বৃদ্ধ বয়সে অনুশোচনায় দাঁত কিড়মিড় করছি? কিড়মিড়ি করার জন্য, হায়, দাঁতও যে আর নেই।

ল্যাটে বুঝলুম, মাতৃভাষা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর নিতান্তই যদি আরেকটি ভাষা শিখতে হয় তবে সেটি হবে, তোমার মাতৃভাষা যার কাছে সব চেয়ে বেশী ঋণী সেইটি শেখা ঃ বাঙলার বেলা সংস্কৃত, ফার্সীর বেলা আরবী, ফরাসীর বেলা লাতিন। তার বেশী ভাষার পিছনে ছুটোছুটি করা নিছক আহাম্মুখি। মাসান্তে যে দু'একখানা বিদেশী বই কিনবে, তার আর উপায় রইল না। কেন?—কলকাতাতে কি বিদেশী বই পাওয়া যায় না? পাওয়া যায় বই কি, এন্তের অঢেল। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো তো দিবারাত্তির গান গাইছে। মুশকিল শুধু, আপনার পছন্দের গান গায় না।

ইতিমধ্যে আমি দু'খানি চিঠি পেয়েছি। দুটি তরুণ আমার সদুপদেশ পাওয়ার পূর্বেই ফরাসী জর্মনে সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছে। তাদের সামনে সমস্যা, এখন এগোয় কি প্রকারে? তারা থাকে মফস্বলে—কি করে বলি, কলকাতার কোনো কোনো লাইব্রেরির লেনডিং সেকশন আছে, তাদের শরণাপন্ন হও, যখন জানি, কলকাতার খাস বাসিন্দার পক্ষেও কর্মটি সুকঠিন।

তখন হঠাৎ খেয়াল গেল, এরা মফস্বলে বাস করে। তার একটা মস্ত সুবিধে, ইলেকট্রিকের উৎপাত সেখানে নেই, কিংবা নগণ্য। বেতার যন্ত্রটির পুরো ফায়দা সেখানে ওঠানো যায়। কলকাতা বাসীও অবশ্য খানিকটে পারবে।

উপস্থিত বেতার খুললেই শর্টওয়েভে পাবেন, গাঁক গাঁক করে আপন পরিচিতি জানাচ্ছেন চীন। চীন আমাদের অতি কাছে বলেই তাকে পাওয়া যায়

---

৮ কাতরকণ্ঠে নিবেদন; দুনিয়ার কুল্লে বই—তা আমার জরুর যত কমই হোক—আমি যোগাড় করি কি প্রকারে? তাই অনেক স্থলেই স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু সরস্বতী সাক্ষী, সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়, কারো প্রতি অধম অবিচার করে না। এসব মহাজনদের বচন খাঁটি সোনার মোহর, উদ্ধৃতির চাপে ব্যাকাট্যাড়া হয়ে গেলেও সোনা সোনাই থাকে।

হরবকৎ, কিন্তু আমাদের কাজে লাগে অত্যল্পই), রুশ, আমেরিকা (VOA — Voice of America), ব্রিটেন (B B C), এবং অস্ট্রেলিয়া। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের যেগুলো দরকার, যেমন ফ্রান্স, জর্মনি, ইতালি সেগুলো জোরদার নয় এবং আমাদের উপকারার্থে তারা ব্রডকাস্ট করে অল্প সময়।

এই বেতারের সাহায্যে পুস্তকের অভাব খানিকটা পুষিয়ে নেওয়া যায়।

এর পূর্বে দু'একটি কথা অবতরণিকা হিসেবে বলে নেওয়া ভালো।

ভারতবর্ষে যে নিরক্ষরতা দ্রুতগতিতে লোপ পাচ্ছে না, তার প্রধান কারণ এ নয় যে, গ্রামে গ্রামে আমরা পাঠশালা খুলতে পারছি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার আসল কারণ, যারা পাঠশালা পাস করে বেরোয় তারা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে যায়—পড়বার জন্য বই খবরের কাগজের অভাবে। যে গ্রামে পঞ্চাশ বছর ধরে পাঠশালা আছে, সেখানে যে-কোনো সময়ে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাবেন, মাত্র যারা দু-এক বছর হল পাস করে বেরিয়েছে তারাই এখনো লিখতে পড়তে আঁক কষতে পারে ("থ্রী আর"=রীডিং, রাইটিং, রেকনিং)। বাদ্-বাকিরা কিংবা তাদের অধিকাংশই পুনরায় নিরক্ষর হয়ে গিয়েছে। এই বিষয় নিয়ে বছর কুড়ি পূর্বে আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ জোর প্রোপাগানডা-ক্যামপেন চালিয়েছিলুম ; সুযোগ পেলে মৃত্যুর পূর্বে আরেকবার চালাবো—মা ফলেষু কদাচন মন্ত্র স্মরণ করে।

তাই বৎস, তুমি যে ফরাসী, জর্মন বা রুশ ভাষায় সার্টিফিকেট পেয়েছ সেটা উত্তম কর্ম, কিন্তু যেটুকু শিখেছ সেও ভুলে যাবে, ঐ গ্রামের পড়ুয়ার মত পুস্তকাভাবে। তাই বলছিলুম, বেতার তোমাকে খানিকটে বাঁচাতে পারে।

তার পূর্বে কিন্তু একটি ভেরি ভেরি ইম্পরটেন্ট তত্ত্বকথা বলে নিই। এটা আমার নিজের উপদেশ নয়—পৃথিবীর যে-কোনো বেতার কেন্দ্র তোমাকে এই উপদেশ দেবে।

রুম অ্যারিয়েল শর্ট ওয়েভের জন্য সম্পূর্ণ বেকার না হলেও ছাতের উপর বাঁধা দীর্ঘ, দীর্ঘতম বাঁশের অ্যারিয়েলের তুলনায় নগণ্য। আমার উপদেশে যারাই কান পাতছো, তাদেরই বলি, যারা মফস্বলে থাকো তারা নেবে দীর্ঘতম বাঁশ (শহরে বোধ হয় এর একটা সীমা আছে, কিন্তু যেহেতু তুমি চোদ্দতলা বাড়িতে বাস করো না, সেটা তোমার উপরে প্রযুজ্য নয়) এবং নির্মাণ করবে সর্বোত্তম অ্যারিয়েল। এস্থলে বলে রাখা ভালো, তিন-চারশ' টাকা সেট+আউটসাইড ব্যামবু অ্যারিয়েলে যে রিসেপশন পাবে, হাজার টাকা সেট+রুম অ্যারিয়েলে পাবে তার চেয়ে ঢের নিকৃষ্ট রিসেপশন। অবশ্য দামী সেটে যে রকম ধ্বনিকে—বিশেষ করে সঙ্গীতের বেলায় ইচ্ছেমত কড়া মোটা করা যায়, সস্তা সেটে সেটা করা যায় না। কিন্তু ভাষার বেলা—যাকে বলে স্পোকেন ওয়ার্ড—সস্তা সেটও+দীর্ঘতম আউটসাইড অ্যারিয়েল ১০০% কাজ দেবে। "আমার সেট আরো দামী হলে আরো ভালো রিসেপশন হত" এটা ভুল ধারণা। যে-কোনো দিন সকাল সাতটা-আটটা গোছ সময় ১৩ মিটার ব্যান্ডে অস্ট্রেলিয়া শুনে নিয়ে (ঐ সময় ১৩ মিটার মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাট) অন্য বাড়িতে দামী

সেট শুনে এসো—দেখবে তফাৎ নেই। পুনরায় সন্ধ্যে ৬-৩০-এ ১৩ মিটারে প্যারিসের ইংরেজীর প্রোগ্রাম খানিকটা শুনে (প্রোগ্রাম মাত্র আধ ঘণ্টার, ৭টা থেকে ফরাসী ভাষাতে প্রোগ্রাম শুরু হয়ে যায়) দামী সেটের রিসেপশনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। প্যারিস দুবলা স্টেশন, তদুপরি ঐ সময় ১৩ মিটারে বিস্তর স্টেশন ঝামেলা লাগায়—গোটা তিনেক বি বি সি, একটা VOA, ভাটিকান, সুইজারল্যাণ্ড, পাকিস্তান, রুশ, হল্যাণ্ড, আরো কে কে আছেন—কাজেই তুমি যদি তখন প্যারিসের ইংরিজী প্রোগ্রাম পরিষ্কার বুঝতে পারো তবে আর চিন্তা করো না, তোমার সেট এবং অ্যারিয়েল দুই-ই ঠিক। অবশ্য বর্ষার অতি নিকৃষ্ট আবহাওয়া হলে দামী, সস্তা কোনো সেটেই, শহর মফস্বল কোনো জায়গাতেই হয়তো প্যারিস ধরতে পারবে না।

আপন দেশের ভাষা শেখাবার জন্য সব চেয়ে উৎসাহী ইংরেজ। কিছু দিন থেকে বাংলার মাধ্যমে পর্যন্ত ইংরিজী শেখাতে আরম্ভ করেছে। যারা ইংরেজীটা মোটামুটি জানো, তারা অ্যাডভান্স কোর্সটি শুনলে উপকৃত হবে।

প্যারিস একদা, বোধ হয়, ইংরিজীর মাধ্যমে ফরাসী শেখাতো। এখন সাড়ে ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত যে ইংরিজী প্রোগ্রাম দেয় তাতে তো সে আইটেম শুনিনি। তবু নিরাশ হবার কারণ নেই। প্রথম ১৮'৩০ থেকে ১৯'০০ অবধি (আমি সর্বত্রই ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম দিচ্ছি) মনোযোগ সহকারে ইংরিজী প্রোগ্রামটি বিশেষ করে সংবাদ—শুনে নেবে। তারপর সেই সংবাদই ফরাসীতে শুনতে পাবে ১৯.০০ থেকে ১৯.৩০-এর ভিতর কোনো এক সময়। ইংরিজীতে খবরটা বুঝে নিয়েছ বলে ফরাসীতে সেটি ধরতে সুবিধে হবে। মাসখানেক প্র্যাকটিসের পরও যদি না বুঝতে পারো তবে মেনে নিয়ো, যে ফরাসী জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছিলে সেটা যথেষ্ট নয়। দুপুরেও প্যারিস ফরাসী প্রোগ্রাম দেয়—প্রধানত ইণ্ডোচায়নার জন্য। তবে রিসেপশন সব সময় ভালো হয় না।

সুইজারল্যাণ্ডও ফরাসীতে প্রোগ্রাম দেয়। ইংরেজীতেও। আমাদের জন্য (অর্থাৎ ফর ফার ঈস্ট অ্যাণ্ড সাউথ ঈস্ট এশিয়া) তাদের স্টেশন খোলে ১৬'৩০ ঐ ১৩ মিটার ব্যাণ্ডেই। ওরা কিন্তু ব্রডকাস্ট করে (১) জর্মন, (২) সুইস জর্মন, (৩) ফরাসী, (৪) ইতালীয়, (৫) ইংরিজী এবং কোনো কোনো দিন এস্পেরান্তোতেও। প্যারিসের বেলা যে প্রক্রিয়ার সুপারিশ করেছি এস্থলেও সেটি প্রযোজ্য। তোমাকে শুধু তক্কে তক্কে থাকতে হবে, কখন কোন্ ভাষায় প্রোগ্রাম দেয়।* এ ছাড়া রুশ, চীন, জাপান এরাও ফরাসীতে ব্রডকাস্ট করে,

* সব স্টেশনই কোনো না কোনো সময় আপন ঠিকানা দেয়। সে ঠিকানায় চিঠি লিখলে তারা প্রোগ্রাম ফ্রী পাঠায়। যারা ভাষা শেখায় তারা কেউ কেউ ফ্রী চটি পাঠ্যবইও পাঠায়, কোনো কোনো স্থলে পয়সা দিতে হয়। কখন কোন্ মিটারে কে ব্রডকাস্ট করে তার সবিস্তর বর্ণন পাওয়া যায় World Radio Handbook, Lindorffs, Allee 1, Hellerup, Denmark

(বি বি সি-ও করে, কিন্তু এ দেশে শীতকালে রাত ঘনিয়ে এলে কখনো কখনো পাওয়া যায়—আসলে ওটা আমাদের উদ্দেশে বেতারিত হয় না—ওটা পূর্ব ইয়োরোপের জন্য, জর্মনের বেলাও তাই)।

কিন্তু সর্বোত্তম ব্যবস্থা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ফরাসী প্রোগ্রাম শোনা। রাত ঘনিয়ে এলে ও বোধ হয় সন্ধ্যার দিকেও ইটি বেতারিত হয়। এটা শোনার সুবিধা এই, রিসেপশন মোটামুটি ভালো; কি কি খবর মোটামুটি দেবে সেটা আগের থেকে জানা আছে বলে বুঝতে সুবিধে হয়, এবং যে দু-চারটে কথিকা দেয়—যেমন রবীন্দ্রনাথ বা ভারত ইতিহাসের কিছু একটা—আমাদের কিছুটা জানা বলে ঐ একই সুবিধে। এদের উচ্চারণ সব সময় ১০০% খাঁটি হয় না—তবে আপনার আমার কাজের জন্য "যথেষ্টর চেয়েও প্রচুর"। এস্থলে উল্লেখ করি, যাঁরা কনভারসেশনাল আরবী এবং ফার্সী বুঝতে নিজেকে অভ্যস্ত করাতে চান তাঁরা যেন আকাশবাণীর আরবী ফার্সী প্রোগ্রাম শোনেন। এঁদের উচ্চারণ অত্যুৎকৃষ্ট। কিছুদিন আগেও মক্কার এক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক ও মদিনাগতা তাঁর স্ত্রী অ্যানাউনসার ছিলেন।···

ধার্মিকজন মিশরে গৃহীত রেকর্ডে অত্যুত্তম কুরান পাঠও শুনতে পাবেন। ···রাজনৈতিক তথা প্রাকৃতিক আবহাওয়া ভালো থাকলে ফরাসী ইকোয়েটরিয়াল আফ্রিকার ব্রাজভিল শহরের উত্তম ফরাসী ব্রডকাস্ট এদেশে পাওয়া যায়। শীতকালে রাত ঘনিয়ে এলে ত্যুনিস আলজেয়ারস থেকেও মিডিয়াম ওয়েভে ফরাসী প্রোগ্রাম পাওয়া যায়। এবং রাত দশটা এগারোটা থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত মন্তে কার্লো—ফরাসীতে। শীতকালে মিডিয়াম ওয়েভে ২০৫ মিটার (=১৪৬৬ কি. সা) ব্যাণ্ডে। আমার জানামতে এটিই ইয়োরোপের সব চেয়ে জোরদার মিডিয়াম ওয়েভ স্টেশন। এর জোর ৪০০ কি ও। ফরাসীটা সড়গড় হয়ে গেলে শীতকালে অনিদ্রায় এর প্রোগ্রাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরমানন্দে শোনা যায়। তবে কমার্শিয়াল বলে উৎপাতও আছে।···ওয়েস্ট বার্লিনও ৩০০ কি. ও. স্টেশন, কিন্তু কে জানি নে একে বড় জ্যাম করে।

জর্মনির যে বেতার স্টেশন বিদেশের জন্য বেতার ছাড়ে তার নাম ডয়েচশে ভেলে (Deutsche Welle) এবং তিনি কলোনে (Koeln-Cologne যেখান থেকে অডিকলোন আসে)। ভারতের জন্য এদের প্রোগ্রাম ১৮'২০ থেকে '১৫ পর্যন্ত, ১৯ এবং ১৬ মিটারে কিন্তু নিরেট জর্মন ভাষায়। তবে ইংরিজী, হিন্দী উর্দু এবং ফের ইংরেজীতে ব্রডকাস্ট করে একবার সকালে ৮'৩০ থেকে ৯'১০ পর্যন্ত এবং দুপুরে একটা থেকে মাঝে মাঝে ক্ষান্ত দিয়ে রাত্রি প্রায় দশটা অবধি ওই সব ভাষায়। এরই যে কোনো একটা শুনে নিয়ে জর্মন প্রোগ্রাম শুনে নিলে ভালো হয়। কিছুদিন পূর্বে একটি তাজ্জব খবর পেলুম। জর্মনি মাসে দুই বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে ১'৩৫ পর্যন্ত সংস্কৃতে ব্রডকাস্ট করবে! তবে

বইয়ে। দাম পাঁচ টাকার মত। এবং সকরুণ নিবেদন, আমাকে দয়া করে চিঠি লিখিবেন না। আমি অসুস্থ। সেক্রেটারি নেই।

ওয়েভ লেন্‌থটা জানি নে। আশা করছি, খুঁজে-পেতে পেয়ে যাবো।... বর্ষাকালে এ দেশে জর্মনি ভালো পাওয়া যায় না। বরঞ্চ ১২·১৫ থেকে ১৫·০০ অবধি জর্মনি যে বেতার অস্ট্রেলিয়ার জন্য ২৫, ১৯, ১৬ মিটারে ছাড়ে তার ১৬টা ভালো পাওয়া যায়। জর্মনি একদা ইংরেজীর মাধ্যমে জর্মন শেখাতো —এখনও শেখায় কিনা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

এ ছাড়া পূর্বোক্ত সুইজারল্যান্ড অনেকক্ষণ ধরে জর্মনে ব্রডকাস্ট করে। এককালে পূর্ব জর্মনিও (DDR) শুনতে পেতুম। দুপুরবেলা জাপানও উত্তম জর্মনে (১৯ মি) এবং রাত ঘনিয়ে এলে মস্কো, বুখারেস্ট, প্রাগ, সোফিয়া ইত্যাদি শহরও ফরাসী জর্মনে ব্রডকাস্ট করে। এদের সকলেরই প্রায় এক সুর, কিন্তু আমাদের তাতে কিছুটি যায় আসে না। আমাদের ভাষা শেখা নিয়ে কথা।

দুঃখের বিষয়, ভিয়েনা—জর্মন ভাষার বড় কেন্দ্র—এখনো এক্‌সপেরিমেন্টাল স্টেজে, এবং ফরাসী কৃষ্টির বৃহৎ কেন্দ্র ব্রাসল্‌স্‌ আমি কখনো পাইনি।

মস্কো একদা অতি সযত্নে রুশ ভাষা শেখাতো। আরবী, ফার্সীতে যাঁদের দিল্‌চস্‌পী, তাঁরা অনায়াসে বাগদাদ, কাইরো এবং তেহেরান খুঁজে পাবেন। কাবুল ফরাসী ও ইংরেজীতে অল্পক্ষণের জন্য ব্রডকাস্ট করে। ফার্সী এবং পশতু প্রচুর।

আমি শুধু সেসব স্টেশনের কথাই উল্লেখ করেছি, যেগুলো এ দেশে মোটামুটি ভালোই পাওয়া যায় এবং বিদেশী ভাষা-জ্ঞান সড়গড় রাখতে সাহায্য করবে।

"—ন্যাংটাকে ভগবানও ডরান—"

কি করে হঠাৎ একরাশ টাকা আমার হাতে এসে পেঁছিল, সেটা দফে দফে বুঝিয়ে বলা শক্ত। দরকারও নেই। মোটামুটি বলতে পারি, অনেকটা লটারি জেতার মত।

কিন্তু বিপদ হল, টাকাটা যাঁর মারফৎ এসেছিল, তাঁকে নিয়ে। তিনি লন্ডনের বিকটতম উন্নাসিক এক দর্জীর "দোকানে" কাজ করেন। সে দোকান নাকি রাজ-পরিবারের বাইরে কারো জন্য অর্ডার নেয় না। সেই কর্ম-প্রতিষ্ঠানে না আছে সাইনবোর্ড, না আছে টেলিফোন-কেতাবে তাদের নাম, নম্বর। তাদের প্রাইভেট নম্বর শুধু রাজ-পরিবার জানেন। অন্য লোকে সন্ধান পাবেই বা কি করে!

আমি বাস করতুম তাঁরই বাড়িতে। বাড়ির জেল্লাই কিছু কম নয়। বাকিংহাম প্যালেস পেরিয়ে হাইড পার্ক গেটে তাঁর ভবন। সে রাস্তাতেই থাকেন আর্টিস্ট এপ্‌স্‌টাইন (না রোটেন্‌স্‌টাইন, ঠিক জানি নে) ও চার্চিল সাহেব। আমি সেথায় আশ্রয় পেলুম কি করে? সেই খলিফের খলিফে গিয়ে-

ছিলেন হল্যাণ্ডে। সেথাকার রাজকন্যার বিয়ে হবে। বরের বিয়ের বেশভূষা তৈরি করতে। অতিশয় অনিচ্ছায়, দেশের আপন রাজার আদেশে। সেই বিদেশের রাজধানীতে পথ, হোটেলের নাম সব হারিয়ে যখন গা গা'র মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন আমি তাকে কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছিলুম। ব্যস্! হয়ে গেল। তিনি সেখান থেকে পকড়কে আমাকে লণ্ডন নিয়ে এলেন। তদবধি তাঁর ভবনে বাস। অবশ্য স্বীকার করবো লোকটি ভদ্র। আমি অন্যত্র সস্তা জায়গায় থাকলে যে কড়ি গুনতুম, তিনি সেটি সপ্তারম্ভে সহাস্যে নিতেন। পাছে আমি লজ্জিত হই, আমি মুফতে আছি।

আমি বললুম, "কি ধরনের কাপড়ে স্যুটটি হবে সে বাবদে আমারও তো কিছু রুচি থাকতে পারে। দেখি, কাপড়ের নমুনা।"

পাগলামিতে হাতেখড়ি হচ্ছে হেন লোককে যেভাবে ডাক্তার প্রণব রায়ের মত লোক হ্যাণ্ডিল করেন, সেইভাবে সদানন্দ হাস্য হেসে বললেন, "বৎস, তোমাকে গুটিকয়েক প্রশ্ন শুধোই। তোমার যখন বিয়ে হয়, তখন গুরুজন তোমার ঐ 'রুচি'র কথা শুধিয়েছিলেন?"

সত্যের অনুরোধে আমাকে নিরুত্তর থাকতে হল।

"আর এ তো সামান্য স্যুট। অবশ্য তুমি কুতর্ক করতে পারো, সামান্য জিনিসেই বরঞ্চ আপন রুচিমাফিক জীবনানন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু এ তো সামান্য জিনিস নয়, এ ব্যাপারটি অসামান্য। ভেরি ভেরি ইমপরটেণ্ট। নইলে কণ্ড, এরই মেহেরবানীতে আমি বাড়ি গাড়ি হাঁকালুম কি প্রকারে? অতএব বুঝিয়ে কই।"

গভীর দম দিয়ে মিঃ সিরিল হজসন-জবসন ফবজ-রোবসন বললেন, "উপস্থিত নববসন্ত সমারম্ভ। তুমি এসব স্যুট পরবে নিদাঘের অন্তিম নিশ্বাস থেকে হেমন্তের শেষান্ত পর্যন্ত। এইবারে শোন বৎস, তত্ত্বকথা। শিশির বসন্ত নিদাঘ হেমন্ত প্রতি ঋতু অনুযায়ী বকিঙহম প্রাসাদ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করেন। কিন্তু প্রতি বসন্তে একই বর্ণনা, প্রতি শিশিরে একই সর্ষপবর্ণ—অর্থাৎ নুন-হলদে না, একই বর্ণ না, একই বর্ণনা করা চলবে না।

প্রতি ঋতুর সমারম্ভে আমাদের একটি গুহ্যতম—টপমোস্ট-সীকরিট সভা বসে আসছে ঋতুর বর্ণ স্থির করার জন্য। যে বর্ণ স্থির করা হল, সেটা অত্যন্ত গোপনে রাখতে হয়। নইলে রাস্তার যেদো-মেধো সেই রঙের স্যুট পরে যত্রতত্র ঘোঁত ঘোঁত করে ঘুরে বেড়াবে। তা হলে ড্যুক অব এডেনবরা যখন অ্যাসকটে নামবেন—না, সেখানে হাঙ্গামা কম, প্রশ্ন শুধু ওয়েসকিট নিয়ে—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ওয়েসটকিট কি?"

"চ্যাংড়ারা হালফিল যাকে ওয়েস্টকোট বলে।"

আমি চুপ করে ভাবলুম, আমাদের দর্জীরা যখন 'ওয়াসকিট' বলে, তখন মোটামুটি শুদ্ধ উচ্চারণই করে, এবং 'লাট্-সাহেবে'র 'লাট্' উচ্চারণের মতই প্রাচীন শুদ্ধ উচ্চারণ। বললুম, তা "ওয়েসকিট্ নিয়ে দুর্ভাবনা কিসের?"

তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "তোমার ব্লাইণ্ড স্পটগুলো যে খোদায়

কোথায় কোথায় রেখেছেন বলা শক্ত। এদিকে শেক্‌স্‌পীয়র-বাইরন পড়েছ, অন্যদিকে মর্নিং স্যুটের ওয়েসকিটের মহিমা জানো না।"

আমি একগাল হেসে বললুম, "টায় টায় মিলে যাচ্ছে। ফ্রান্সের শ্যামপেন প্রভিনসের এক সমঝদার আমায় বলেছিল, 'তাজ্জব লাগে মসিয়ো, এদিকে আপনি মলিয়ের সারৎর পড়েছেন অন্য দিকে আপনি উত্তম মদ্য বর্দো বুর্গন্‌নের 'বুকে'র (bouquet) তফাত ধরতে পারেন না!' তা সে যাক গে। স্যুটের রঙের কথা কি যেন বলছিলে!"

"হুঁ, আসছে সীজনে সমঝদাররা যেসব রঙের উপর—রঙের উপর ঠিক না, রঙের শেডের উপর ন্যুয়ান্স-এর উপর কৃপা করবেন সেই অনুযায়ী তোমার স্যুটগুলো তৈরি করা হবে।"

আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম, 'গুলো মানে? কটা?"

আপন ওয়েসকিটের সর্বনিম্ন বোতামটির উপর—ইটি কখনো খাঁজে ঢোকানো হয় না, যবে থেকে ড্যুক অব উইনজার ফ্যাশানটি প্রবর্তন করেন—হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "তা, তা, গোটা বিশেক। আপাতক। পরে দেখা যাবে।"

এর পর আর শঙ্কার কোনো কথা ওঠে না। আমি বললুম, "যে টাকাটা ফোকটে পেয়েছিলুম সেটা গেল। উপস্থিত লণ্ডনে, একটা নাতিভদ্র লাউনজ স্যুটের কেমৎ নিদেন—£50/-/-, আড্‌ভালোরেম, আমাদের দিশী টাকায় প্রায় আটশ'—"

বাধা দিয়ে বললেন, "পাগোল! একটা সুস্থ (সোবার) স্যুটের দাম নিদেন £120/—/,—"

যখন পুনরায় চৈতন্যময় জগতে ফিরে এলুম তখন মিঃ (পরে তিনি স্যর হন) হজসন-জবসন ফবজ-রোবসন আমার গলায় সাইফন থেকে সোডা-জলের সঙ্গে কড়া ব্রাণ্ডি মিশিয়ে তাই দিয়ে চোঁ—ও"—ও"—করে চাঁদমারী মারছেন—দমকলের লোক যে-রকম হোজ দিয়ে আগুন মারে।

আমার কোনো কিছু বলার মত অবস্থা নয়। মিঃ হজসন (ইত্যাদি) বললেন, "আকছারই এরকম ধারা হয়। আমরা দমকল ডাকি নে। সাইফন দিয়ে কাজ চালাই। এই পর্শুদিনই ড্যুক্‌ অব কে—"

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, "তা হলে আমার এই দিশী কোত-পাৎলুন বন্ধক দিয়ে দেশের টিকিট কাটতে হবে নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "প্যাট কেম দি রিপ্লাই, খোলা বাজারে না, কিস্‌সুটি পাবে না। তবে হ্যাঁ, আলবত, ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম পুর্না সব আরকিওলজিকাল ক্যুরো কিনছে। অশোকের দাস্তানা, অর্জুনের পোর্টেবল অ্যাটম বম, দৌপদীর প্রেসারকুকার-কম্‌-ফ্রিজ—। কিন্তু তুমি ভয় পাচ্ছো কেন? আচ্ছা বল তো, পর্শুদিন রোদাঁর যে মূর্তিটি বিক্কিরি হল, তার পাথরের দাম কত? বুঝতে পারলে তো প্রশ্নটা? স্রেফ পাথরের দাম? প্লেন মেটেরেলের দাম?"

আমি মিনমিনিয়ে বললুম, "পাথরের দাম আর কত হবে? মার্বেল বটে। টাকা তিরিশেক।"

ওস্তাদ সোৎসাহে বললেন, "ইয়েহ্! আর মূর্তিটি বিক্রি হল £50,000/-। এইবারে একটু চিন্তা করো। তোমাকে যে ডজন দুই স্যুট বানিয়ে দেব, বাজারে তার দাম হবে, নিদেন, হাজার তিনেক পৌণ্ড। কিন্তু মেটেরেলের দাম? প্রেফ উলের দাম কত হবে? বঢ়ীয়াহ সে বঢ়ীয়াহ? £50/-/-? £100/-/- অর্থাৎ ১৪০০ টাকা? আমি আরটিস্ট, আমি রোঁদা।"

একটুখানি ভরসা পেয়ে বললুম, "তা, তা, ডজন দুই, মানে কিনা, অতগুলো সুটের কি সত্যই দরকার?"

* * *

এর পর ওস্তাদ অত্যন্ত টেকনিকাল ভাষায় যে-কথা বলেন সে আমি বুঝতে পারিনি, মনেও নেই। অতএব এখন যদি তাঁর ফিরিস্তি ঠিক ঠিক না দিতে পারি, তবে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

তিনি হুড়হুড় করে বলে যেতে লাগলেন—

"মর্নিং স্যুট—স্ট্রাইপ্‌ট্ ট্রাউজারস—অরিজিনাল ওয়েসকিট—তার টপ্-এন্‌ডে সাদা সিলকের পাইপিং দেব কি?—টাইয়ের উপরে ডাইমনড পিন্ না পার্ল দেবো?—কোণভাঙা কলারের জন্য কোন্ কোমপানি উত্তম? স্প্যাটার ডেশেজ!

"তার পর দেমি। পাতলুন যথা পূর্বং। কিন্তু কোটটা টেল নয়।

"সে না হয় হল। দুপুরের লাউন্‌জ্ স্যুটটি কি প্রকারের হবে?

"সন্ধেয়? ডিনার জ্যাকেট? টেলস্?

"ইতিমধ্যে যদি গল্‌ফ খেলতে লোকটা গিয়ে থাকে?

"কিংবা সাঁতার কাটতে?

"কিংবা খেঁকশেয়াল শিকার করতে ঘোড়ায় চড়ে, জোড়্‌পুরী?

"কিংবা সে যদি অসুস্থ হয়ে তাবৎ দিন বিছানায় শুয়ে থাকে, তবে তার ড্রেসিং গ্রাউন কি হবে?"

আমার মুখে বিরক্তি দেখে বললেন, "এই যে তুমি এখন লাউনজ স্যুট পরে আছ, এ তো ইংরেজের ডাল-ভাত। এর উপর তার কি ধরনের ক'টা স্যুট দরকার হয় তার ফিরিস্তি দেওয়া বড়ই শক্ত। সে থাক। উপস্থিত তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভাষা বাবদে আলোচনা হোক। আচ্ছা বল তো স্মর্কা কাকে বলে?"

"জানি নে।"

"তাহলে বানান করছি, s m o k i n g?"

"এ রকম বিৎকুটে উচ্চারণ হতে যাবে কেন?"

"ফরাসীরা তাই করে। অবশ্যি যারা অল্পস্বল্প দুনিয়ার খবর রাখে তারা বলে স্মকিন্‌ন! তা সে যাক গে, কিন্তু ফরাসীতে অর্থ হল ডিনার জ্যাকেট, টেল্‌জ্ না। আবার ইংরিজীতে স্মোকিং-জ্যাকিট অন্য জিনিস। অসকার ওয়াইল্‌ডের বড় প্রিয় ছিল, আর ছিল ফিনসি ওয়েসকিট—"

আমি বাধা দিয়ে বললুম, "ওয়াইলডের কথা কও, শুনতে রাজী আছি।

কিন্তু তোমার এই বাহান্ন রকমের স্যুটের স্নবারিক দেমাক আমার আর বরদাস্ত হচ্ছে না।"

সিরিল বললেন, "বট্যো ? তুমি যখন পাঁচ রকম 'ঔচে' (উচ্ছে) বর্ণনা দিতে দিতে স্নবারির চূড়ান্তে পেঁছে গিয়ে বলো, ইংরেজ রাস্টিক, তেতোর কদর বোঝে না, তখন আমি বাধা দিই ? তুমি যখন বারো রকম অ্যামবল (অম্বল)—"

* * *

শ্রীযুক্ত নীরদ চৌধুরী যাই বলুন, যাই কন, জামাকাপড় বাবদে আমরা মুক্ত।

রাস্তা দিয়ে নাগা সন্ন্যাসী যখন যায়, তখন তো আমরা শুধোই নে, এটা হিন্দু না মুসলমান 'ড্রেস' !!

'ল্যাটে'

"রদাঁগৎ কাকে বলে জানো ?"

"এক রকমের ফরাসি লম্বা কোট। প্রায় ফ্রককোটের কাছাকাছি। এর বেশী কিছু জানি নে, কখনো দেখিনি।"

"শব্দটা—রাদার, সমাসটা—কোত্থেকে এসেছে ?"

আমার ইংরেজ বন্ধু সিরিল বেশভূষা বাবদে পয়লা নম্বরি, কিন্তু শব্দ, ভাষা এসব বাবদে তাঁর অণুমাত্র ইনট্রেস্ট্ নেই। তাই একটু উৎসাহ দেখিয়ে বললুম, "কোত্থেকে ?"

"চেনবার জো'টি নেই। ইংরেজী 'রাইডিং কোটে'র এই হল ফরাসি উচ্চারণ। শুধু তাই নয়, এতে আরো মজা। সেই রদাঁগৎ যখন ফের বিলেতে এল তখন তার ইংরিজী উচ্চারণ হয়ে গেল রেডিংগট এবং ফ্রান্সে নবজন্মপ্রাপ্ত এ-পোশাক এদেশে আবার এক নবজন্ম লাভ করে হয়ে গেল মেয়েদের পোশাক—পুরুষ আর এটি এদেশে পরে না, অন্তত এ নামে পরিচিত পোশাকটি পরে না। কিন্তু রদাঁগৎ এখনো ফ্রান্সের ভারিক্কি পোশাক। তোমারও তো বয়স হতে চললো, আর যাচ্ছোও ফ্রান্সে—"

আমি বললুম, "থাক, আমার সাদামাটা লাউনজ স্যুটেই চলবে।"

* * *

ফ্রান্সের একটি জায়গা দেখার আমার অনেককালের বাসনা।

বহু বৎসর পূর্বে আমরা একবার মার্সেলস বন্দরে নামি। সঙ্গে ছিলেন দেশনেতা স্বর্গত আনন্দমোহন বসুর পুত্র ডঃ অজিত বসু ও তাঁর স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া মায়া দেবী।

বড়ই দুঃখের বিষয় এই গুণী, জ্ঞানী কর্মবীর অজিত বসু সম্বন্ধে কেউ কিছু লেখেননি। আসলে ইনি চিকিৎসক ছিলেন কিন্তু তাঁর জ্ঞানসাম্রাজ্য যে

কী বিরাট বিস্তীর্ণ ছিল সেটা আমি আমার অতি সীমিত জ্ঞানের শিকল দিয়ে জরিপ করে উঠতে পারিনি।

তাঁর কথা আরেক দিন হবে।

তখনকার মত আমাদের উদ্দেশ্য ছিল জিনীভা যাওয়া। কিন্তু খবর নিয়ে জানলুম, সন্ধ্যার আগে তার জন্য কোন থ্রু ট্রেন নেই।

গোটা মধ্য এবং পশ্চিম ইয়োরোপ তিনি চিনতেন খুব ভালো করে। এবং বিখ্যাত শহর হলেই তিনি ইয়োরোপের ইতিহাসে সে শহর কি গুরুত্ব ধরে ধাপে ধাপে বলে যেতে পারতেন, কারণ তাঁর মত 'পুস্তক কীট' আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।

বললেন, "তার আর কি হয়েছে! চলুন, ততক্ষণে এ্যাক্স্ হয়ে আসি। মাইল আঠারো পথ।"

আমি বললুম, "সে কি? এ্যাক্স্-লে ব্যাঁ তো অনেক দূরে।"

তিনি হেসে বললেন, "আমার জানা মতে তিনটে এ্যাক্স্ আছে। উপস্থিত যেটাতে যেতে চাইছি সেটা আগা খানের প্যারা জায়গা এ্যাক্স-লে-ব্যাঁ নয়—এটার পুরো নাম এ্যাক্স্ আঁ-প্রভাঁস!"

আমি বললুম, "প্রভাঁস? তাহলে এ জায়গাতেই তো আমার প্রিয় লেখক আলফঁস দোদে তাঁর 'লেটারজ্ ফ্রম মাই মিল' লিখেছিলেন, এখানকারই তো কবি মিস্ত্রাল যিনি নোবেল প্রাইজ পান—"

ডঃ বোস বললেন, "পুব বাঙলার যে লোকসাহিত্য আছে সেটা প্রভাঁসের আপন ফরাসি উপভাষায় রচিত সাহিত্যের চেয়ে কিছু কম মূল্যবান নয়। অথচ দেখুন, মিস্ত্রাল যে রকম একটা উপভাষা—একটা ডায়লেকটে, অবশ্য আজ এটাকে ডায়লেকট বলছি—কাব্য রচনা করে বিশ্ববিখ্যাত হলেন, নোবেল প্রাইজ পেলেন, ঠিক তেমনি পুব বাঙলায় কেউ সেই ভাষা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, গর্ব অনুভব করে, মিস্ত্রালেরই মত পরিশ্রম স্বীকার করে, সেটিকে আপন সাধনার ধন বলে মেনে নিয়ে নূতন সৃষ্টি নির্মাণ করে না কেন? জানেন, আমি বাঙাল?"

ইতিমধ্যে যান এসে গেছে।

এদেশের বর্ণনা আমি কি দেব? এ্যাক্স্ও নাকি দু হাজার বছরের পুরনো শহর। কই, মেয়েগুলোকে দেখে তো অত পুরনো বলে মনে হল না! তাহলে বলতে হয়, শহরটা দু' হাজার বছরের 'নূতন'।

পার্কের একটি বেঞ্চিতে বসে ভাবছিলাম, এই তো কাছেই তারাসক* শহর যাকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন দোদে তাঁর তারতারাঁ দ্য তারাসক* লিখে।[১] তারই পাশে ছোট্ট জায়গাটি—মাইয়ান্ (জানি নে, প্রভাসালে তার উচ্চারণ কি) যেখানে কবি মিস্ত্রাল তাঁর সমস্ত জীবন কাটালেন। তারই মাইল সাতেক দূরে

১ বছর চার পূর্বে বোধ হয় থগেন দে সরকার এর অনুবাদ "দেশে" প্রকাশ করেন।

বাস করতেন দোদে—ফঁভিয়েই গ্রামের কাছে। কবি মিস্‌ত্রালের বর্ণনা লিখে একাধিক ফরাসি লেখক নিজেদের ধন্য মেনেছেন। কিন্তু অপূর্ব দোদের বর্ণনাটি। —এক রববারের ভোরের ঘুম থেকেই উঠে দেখেন, বৃষ্টি আর বৃষ্টি, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি। গোটা পৃথিবীটা গুমড়ো মুখ করে আছে। সমস্ত দিনটা কাটাতে হবে একঘেয়েমিতে। হঠাৎ বলে উঠলেন, কেন, তিন লীগ আর কতখানি রাস্তা? সেখানে থাকেন কবির কবি মিস্‌ত্রাল। গেলেই হয়।

কিন্তু দোদে যেভাবে (তাঁর লেয়'-এ Letters de mon Moulin-এর ইংরিজী অনুবাদ কতবার কত লোক যে করেছেন তার হিসেব নেই, পাঠক অনায়াসে পুরনো বইয়ের দোকানে মূল অনুবাদ যোগাড় করতে পারবেন)[২] সেই জলঝড় ভেঙ্গে পয়দল মিস্‌ত্রালের গাঁয়ে গিয়ে পেঁছিলেন তার বর্ণনা আমি দেব কি করে? দোরে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে পেলেন কবি উঁচু গলায় কবিতা রচনা করে যাচ্ছেন—কী করা যায়?—নিরুপায়—ঢুকতেই হবে—

মিস্‌ত্রাল যেন লাফ দিয়ে তাঁর ঘাড়ে পড়লেন—"এঁ্যা! তুই এসেছিস! আর ঠিক আজকেই! কী করে তোর মাথায় সুবুদ্ধিটা খেললো, বল দিকিনি।"

তারপর কি হল? বলবো না।

শুধু একটি কথার উল্লেখ করি।

খানিকক্ষণ পরে গির্জা থেকে ফিরে এলেন মিস্‌ত্রালের মা। বুড়ী বড়ই সরলা, রান্নাতে পাকা, কিন্তু হায়, প্রভাঁসাল ছাড়া কোনো ভাষা বলতে পারেন না। তাই কোনো 'ফরাসি' (যেন প্রভাঁসের লোক ফরাসি নয়!) ছেলের সঙ্গে খেতে বসলে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেন না—কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, তিনি রান্নাঘরে না থাকলে তো রসুইয়ের নিখুঁত তদারকি হবে না।

আরেকটি কথা। মিস্‌ত্রালের শোবার ঘরটি ছিল বড্ডই ন্যাড়া। ফরাসি একাডেমি যখন মিস্‌ত্রালকে তিন হাজার ফ্রাঙ্ক উপহার দিলে, তখন বুড়ী চাইলেন ঘরটিকে একটু 'ভদ্রস্থ' করতে।

"না, না, সে হয় না"—বললেন মিস্‌ত্রাল—"এ যে কবিদের কড়ি; এটা ছুঁতে নেই।" ঘরটি ন্যাড়াই থেকে গেল। দোদে বলেছেন, "কিন্তু যতদিন ঐ 'কবিদের কড়ি' ফুরোয়নি, ততদিন কেউ তাঁর বাড়ি থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে যায়নি!"

বৃষ্টি হচ্ছিল না? না, আমি স্বপ্ন দেখছিলুম।

তবে কি আমি ডাঃ বসুর সঙ্গে বসে? না, সেও স্বপ্ন।

আমি এসেছি মিস্‌ত্রালের গ্রামে, বহু সৎসর পরে, সেই "রদাঁগৎ" পরে।

আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। শুধু একটি দুঃখ রয়ে গেল। যাঁকে এখানে আসার খবরটি পিকচার পোস্টকার্ডে জানালে খুশী হতেন তিনি এখন এমন জায়গায় যেখানে এখনো ডাক যায় না।

২ এ লেখক দোদের একটি লেখা সম্প্রতি অনুবাদ করেছে। 'দু-হারা' গ্রন্থ পশ্য। কিন্তু আমার অনুবাদ থেকে মূল যাচাই করতে যাবেন না।

আঁদ্রে জিদ

দুনিয়ার লোক হন্দমুন্দ হয়ে প্যারিস যায়, এবং প্যারিসের ধনীদরিদ্র সকলেরই কামনা, কি করে গ্রামাঞ্চলে একখানা কুটিরাবাস নির্মাণ করা যায়। প্যারিসের ফ্ল্যাটখানাও থাকবে এবং সেখানে মাঝে মধ্যে আসবেন থিয়েটার অপেরা দেখবার জন্য, বন্ধুজনের (বান্ধবী তো নিশ্চয়ই) সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

খাঁটি স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া কঠিন,—ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, যে কজন মহৎ ফরাসি লেখক আমার প্রিয় তাঁদের প্রায় সকলেই জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন 'মফস্বলে'। যাঁরা নিতান্তই কোনো না কোনো কারণে পেরে ওঠেননি—যেমন আলফাঁস দোদে—তাঁরা সুযোগ পেলেই ছুটে যেতেন গ্রামাঞ্চলে, কোনো সখার বাড়িতে।

প্রভাঁসের যে-জায়গাটিতে দোদে বার বার গেছেন সেখানে দিন পাঁচেক কাটানোর পর এক অপরাহ্নে বসে আছি, যে-'ইন্'টিতে উঠেছিলুম (এসব 'ইন্' এমনই গাঁইয়া যে এগুলো না হোটেল, না ডাক-বাংলো, না সরাই, না চটি—সব-কটিরই অল্প-বিস্তর সুবিধে অসুবিধে দুইই এগুলোতে পাবেন) তারই জানালার কাছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। ঢেউখেলানো উঁচু-নিচুর টক্করে ভর্তি জনপদ ধরিত্রীর দূরত্ব যেন আরো বাড়িয়ে দেয়—আপন দৃষ্টি যে কত দূরান্তে যেতে পারে সে সম্বন্ধে মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং আশ্চর্য, সমুদ্র যদ্যপি দিগন্ত-বিস্তৃত তার পারে বসে মানুষের এ-অভিজ্ঞতা হয় না।

ইন্‌কীপার, পাত্র (Patron), মালিক—যে নামে খুশী ডাকুন—কাছে এসে দাঁড়াতেই আমি প্রসন্ন বদনে বললুম "এ ব্যাঁ, আলর্—" এ শব্দগুলোর মানে অভিধানে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, যেমন "এই যে, হেঁহেঁ বেশ বেশ—" শব্দগুলো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মানে ধরে কিন্তু আসলে এগুলো ফাসী ভাষাতে যাকে বলে "তাকিয়া-ই-কালাস' অর্থাৎ "কথার তাকিয়া" অর্থাৎ যার উপর ভর করে কথাবার্তা আরাম পায়—জমে ওঠে।

তার পর বললুম, "বসবে না ? একটা কিছু খাও।"

বললে, "এ ব্যাঁ, আমি আপনাকে 'দেরাঁজ' ('ডিসএরেঞ্জ' শব্দার্থে অর্থাৎ ডিসটার্ব বা বদার) করছি না তো ?"

আমি প্রসন্নতর বদনে বললুম, "পা দ্য তু—বিলকুল না—।"

বললে, "মসিয়ো, আমি আদৌ 'নোজি' না। বিশেষত যখন দেখতে পাচ্ছি, আপনি যখন আপন মনে, মনের সুখে আছেন। ও লা লা—কাল সন্ধ্যায় আমাদের আড্ডাটি যা জমেছিল ! আর আপনি যা হাসাতে পারেন—"

একদম গুল্। হাসাতে পারার মত তেমন কোনো স্টাক্ আমার নেই। আসলে ব্যাপারখানা হয়েছিল এই যে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত কতকগুলো গল্প, গোপালভাঁড় ইত্যাদি আমি তাদের শুনিয়েছিলুম আপন ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে। তাদের কাছে লেগেছে 'এপাঁতা' (ভয়ঙ্কর মজাদার) এবং অরি-

জিনাল। অবশ্য এসব গল্প যখন প্যারিস-লণ্ডনেই পেঁছিয়নি তখন প্রভাঁসের 'পাণ্ডব-বর্জিত' অজ পাড়াগাঁয়ে যে অরিজিনাল মনে হবে তাতে আর বিচিত্র কি? গোপালের দু'একটি 'রিসকে' (risky আদিরসাত্মক) গল্প বলতেও ছাড়িনি, এবং তখন গাঁয়ের পাদ্রি সাহেবই—এবং তিনিই ছিলেন আসরের চক্রবর্তী—সব চেয়ে বেশী চোখের ঠার মেরে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

বললে, "মসিয়ো, আমাদের গ্রামে ক'জন বিদেশী এসেছে সে আমি এক আঙুলে বলতে পারি—তাও তারা পাশের দেশ স্পেন বা ইতালির বাউণ্ডুলে—আর আপনি তো এসেছেন কোথায় সেই সুদূর ল্যাঁদ (L Inde) থেকে। এখানে আপনি কি মধু পেলেন, বলুন তো?"

আমি বললুম, "তুমি তো বলেছিলে, তুমি কখনো প্যারিস তক্ দেখোনি। তোমাকে বোঝানো হবে শক্ত। তবে সংক্ষেপে বলতে পারি, এটা অনেকটা রুচির কথা। আপন দেশেও আমি গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে, বাস করতে ভালোবাসি। তা ছাড়া এটা কবি মিস্ত্রালের দেশ।···আচ্ছা, অন্য লোক আসে না এখানে মিসত্রালের জন্মভূমি দেখতে?"

বেশ গর্বভরে বললে, "নিশ্চয়ই, তবে তারা সবাই ফরাসি—"

তারপর কি যেন মনে পড়ে যাওয়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে এবারে সে উৎসাহভরে বললে, "ও লা লা। সে এক কাণ্ড।"

"দুই লেখকের লড়াই। সে হল গিয়ে ১৯৪৪-এর শেষের দিকের কথা। মার্কিনিংরেজ নরমাঁদিতে নেমে প্রায় সমস্ত ফ্রান্স দখল করে ফেলেছে, ঐ সময় কি কারণে, কি করে যেন দুই লেখক—হ্যাঁ খাঁটি ফরাসি—এসে উঠেছেন আমার এখানে। আর এই ঘরেই, আমরা কাল যেখানে দুপুর রাত অবধি কত আনন্দে হইহুল্লোড় করলুম, এসে বসেছেন, সেই দুই লেখক; কিন্তু তাঁরা তাঁদের চতুর্দিকে যে আবহাওয়া নির্মাণ করলেন সেটি ঠিক তার উল্টো। এ্যাম্বড়া বড়া গেরেমভারী হাঁড়িপানা গম্ভীর এক জোড়া মুখ দেখে আমার গাঁইয়া খদ্দেররা তো আশ্রয় নিলে ঘরের অন্য কোণে।

"ওঁরা গুরুগম্ভীর আলোচনা করে যাচ্ছেন নিজেদের ভিতর—আমরা ওদিকে কান দিইনি। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের গলা চড়তে লাগলো, তারপর আরম্ভ হল রীতিমত ঝগড়া। তারপর আরম্ভ হল আমাদের ঐ পাহাড়ী বকরীতে বকরীতে যে রকম লড়াই হয়।[১] তারপর বলদে বলদে। অবশ্য আমাদের বলদ প্রতিবেশী স্প্যানিশদের বলদের তুলনায় তেমন কিছু না।[২]

"কি নিয়ে ঝগড়া, মসিয়ো? জান কী নিয়ে—ছুঁড়ি নিয়ে? তা হলেও তো বাঁচতুম। সে তো হর-হামেশাই হচ্ছে। এ ঝগড়া সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস নিয়ে। বলি ঃ—

১ প্রভাঁসের বকরী সম্বন্ধে লিখেছেন স্বয়ং দোদে—Le Chevre de M. Seguin.

২ এও পাঠক পাবেন প্রাগুক্ত পুস্তকে।

ঐ সময়—অর্থাৎ তখনো যুদ্ধ শেষ হয়নি, অবশ্য হিটলারের পরাজয় সম্বন্ধে তখন সবাই নিঃসন্দেহ—এক ফরাসি লেখক লিখেছেন, এই যে আমরা ফরাসিরা 'পাত্রি' (স্বদেশ), 'পাত্রি', 'লিবেরতে' 'লিবেরতে বলে চেঁচাই তার মূল্য কতটুকু ? তিনি নাকি তারপর লিখেছেন, ফরাসি চাষা যদি তার গম দু পয়সা বেশী দামে বিক্রী করতে পারে তবে সে থোড়াই পরোয়া করে দেকার্ত আপন জাতভাই ফরাসি না দুশমন জরমন।

"এর নিয়ে লেগেছে তুলকালাম ঝগড়া ! এক লেখক বলছেন, যারা ফরাসি জাতের দেশপ্রেম নিয়ে এরকম বিদ্রূপ করে তাদের ফাঁসি হওয়া উচিত। অন্য লেখক বলেছেন, কথাটা টক হলেও হক। এবং যে ফরাসি লেখক একথা বলেছেন তিনি তো জর্মন বা তাদের 'দোস্ত' পেতাঁর সহযোগিতা করতে রাজী হননি। তাঁর সততা সম্বন্ধে যারা সন্দেহ করে তাদের হওয়া উচিত ফাঁসি। তখন প্রথম জন বললেন, 'আজ যদি আমাদের ক্লেমাসোঁ বেঁচে থাকতেন তবে ঐ যে ব্যাটা ফরাসির দেশপ্রেম নিয়ে মস্করা করেছে তাকে তাঁর নোংরা বন্দুকটা দিয়ে পরিষ্কারটা দিয়ে নয়, সেটা দিয়ে তিনি বুনো শুয়ার মারেন—গুলি করে মারতেন'।"

এতক্ষণ মালিক ভায়া যে গম্ভীর সুরে কথা বলছিলেন, তার থেকে আমার মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং ক্লেমাসোঁই লীগ অব নেশনসে প্রতিবেদন পাঠ করছেন।

এবারে হঠাৎ হেসে উঠে বললে, "তারপর যা হল, মসিয়ো, সে সত্যি যাকে বলে কু দ্য তেয়াৎর[৩]—নাটকীয় ব্যাপার—, ইতিমধ্যেই যে আমাদের পাদ্রি সাহেব কখন এখানে এসে এক কোণে দাঁড়িয়ে এঁদের তর্কাতর্কি শুনছিলেন সেটা লক্ষ্যই করিনি।

"তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন, "মেসিয়ো, আমি আপনাদের দেরাজ করতে চাই নে ; সামান্য একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আপন পথে চলে যাবো। আপনারা শহুরে সজ্জন—শুনেছি, আপনারা ব' দিয়োর (ভগবানের) অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। আমার শুধু বক্তব্য, আপনাদের একজন বলছিলেন, আজ ক্লেমাসোঁ বেঁচে থাকলে তিনি নাকি কাকে যেন গুলি করে মারতেন। এ-ভোওয়ালা, মেসিয়ো—আজই সন্ধ্যায় এই কাগজখানা আমার কাছে এসেছে আমাদের কলোনি ট্যুনিস থেকে। তাতে প্রকাশিত হয়েছে একখানি চিঠি। ইটি লিখেছেন মসিয়ো ক্লেমাসোঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী—তার বয়স, এখন চুরাশি। তিনি লিখেছেন,—'শের মসিয়ো জিদ, আমি আমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বহু বৎসর বাস করেছি। আমি বলতে পারি, আজ তিনি বেঁচে থাকলে আপনার পক্ষ নিতেন। তাঁকে কতবার বলতে শুনেছি, জমি ! জমি !! শুধু জমি !! আর টাকা। ব্যস, মাত্র এ দুটো বস্তুই আমাদের চাষীরা চেনে !'

---

৩ Coup d'etat' cout de palais তুলনীয়। আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র নানারকম 'কু' (অনেক সময়ই কিন্তু সেগুলো শিল্পমীর 'সু' !) হচ্ছে বলে এটা উল্লেখ করলুম।

"পাদ্রি সায়েব বললেন, 'তা সে যাক ! কিন্তু এটা কি ব' দিয়োর মিরাকল নয়, যে আজই আমি এ কাগজখানা পাবো, আজই আপনারা এ আলোচনা তুলবেন, আজই আমি সেই পত্রিকাটি পকেটে করে আজই এখানে আসবো—এবং আপনাদের দ্বন্দ্বের সমাধান করে দেব !···ও রভোয়া মেসিয়ো ! কাল রববার গির্জে'য় দেখা হবে' ।"

কাহিনীটি শেষ করে মালিক মিটমিটিয়ে হেসে বললে, "এই যে বিরাট ফ্রান্স-ভূমি—এদেশের কারো বিশ্বাস, প্রভাঁসের লোক বড় সরল, বিশ্বাসী, ধর্মপ্রাণ, আর কারো বা বিশ্বাস তারা কুসংস্কার কুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ।···আপনার কি মনে হয় ? আপনি তো এসেছেন ধর্মের দেশ L'Inde থেকে ।"

আমি তার মিটমিটে হাসি থেকে তারই বিশ্বাস কোন্ দিকে বুঝতে পারলুম না ।।৪

আড্ডা

কি বললেন স্যার ? বাড়ি বিক্রি করতে এসেছেন ? আমি কিনবো ? আমি ! বাড়ি নিয়ে করবোটা কি আমি ? জন্ম নিলুম হাসপাতালে, পড়াশুনো করলুম হস্টেলে, প্রেম করেছি ট্যাক্সিতে, বিয়ে হল রেজিস্টারের আপিসে। খাই ক্যানটিনে—কিংবা যারে কয় 'ভোজনং যত্রতত্র'—, সকালটা কাটে কর্তাদের তেলাতে, তেনাদের তরে বাজার করে দিতে···হাটে-র্যাশনে, দুপুরটা আপিসে, মাঝে মিশেলে সিনেমা হলে—সন্ধ্যেটা। পটল তুললে শুইয়ে দেবে নিমতলায়। বাড়ি নিয়ে কি আমি গুলে খাবো ? তার চেয়ে বলি, আসলে আমার দরকার একটি আড্ডার। একটি অত্যুৎকৃষ্ট আড্ডার। তার খবর দিতে পারেন ? তবে বুঝবো, আপনি একটি তালেবর ব্যক্তি !

কথাটা ন' সিকে খাঁটি। অত্যুৎকৃষ্ট ('কৃষ্ট' যদি 'কিষ্ট' বা 'কেষ্ট' হয় তবে 'উৎকৃষ্ট'ই বা হবে না কেন ?) আড্ডা প্রতিষ্ঠানটি হালফিল পুরো-হাতা ব্লাউজের মত ডাইয়িং ইনডাস্ট্রি—মৃতপ্রায়।

এহেন অবস্থায় অকস্মাৎ বিনামেঘে পুষ্পাঘাত ! দিল্লী থেকে খবর এসেছে সদ্যভূমিষ্ঠ শিক্ষামন্ত্রী প্রতিজ্ঞা করেছেন, বাঙালীকে তিনি 'আড্ডাবাজ' করে ছাড়বেন !

দিল্লী থেকে আসা খবরের সঙ্গে আমি প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ি না—বয়স হয়েছে। খবরটা ফলাও করে প্রকাশিত হবে, সঙ্গে সঙ্গে দেমাঁতি (dementi) বেরুবে, ফের তস্য দেমাঁতি বেরুবে দলিলপত্রসহ, চোপরা-ভাটিয়া আফ্টার এডিট লিখবেন, পারলিমেনটে গোটা তিনেক মন্ত্রী নাকুনি-চুবুনি খাবেন, ঐ নিয়ে খানদানী আড্ডায় (আমাদের যৌবনে) তর্কাতর্কির ফলে গোটা তিনেক 'পেয়ারে' মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে—তবে আমি ব্যাপারটার মোটামুটি

৪ আঁদ্রে জিদ্-এর ডাইরি, Journal 1939-42, 1942-42, Appendice 200ff.

আবছা-আবছা ধুঁয়াশাপারা একটা 'উন্‌মান্‌' ('অনুমান' নয়, তার আউটলাইন বড্ড ধারালো) করে নিই যে, ব্যাপারটা কি হয়ে থাকতে পারে। গোলন-দাজদের কায়দা-করীনা নাকি এই দস্তুরেই হয়। প্রথম বোমা তাগ করবে লক্ষ্যবস্তু থেকে দূরে, পরেরটা কাছে, তার পর দুটোতে যোগ দিয়ে হাফাহাফি করে মোক্ষম মধ্যিখানে।

কিন্তু এ সংবাদখণ্ডটি নিয়ে কিঞ্চিনমাত্র দেমাঁতি ডুয়েল হয়নি। দিল্লীর লালাজী, মিয়াসাহেবরা খবরটা পরিবেশন করা সত্ত্বেও ব্যাপারটির গুরুত্ব 'এহমীয়ৎ' সম্বন্ধে বিলকুল বে-খবর। 'আড্ডা'? সো ক্যা বলা? মজলিস, মহফিল, মুশাএরা, জলসা, বয়েৎ-বাজী—আলবৎ—লেকিন 'আড্ডা'? সো ক্যা আফৎ, গজব? ওদের আড্ডা ভিন্ন বাথানের গোরু—ওদের ভাষায় ভিন্ন ঝোপের চিড়িয়া—যেমন ওদের গোলাব জামুন আর আমাদের গোলাপ জাম।

তা সে যাই হোক যাই থাক, খবরটা যদি গুজোরব বা 'আফওয়া' না হয় (হলে আগের থেকেই কলমে খৎ দিচ্ছি!) তবে বড় দুঃখের সঙ্গে শ্রীযুত ত্রিগুণা স্যানকে তাঁরই দ্যাশ করিমগঞ্জের একটি পদাবলী ঘেঁষা লোক-সঙ্গীত স্মরণ করিয়ে দেব ঃ—

'দেখা হইল না রে, শ্যাম
আমার এই নত্তুন বয়সের কালে—'

রসরাজের স্মরণে শ্রীমতী বলছেন, 'ঠাকুর! তুমি নির্দয় নও; আমাদের সাক্ষাৎ একদিন না একদিন হবেই হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার এই নূতন (নত্তুন) বয়সে যে দেখা হল না, সে-ই আমার মর্মবেদনা।'

'ডাক্তারেতে বলে যখন মরেছে এই লোক
তাহার তরে বৃথাই করা শোক
কিন্তু যখন বলে জীবন্মৃত
তখন শোনায় তিতো।'

খানদানী আড্ডা এখন জীবন্মৃত। তার নত্তুন বয়স বহু কাল হল গেছে। এখন আর তার " 'কোন্ গুণ আছে', 'তিন-গুণী'?"

আড্ডা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য সে আমি বহুবার বহু স্থলে নিবেদন করেছি। বহু সিন্ধু পেরিয়ে বহু দেশ ঘুরেছি আড্ডার সন্ধানে—পাপ মুখে কি করে বলি, গিয়েছিলুম লবজো কপচাতে; আখেরে সর্বত্র সর্ব পরীক্ষাতে নাগাড়ে ফেল মেরে মেরে বিলক্ষণ বুঝে গেলুম, আমার যদি জ্ঞানগম্যি কখনো হয়—তা সে ঝুটাই হোক আর সাচ্চাই হোক—সেটা হবে 'আড্ডাতে'—শিক্ষা-মন্ত্রী যে তত্ত্বটি কনফারম করলেন এই অ্যাদ্দিন পরে।...ফের বহু সিন্ধু পেরিয়ে দেশে এসে দেখি, সেই আড্ডার 'বিন্দুটি' খরতাপে বাষ্পপ্রায়।

খানদানী আড্ডা যে জীবন্মৃত সে তথ্য তর্কাতীত। এই যে কলকাতা শহরে ঝাঁকে ঝাঁকে পাঁস্তলা-দস্তলা হামে হাল উঠছে তো উঠছেই এর কটাতে রক থাকে, বৈঠকখানা আছে? রক উঠেছেন ডাক-এ, আর বৈঠকখানার বদলে ড্রইংরুম। এদিকে ক্ষুদে একটি পেগটেবিলের উপর অতি পাতলা ডিমের খোলস-

পরা পরসেলেনের প্লেটে স্ন্যাক, অন্য দিকে ফঙ্গবেনে টিপয়ের উপর বেলজিয়াম কাঁচের ঢাউস ফ্লাওয়ার 'ভাজ'। সোফাতে আরামসে হেলানও দিতে পারবেন না, পাছে মাথার তেল লেগে সোফাভরণ চিটচিটে হয়ে যায়। বত্রিশটি দাঁতের মধ্যিখানে বেচারী জিভকে যে রকম অতিশয় সন্তর্পণে 'হাফিজ, খবরদার' হয়ে নড়াচড়া করতে হয় আপনাকেও করতে হবে তাই। তবে সান্ত্বনা, ভুগন্তি বাড়ীর মালিকেরই সব চেয়ে বেশী। পাছে মহামূল্যবান কোনো জোড়াবাঁধা বস্তুর একটি ভেঙে যায়! বিলিতি মাল—এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না।

গালগল্প যে একেবারেই হয় না, সে-কথা বলা যায় না। তাকে সোয়ারে, মাতিনে (ম্যাটিনি) কনভেরজাৎসিয়োনে [১] যা খুশি নাম দিতে পারেন, এমন কি আজকের দিনের ভাষায় সেমিনার বললেও দোষ নেই—কিন্তু একে আড্ডা নাম দিলে আমাদের নকিষ্যি কুলীন আড্ডার মেম্বারগণ একবাক্যে বলবেন, ক'হা আসমানকা তারা, আর ক'হা পিঠকা (আসলে ভদ্রসমাজে মূল শব্দটা অচল। পাঁচড়া!'

গঙ্গাস্নান কমে যাচ্ছে কেন? পুণ্যবানরা নূতন নূতন ঘাট বানাচ্ছেন না তাই।

আড্ডা কমে গেল কেন? মডারনরা রক বানান না বলে। পাল্লায় পড়ে কেউ কেউ বা প্রাচীন দিনের অগোছালো বৈঠকখানাকে ড্রইংরুমের সাত চাপের কারবন কপি বানাচ্ছেন—দিল্লীতে বলে 'বুড়ো ঘোড়ার গোলাপী ন্যাজ' কিংবা 'বুড়ী দাদীমার হাতে বাহারে মেহদি'।

কিন্তু এহ নিরতিশয় বাহ্য।

গুহ্য সমস্যা অপিচ সরলতম প্রশ্ন: এই যে আমাদের মন্ত্রিবর তরুণদের আড্ডাবাজ করে তুলবেন বলে যমুনা পুলিনে দাশরথির শপথ গ্রহণ করলেন সেটা কি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে কিংবা প্রকৃত আড্ডাবাজের ন্যায় 'ধ্যত্তর ত্তোর অগ্রপশ্চাৎ' হুঙ্কার ছেড়ে?

ঝাড়া আঠারোটি দিন আমাদের আড্ডাটি এই নিয়ে কুস্তি করেছে। নানা প্রশ্ন, বহুবিধ সপ্লিমেনটরি, ততোধিক এফিডেভিট—সর্বশেষে এস্তের 'বুলু পিরিণ্ট' (আমাদের মন্ত্রী মশাই এ বস্তুটি বিলক্ষণ চেনেন) ডাঁই ডাঁই তৈরি হল, অবশ্য আড্ডাধারী মাত্রই জানেন, আমাদের হাইজাম্প লঙ-জাম্প মুখে মুখে।

---

১ প্রথম দুটো শব্দ ফরাসী, তৃতীয়টি ইতালীয়। অর্থাৎ রসালাপ করার তত্ত্বটি বরঞ্চ লাতিন জাত কিছুটা জানে। শুনেছি, অ্যাংলো সেক্শনদের এমন ক্লাবও নাকি আছে যেখানে কোনো মেম্বার কথাটি বলা মাত্র তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। একদা একজন মেম্বার নাকি আগুন লাগা মাত্রই 'আগুন আগুন' বলে চেঁচিয়ে ওঠাতে ক্লাববাড়ি রক্ষা পায়। তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানাবার পর (অবশ্য লিখিতভাবে) খাতা থেকে তাঁর নামটি কিন্তু কেটে দেওয়া হয়।

প্রতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই পাল্টা প্রস্তাব উঠেছিল ; তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন।

যদ্যপি মন্ত্রী মহাশয় এলেমদার ব্যক্তি তথাপি এ-হেন কঠিন গুরুভার তিনি যেন 'ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া'র মত এজমালি বা বারো-ইয়ারী পদ্ধতিতে উত্তোলন করেন। বিগলিতার্থ ;—তিনি যেন

১। একটি কমিশন নিয়োগ করেন।

এ-স্থলে আমার অতিশয় গোপনীয় একটি অভিজ্ঞতা থেকে জানাই, হাই-কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অন্তরঙ্গরূপে চিনি, যিনি একবার একটি আড্ডাবাজ ছোকরাকে অধ্যাপক পদের জন্য সুপারিশ করে জনৈক ভাইস্-চ্যানসেলারের কাছে হুট্ হয়েছিলেন। ভি সি যখন জিভ কেটে বললেন, 'ছোকরা পাঁড় আড্ডাবাজ' তখন তিনি জরডন জলে ধোয়া তুলসী পাতাপানা মুখ করে 'নাঈফ' উত্তর দিয়েছিলেন 'ঐ তো তার আসল এলেম।'

এঁকে কমিশনের চ্যারম্যান করতে পারলে সর্বরক্ষা—সকলং হস্ততলং !

২। ইতিমধ্যে দেখা গেল আরেকটি বিষয়ে আমাদের 'দশদিশি নিরদ্বন্দ্বা'—প্রকৃত আড্ডাপ্রাণ ব্যক্তিকে কাট্যা ফালাইলেও সে কোনো কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে যেতে পারবে না। হরহামেশা হাজামৎ করছি আমরা উইলসন জনসনের, আর আমরা যাবো কমিশনের সম্মুখে !

আড্ডাযজ্ঞের আমরা অভিশপ্ত (পুত, যাই বলুন) ভস্ম। আমরা যেতে পারবো না, নীলকণ্ঠের চড়াই উতরাই পেরিয়ে জটার ভিতর গঙ্গার সন্ধানে।

তিনিই আসতেন। আমি যাঁর প্রতি দু লহমা পূর্বে ইঙ্গিত করেছি তিনিই আসবেন, স্বেচ্ছায় সানন্দে। শ্যামবাজার থেকে শুরু করে আড্ডা মেরে মেরে তিনি হেসেখেলে পেঁছে যাবেন টালিগঞ্জে। রিপোর্ট যা লিখবেন সে এক অভিনব মেঘদূত ! শ্যামবাজার-রামগিরি থেকে টালি-অলকা !

কিন্তু আমরা কমিশনকে বিভ্রান্ত বা প্রেজুডিস করতে চাই নে বলে অত্যধিক বাগবিস্তার থেকে নিরস্ত হচ্ছি। তবে একটি বিষয়ে তাবৎ গৌড়ভূমি যখন বিলক্ষণ সচেতন, সেটি যেন কমিশন বিস্মৃত না হন।

আড্ডা জীবন্মৃত কিনা, যদি হয় তবে তার অমরুতাঞ্জন সঞ্জীবনী সুধা কি, সে নিয়ে তো কমিশন চিন্তা করবেনই—যথেষ্ট সুযোগ পাবেন, আজকাল প্রায়ই বিজলি ভ্রষ্টা রমণীর মত সাঁঝের ঝোঁকে চোখ মারতে মারতে আঁধারে গায়েব হয়ে যায়, তখন আত্ম-অন্বেষণী, বিশ্বভাবনা ভিন্ন গতি কি ?—কিন্তু আমরা আগে-ভাগেই বলে রাখছি ;—

বঙ্গসন্তান চাহে না অর্থ, চাহে না মান, চাহে না জ্ঞান—সে চায় ডিগ্রী !

আড্ডাবাজরূপে সে যদি স্বীকৃতি পায় এবং উমেদার মাত্রেই জানেন—খানদানী আড্ডাতে সীট পাওয়াটাই কী কঠিন কর্ম—তবে সে ডিগ্রী না নিয়ে ছাড়বে না !

এবং ঐ সব বস্তাপচা পি-এচ ডি, ডিফিল, হনোরিস কাউজা, সুম্মা কুম

লাউডে, দকত্যোর অ্যাস লেৎর, ফাজিল-অল-মুহদ্দিসীন, শমশীর-ই-জমশীদই আলিমান, সাংখ্যবেদান্ততর্কচুঞ্চু—এসব উপাধি-খেতাব-ডিগ্রী বিলকুল না-পাশ।

তাহলে সে ডিগ্রীর নাম কি হবে ?

এ-বাবদে ইহসংসারে সর্বাভিজ্ঞ মহাজনকে আমরা চিঠি লিখেছি।

ইনি স্ট্রাসবুরগ্ শহরের সরকারী উপাধিদাতা।

শহরের সদর দেউড়ি দিয়ে ঢুকলেন এক অশ্বারোহী—ইয়া মোছ, ইয়া তলওয়ার।

সামনেই সদররাস্তা-বুলভার জোড়া একটা টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে ফ্রক-কোট, টপ-হ্যাট, আতশী-কাঁচের চশমা পরা এক—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—সরকারী কর্মচারী। আমাদের আই এ এস গোছ।

হুংকারিলেন, 'তিষ্ঠ !'

'? ? ?'

'আপনি ডক্টরেট উপাধি ধরেন ?'

অশ্বারোহী অবতরণ পূর্বক সবিনয় ঃ 'আজ্ঞে না।'

গম্ভীর নিনাদ ঃ 'এ শহরে ডকটরেট না থাকলে "প্রবেশ নিষেধ"।'

কাতর রোদন ঃ 'তাহলে উপায় ?'

মোলায়েম সান্ত্বনা ঃ 'উপায় আছে বই কি। এই তো হেথায় টেবিলের উপর রয়েছে সর্ব গোত্রের উপাধিপত্র। আপনার দেশ ?'

আশাভরা কণ্ঠ ঃ 'এজ্ঞে, লুক্সেম-বুরগ্।'

নুড়ি-চাপা ভিন্ন ভিন্ন ডাঁই থেকে একখানা করকরে কাগজ তুলে নিয়ে ঃ 'আ-া-সুন, আসুন, স্যর। বিতে শ্যোন, প্লীজ !)। দক্ষিণা ঃ পঞ্চাশৎমুদ্রা।'

বিগলিত আপ্যায়িত কণ্ঠ ঃ 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ (ডাংকে শ্যোন, মেনি থ্যাংকস)। এই যে।'

অশ্বারোহী নগরকেন্দ্রে প্রবেশ করতে করতে ভাবলে, 'আমার এই অশ্বিনীটি আমার বিস্তর সেবা করেছে। এর জন্য একটা হনোরিস কাউজা ডক্টরেট আনলে মন্দ হয় না।' ঘোড়া ঘুরিয়ে উপাধিদাতার কাছে এসে তার সদিচ্ছা জানালে। আই এ এস দুঃখ-ভরা কণ্ঠে বললেন, 'ভেরি ভেরি সরি, হের ডকটর ! এ শহরে ডকটরেট দেওয়া হয় শুধু গাধাদের। ঘোড়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।'

আমরা এঁরই উপদেশ চেয়ে পাঠিয়েছি। আমেন !

পাসপরট্

গল্পটি পূব বাঙলার বিশেষ একটি জেলা সম্বন্ধে। মনে করুন তার নাম 'লোহাভরা'।

পূর্ব বাঙলার সাধারণ জন মাত্রেরই দৃঢ়তম বিশ্বাস 'লোহাভরা' জেলার লোকমাত্রই অতিশয় ধুরন্ধর। এদের কেউ একা বা দল বেঁধে ঢাকা স্টেশনে নামলে বিদগ্ধ, হাজির-জবাব কুট্টি পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে এদের রীতিমত সমঝে চলে। সর্বশেষে বলা হয়, ঐ জেলাতে কখনো দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানে স্বয়ং শয়তান সে-জেলার যে প্রধান প্রতিভূ সে পর্যন্ত মাছি ধরে ধরে খায়—কারো গোলায় হাত দিতে হিম্মৎ পায় না।

তামাম পূব বাঙলার চাণক্য-মাকিয়াভেলিরা যে এদের সম্মুখীন হলে হুঁশিয়ারির খাতিরে তদ্দণ্ডেই তাঁদের কানাকড়িটি পর্যন্ত স্টেট ব্যাংকে জমা দিয়ে আসেন সে তত্ত্বটি লোহাভরাবাসী বিলক্ষণ অবগত আছে বলে তারা সহজে আপন বাসভূমির খবর দেয় না ; লোহাভরার পার্শ্ববর্তী কোনো এক জেলার বাসিন্দা বলে পরিচয় দেয়।

* * *

পারটিশনের ফলে কলকাতা এবং ঢাকাতেও নানা নয়া নয়া সমস্যা দেখা দিল।

ঢাকা সেকরেটারিয়েটে খবর এল আমেরিকা থেকে—ভারতের বিস্তর জানোয়ার-দরদী মহাজনরা বাধা দিচ্ছেন, বাঁদর যেন মারকিন মুল্লুকে চালান না দেওয়া হয়, মারকিনরা নাকি ডাক্তারী এক্স্পেরিমেণ্টের অছিলায় এদের উপর পাশবিক অত্যাচার (ভিভিসেকশন) করে। মারকিন ডাক্তাররা তাই ঢাকাকে অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যদি ন্যায্যাধিক মূল্যেও মর্কট সরবরাহ করেন। পশ্চিম ও পূব বাঙলার মর্কটে মর্কটে নাকি রত্তিভর ফারাক নেই এবং এরা কোনো প্রকারের মাইগ্রেশন সারটিফিকেট নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছে বলে জানা যায়নি !

সংশ্লিষ্ট সেকরেটারি মহোদয়—তিনিই আমাকে সংক্ষেপে ইতিহাসটি কীর্তন করেন—তাঁর দফতরের ঝানু-ঝান্ডু এসিসটেনট তস্য এসিসটেনটদের এত্তেলা দিয়ে তাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা ফরেন ইক্স্চেনজের সাতিশয় গুরুতর ব্যাপার !'

দফতর ভুশুণ্ডিরা এক বাক্যে উত্তর দিলেন ঃ 'বাঁদর ধরার কৈশল অতিশয় প্যাঁচাল। এর স্পেশালিস্ট ছিলেন হিঁদুরা। তাঁরা ইণ্ডিয়া চলে গেছেন।'

অনেক তর্কাতর্কির পর স্থির হল জেলায় জেলায় খবরের কাগজে যেন নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি ফলাও করে ছাপানো হয় ;

বাঁদর ! বাঁদর !! বাঁদর !!!

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মারকিন-মুল্লুকের অনু-

রোধে এই দেশ হইতে জীবন্ত বাঁদর আমেরিকায় রফতানী করা হইবে। তজ্জন্য উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হইবে।

স্বাক্ষর সেকরেটারি
সবুজপুরা, ঢাকা-১১।

আমি সচিব মহোদয়কে শুধালাম, 'উত্তম ব্যবস্থা। তারপর?'

বললেন, 'যেই না বিজ্ঞাপনটি লোহাভরা জেলায় বেরিয়েছে অমনি দেখা গেল, তাবৎ জেলার লোক লুঙ্গি ফেলে ফেলে গুয়া গাছের ডগায় চড়ে বসে আছে। সবাই মারকিন মুল্লুকে যাবে। মুশকিল! জানেন তো, লোহাভরার লোকের যা কাত্তিকের মত চেহারা, তাতে কোন্‌টা বাঁদর কোন্‌টা মানুষ ঠিক ঠাহর করা—'

* * *

ইতিহাস-দার্শনিক শ্রীযুক্ত টইনবি বলেছেন, দেশকালপাত্রের যোগাযোগের ফলে নিত্য নিত্য প্যাটারন্‌ তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু সেগুলো আকছারই প্রাচীন প্যাটারনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তফাত ডীটেলে।

অতএব, যখন সবিশেষ অবগত আছি, উভয় বাঙলার দেশকালপাত্রে ফারাক যৎসামান্য তবে পূর্বোল্লিখিত পূর্ববঙ্গীয় প্যাটারনের পুনরাবৃত্তি পশ্চিমবঙ্গে প্রতিভাসিত হবে না কেন? আমরা কিসে কম?

অবশ্য স্বীকার করছি ডীটেলে উনিশ-বিশ হওয়া বিচিত্র নয়।

এবং তাই হয়েওছে।

কারণে, কিংবা অকারণে, অথবা বলতে পারেন, কিসমতের মারে এদেশে পাশপরট্‌ যোগাড় করাটা ক্রমশ কঠিন হতে কঠিনতর হতে লাগলো, স্বরাজ পাওয়ার অল্প কিছুকালের মধ্যেই। শেষটায় হাল এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে তখন কেউ আর নিতান্ত বিপদে না পড়লে ঐ সাপের পায়ের সন্ধানে বেরুতো না। অবশ্য লক্ষপতি, কালোবাজারী, বিদেশে যার আচার-করা ফরেন কারেন্‌সি আছে তাদের কথা আলাদা। এসব কাহিনী দফে দফে বয়ান করার প্রয়োজন নেই। খবরের কাগজে অনেক খবর বেরোয় সাদা কালিতে ছাপা। সেগুলো পড়ার জন্য একটি তৃতীয় নয়নের প্রয়োজন—ইংরিজীতে যাকে বলে টু রীড বিটুইন দ্য লাইনজ। যাঁদের সেটা আছে—আমার নেই—তাঁরা আপনাকে অনায়াসে দুকলম শেখাতে পারেন। সে কথা থাক।

ইতিমধ্যে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল।

লোকটার নিশ্চয়ই কোমরের জোর, কড়ির ওজন ও বুকের পাটা আছে, নইলে সরকারের সঙ্গে লড়তে যাবে কেন? কটা আদালতে হারার পর লোকটি সুপ্রীম কোরটে পেঁছিল জানি নে। সেখানে প্রধান বিচারপতি (তৎকালীন) শ্রীযুত সুব্বা রাও যা রায় দিলেন তার বিগলিতার্থ, কোনো ভারতীয় যদি আপন দেশ ছেড়ে বিদেশে যেতে চায় তবে তাকে ঠেকাবার এখ্‌তেয়ার ভারত সরকারের নেই। সেটা হবে সংবিধান-বিরুদ্ধ।

বাস্‌। আর যাবে কোথা।

আমাগো দ্যাশে কয়, একে তো ছিল নাচিয়ে বুড়ী তার উপর পেল মৃদঙ্গের তাল।

পূব বাঙলার প্যাটারনে এস্থলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গাছের মগডালে না চড়ে মেয়েমদ্দে আণ্ডাবাচ্চায় ধাওয়া করলে পাসপরট ফরমের জন্য। বাঁদরের জন্য ও-বস্তুর প্রয়োজন নেই—তাকে খাঁচায় পুরে প্লেনে ঢুকিয়ে দিলেই হল। মানুষের বেলা জাহাজের কাপতান, প্লেনের টিকিট বেচনেওয়ালা, ভূপৃষ্ঠে বর্ডারের উভয়পক্ষের পুলিস শুধোত, অভিজ্ঞান-পত্রটি কোথায় ?

ইতিমধ্যে নাকি আরো দুজন জজ সাহেবের রায় বেরলো ঃ আইনত নাকি পাসপরটের কোনো প্রয়োজনই নেই। এটা আমি বুঝতে পারিনি, কাজেই এটি নিয়ে তড়িঘড়ি আলোচনা করা আমার শোভা পায় না।[১] পয়লা তো ঝামেলাটা বুঝে নিই।

উপস্থিত একটি কথা বলে রাখি।

আইন অবশ্যই সর্বজনমান্য। কিন্তু কার্যত কি হয় ?

আইনত (ডেজুরে) পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই তার নাগরিককে অবাধ চলাফেরা করার ক্ষমতা দেয়, কিন্তু কার্যত (ডে ফাকটো) কোনো দেশ দেয় বলে জানি নে।

এই তো হালের কথা। মার্কিন দেশে যে জোর গণতন্ত্রের রাজত্ব সে-কথা আমরা সবাই জানি। অন্তত সেই নিয়ে তাদের বড়-ফাটাইয়ের অন্ত নেই। দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েৎনাম সর্বত্রই তাঁরা যে গণতন্ত্র তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিচ্ছেন একথা তাঁরা বিশ্ববাসীকে অহরহ শোনাচ্ছেন। সত্যি হতে পারে, মিথ্যা হতে পারে, কিংবা হয়তো মারকিনগণ নিজেদের এটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন। এবারে সেই হালের কথাতেই আসি।

দার্শনিক বারট্রানড রাসল্ কিছুদিন হল স্থির করলেন, একটা বেসরকারী আদালত বসিয়ে সেখানে ভিয়েৎনামে 'মারকিন পাপাচারের' বিচার করা হবে। খোলা আদালতে যে রকম যে-কোনো মানুষ, হয় আসামী নয় ফরিয়াদি পক্ষে দাঁড়াতে পারে বা আদালতের দোস্ত (আমিকুস কুরিএ) হিসেবে নিরপেক্ষভাবে কথা বলার হক্ক ধরে—রাসলের বেসরকারী বে-আইনী (বা অ-আইনীও বলতে পারেন) আদালতেও সেই ব্যবস্থা থাকবে।

এ আদালতে হাওয়া কোন্ দিকে বইবে সেটা ঠাহর করার জন্য হ্যামলেট নাটকের ভূতের প্রয়োজন হয়নি। তৎসত্ত্বেও মার্কিন জুজুর ভয়ে সব রাষ্ট্রই মুখে কাঁথা চাপলেন। অর্থাৎ সে আদালতের জন্য আসন দিতে (ভেনু) রাজী হন না—'তোমার আসন পাতবো কোথায়' হে অতিথি'—অবশ্য ভিন্নার্থে।

১ কাগজে রিপোর্ট বেরিয়েছে ঃ "Giving their reasons the minority said that there was no compulsion of law that a passport must be obtained before leaving India." আমারই মত জনৈক সম্পাদক ব্যাপারটা বুঝতে পারেননি এবং ঐ নিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছেন।

শেষটায় সরল সুইডেন লাজুক কনেটির মত কবুল পড়লো—এবং আখেরে পস্তালো, কিন্তু সে কথা থাক।

সেই 'উয়োর ক্রাইমস ট্রিবুনালে' সাক্ষ্য দিলেন ৭ই মে তারিখে এক ভদ্রলোক—এঁর নাম রাল্‌ফ্‌ শ্যোমান। মারকিন নাগরিক, এবং রাসলের খাস নায়েব (পারসনাল সেকরেটারি)। ভিয়েৎনামে মারকিনদের 'পাশবিক অত্যাচারে'র দফে দফে বয়ান দিয়ে—যার সঙ্গে এ রচনার কোনো সম্পর্ক নেই—তিনি বলেন, তিনি স্বয়ং হানয় গিয়েছিলেন এবং অনুমান করেন, যেহেতু তিনি ঐ জায়গায় মারকিন সরকারের বিনানুমতিতে গিয়েছিলেন তাই সে-সরকার এক্ষণে তাঁর পাসপর্ট রদ করবে (অর্থাৎ বাতিল বা বাজেয়াপ্ত করে নেবে)।

যদি করে তবে সেটা আইনসঙ্গত কিনা, সেটা বিচার করার মত আইন জ্ঞান আমার কেন, বহু ধুরন্ধরেরও নেই।

(১) এই দেখুন না, কেন্দ্রীয় সরকার পাসপর্ট্‌ বাবদে যে আইন এতদিন মেনে চলতেন তারও একটা রেজোঁ দেৎর্‌ (raison detre) নিদেন একটা ভিত ছিল (২) তিনজন মহামান্য জজ সেটা অস্বীকার করলেন (৩) অন্য দুজন মহামান্য জজ ঐ তিনজনের সঙ্গে একমত হলেন না। এদিকে পাসপর্ট্‌ দরখাস্তের বন্যায় হিল্লী দিল্লী যায়-যায়। সেটা ঠেকাবার জন্য সরকারকে বাধ্য হয়ে জারী করতে হয়েছে, (৪) অরডনন্‌স্‌—সাময়িক আইন। এ আইনের আয়ুষ্কাল মেরে কেটে ছ'মাস। ইতিমধ্যে সরকার এই অরডনন্‌স্‌টি মেজে ঘষে (৫) বিল রূপে পরিবর্তন করে পেশ করবেন পারলিমেনটের সমুখে।

তখন লাগবে ধন্ধুমার, ইংরিজীতে যাকে বলে দ্য ফ্যাট উইল বি ইন দ্য ফায়ার। উপরের প্যারায় আমি পাঁচ রকমের দৃষ্টিবিন্দু পরিবেশন করেছিলুম—এবারে পারলিমেনটে জুটবে এসে আরো পাঁচশ!

আমার ঘাড়ে কি ৫০৬টি মাথা যে আমি রা'টি কাড়বো!

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

পারলিমেনটে বিস্তর বেদরদ ধোলাইরের পর ইস্ত্রি হয়ে বেরবেন বিলটি তখন আইনরূপে।

আমরা শঙ্খ বাজাবো হুলুধ্বনি দেব।

কিন্তু হায়, এ পোড়ার সংসারে শান্তি কোথায়? এই নয়া তুলতুলে তুলোয়-ভরা তাকিয়া-পারা আইনটার উপর ভর করে যে দু'দণ্ড জিরিয়ে নেবেন তারই বা মোকাফুরসৎ কোথায়?

আবার এক 'পাষণ্ড' হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—সে আইনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে দাঁড়াবে।

এবং এবারও যদি মহামান্য বিচারপতি··· ?

তা হলে শুরুসে, ফিনসে, সেই ঔড্র পদ্ধতিতে ঃ—

ক-রে কমললোচন শ্রীহরি,

খ-রে খগ-আসনে মুরারি

গ-রে··· !

আড্ডা—পাসপরট্

'এত দেরিতে যে ?'

শোনো কথা ! আড্ডাতেও আসতে হবে পাঙট্যুয়ালি ?

'হ্যাঁ, সেই কথাই তো হচ্ছে। তুমি তো হামেশাই পাঙট্যুয়ালি অন-পাঙট্যুয়াল।'

আড্ডা প্রতিষ্ঠানের কাশীবৃন্দাবন কাইরো শহরে। এ সম্বন্ধে আমার গভীর গবেষণামূলক একাধিক গেরেমভারী প্রবন্ধ খানদানী অকসব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাত্মক বনেদী ত্রৈমাসিকে বেরুবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ কর্তাদের খেয়াল গেল যে আমার ঐ সাতিশয় উচ্চপর্যায়ের লেখাগুলো যদি একবার তাঁদের কাগজে বেরয় তবে সে-কাগজের মান বা স্ট্যান্ডার্ড চড়াকসে এমনি সুপুরি গাছের ডগায় উঠে যাবে যে আর পাঁচজন লেখক সে মগডালে উঠতে পারবে না। অথচ পয়লা নম্বরী পাঠকমাত্রই আমার উচ্চাঙ্গ লেখায় পেয়ে গেছেন তাজা রক্তের সন্ধান, হয়ে গেছেন ম্যানঈটার। সম্পাদকমণ্ডলী তখন আর পাঁচজনের লেখা বাসি মড়া পাচার করবেন কি প্রকারে ! একবার ভাবুন তো, স্বয়ং কবিগুরু যদি কোনো সপ্তাহের দেশ পত্রিকায় 'ট্রামেবাসে', 'সুনন্দর জারনল' এবং 'পঞ্চতন্ত্র' সব কটাই লেখেন, তারপর আমাদের তিনজনের—এক কথায় সৈয়দ সুনন্দ করের কি হাল হবে ? পচা ডিম ছুঁড়বে আমাদের মাথায় পাঠকগুষ্টি—কাগজ হয়ে যাবে বন্ধ। সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, লেখক সবাইকে বসতে হবে রাস্তায়। আমাদেরও তো কাচ্চাবাচ্চা আছে। ডাল-ভাত যোগাতে হয়।

আমার অত্যুৎকৃষ্ট রচনার মূল্য অকসব্রিজের কর্তৃপক্ষ বুঝুন আর নাই বুঝুন—এটা কিন্তু ভুললে চলবে না তারা ইংরেজ। ইংরেজ ব্যবসা বোঝে। নেপোলিয়ন একদা বলেছিলেন 'নেশন অব শপ-কীপারজ্'—এখন বলা হয় 'নেশন অব শপলিফটারজ্'[১] (ভদ্রবেশী 'দোকান-লুটেরা')। ব্যবসা বোঝে বলেই তারা আমার 'লা-জবাব' প্রবন্ধগুলো ইনশিওর করে সবিনয়, সকাতর ফেরত পাঠায়—ছাপালে তারা, তাদের আড্ডাবাচ্চারা বেবাক-আড্ডাহীন হবে সেই কারণ দর্শিয়ে।

তখন করি কি ?

---

১ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন ঃ আশকথা পাশকথা (আড্ডার সেটা প্রাণধর্ম) না শুনে যে-সব বে-আড্ডাবাজ অথচ গুণী পাঠক মূল গল্পের খেই ছিনেজোঁকের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চান তাঁরা যেন ফুটনোটগুলো না পড়েন ; কণামাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। অবশ্য তার অর্থ এও নয়, যে, মূল লেখা না পড়লে তাঁর সর্বনাশ হবে।

'শপ-লিফটারজ্' কথাটা ইংরেজের উপর প্রথম আরোপ করেন ছদ্মনামধারী সরস লেখক 'সাকী'।

কথিত আছে, একদা লণ্ডনে এসে মার্কিন হেনরি ফোরড দাবড়ে বেড়াচ্ছিলেন খাসা রহিসী রোলস রইস। পঞ্চম জর্জ তাঁকে শুধোলেন, 'এ কি মিসটার ফোরড! আপনি বিজ্ঞাপনে বলেন "ফোরড গাড়ি দুনিয়ার চীপেস্ট এবং বেস্ট গাড়ি", তবে রোলস চড়েন কেন?' ফোরড বাও করে বললেন, 'আমার ম্যানেজারকে বহুবার বলেছি, আমাকে একখানা ফোরড গাড়ি দিতে। তার মুখে ঐ এক কথা—ফোরড গাড়ি তৈরি হতে না হতেই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হয়ে যায়; সে খদ্দের সামলাবে না মালিককে গাড়ি দেবে। খদ্দের মোর ইমপরটেনট দ্যান মালিক। অতএব, হুজুর, বাধ্য হয়ে বাজারের সেকেনড বেস্ট্ মোটর—রোলস—কিনেছি।'

গল্পটি মিশরের পিরামিডের চেয়েও প্রাচীন—যে পিরামিডের দিকে পিছন ফিরে আমরা কাইরোর কাফেতে বসি। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল কাহিনীর ভালে ঐ তো চন্দন-তিলক! নিত্য নিত্য নব নব ফাঁড়া গরদিশে সাক্ষাৎ মুশকিলআসান।

আমি জানতুম, অকসব্রিজ ত্রৈমাসিকের পরেই সেকেণ্ড বেস্ট্ কাগজ 'দেশ'।

সেখানে পাঠালুম। ছাপা হয়ে গেল (সম্পাদক-ম্যানেজার হয়তো সোল্লাসে ভেবেছিলেন, ওটা পয়সা কামানেওলা বিজ্ঞাপন), বই হয়েও বেরুলো। পাঠক সাবধান! চীনেবাদামের ঠোঙা কদাচ অবহেলা করবেন না। একমাত্র ঐ কাগজেই একখানা তাবল্লোক মল্লিখিত কাইরোর কাফে আড্ডা সম্বন্ধে নিবন্ধগুলি পড়তে পায়।

অতএব কাইরোর কাফে-আড্ডার সবিস্তর বর্ণনা নূতন করে দেব না। শুধু এইটুকু বলবো কাইরোর কাফের তুলনায় আমাদের আড্ডা, ইংরেজের ক্লাব, জরমানের পাব, কাবুলির চা খানা, ফরাসীর বিস্ৎরো—এস্তেক অবিমুক্ত ক্ষেত্র কাশীর জমজমাট ঘাট—সব শিশু শিশু। বৈজ্ঞানিক বলেন, আমাদের জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাটে শয্যায়—নিদ্রায়। কাইরোর কাফে হাসবে—কুট্টির ঘোড়ার মত—আস্তে বলুন। তাদের জীবনযাত্রা একপ্রকার ঃ—

সকাল ৬টা থেকে ১০টা কাফে=৪ ঘণ্টা। ১০টা থেকে ১টা দফতর। ১টা থেকে ২টা কাফে=১ ঘণ্টা। ২টা থেকে ৫টা দফতর, ৫টা থেকে ১২টা কাফে=৭ ঘণ্টা। ১২ টা থেকে ৬টা ভোর নিদ্রাযোগে গৃহবাস অতিশয় অনিচ্ছায়।

একুনে, সর্বসাকুল্যে কাফেতে ১২ ঘণ্টা। জীবনের এক-তৃতীয়াংশ না ঘণ্টা! হোলি রাশার সেই ফাটা ঘণ্টা যেটা কখনো বাজেনি।

কাইরো সজ্জনের জীবনের হাফ কাটে কাফেতে—অবশ্য বেটার হাফ-কে বাড়িতে রেখে! আর ছুটিছাটা, স্ট্রাইক—রাজা ফারুকের মেহেরবানীতে হরবকৎ লেগেই আছে[২]—লটারি উত্তোলন দিবসচয় যদি হিসেবে নেন তবে সেই

---

২ আমার কাইরো-কাফে আশ্রম ঐ সময়ে।

প্রথম প্রবন্ধের প্রথম তত্ত্বে ফিরে যাই :—বাড়ি নিয়ে কি গুলে খাবো, পারেন তো দিন একটি নন্‌স্টপ-আড্ডার সন্ধান। তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন উঠতে পারে, কাইরোতে লোক বাড়ি বানায় কেন? মিশরবাসী তখন বিদেশীকে বুঝিয়ে বলে, প্রাচীন যুগে তারা আদৌ বানাতো না, বানাতো গোরের জন্য স্রেফ পিরামিড—চোখ মেললেই এখনো চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কই সে যুগের বাড়ি? বাড়ি বানানোর বদ অভ্যাস বাজে খরচা তারা শিখেছে হালে, ইংরেজর কাছ থেকে, তার 'হোম' নাকি তার কাসল (অ্যাণ্ড হি ইজ দ্য টাইরেণ্ট ইনসাইড)। আর বাড়ি বানানোটাই যদি এমন কিছু জম্বর মহৎকর্ম, বাবুইকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলা উচিত, ওর মত নিটোল, নিখুঁত বাড়ি বানিয়েছে আর কেউ? ছাত ধসে না, ট্যাকশো দিতে হয় না।—ইত্যাদি।[৩]

তা সে থাকগে, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় চলে এলুম, ঐ তো আড্ডার দোষ।

কাইরোর কাফে আমাকে বোঝাচ্ছিল, আমি পাঙট্যুয়াল, অর্থাৎ কথা দিয়ে থাকি ঘণ্টায় আসবো বলে, আর আসি কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ঘণ্টায় অর্থাৎ পাঙট্যুয়ালি···ইত্যাদি।

এরপর কাফে বলে কিনা, আমি নাকি অন্-পাঙট্যুয়ালও বটে!

সেটা কি প্রকারের?

টুটেনখামেন-এর আমল থেকে এদেশের অলিখিত আইন, মীটিং যদি ধার্য হয়ে থাকে সাতটায়, তবে শুরু হয় আটটায়, দিল-হামেশাই হচ্ছে। আমি নাকি উপস্থিত হই কাঁটায় কাঁটায় সাতটায়। এটা নাকি অন-পাঙট্যুয়াল পাঙট্যুয়ালিটি।

সেটা নাকি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার একচেটে কারবার। নীলনদে কখন প্রচুর জল আসার ফলে কাফের সকলে গায়ে রেশমের স্যুট চড়ায়, কখন মাত্র কৌপিনটুকু সম্বল; কখন সাহারায় ঝড়ের ঠেলায় ছ ফুট বালি জমে বাড়ির দেউড়ি বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারই ফলে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক পরিস্থিতি—কাফেতে আসার জোটি নেই—এসবের হদীসান্বেষীরা নাকি পরবর্তীকালে আবহাওয়া দফতরের ডিরেকটার জেনরেল হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের টার্ক—(তুর্কী বললে মানুষটাকে ভদ্র বলে মনে হয়) —ইংরিজি অর্থে টার্ক, সদস্য তওফীক এসে উপস্থিত।

পয়লা নম্বরের ধুরন্ধর এবং গোঁয়ার। আমাকে শুধোলে 'কি বাবাজী, খানিকক্ষণ আগে তোমাকে দেখলুম এক আজব চিড়িয়ার সঙ্গে—ওহেন মাল কস্মিন্‌কালে বাবা, এই বহুতর চিড়িয়ার শহর কাইরোতেও দেখিনি!

---

৩ ভারতের বাইরের বেদে মাত্রেরই বিশ্বাস তাদের আদিমতম পিতৃভূমি ভারতবর্ষ। তা হতেও পারে। এবং তাদের আর একটি বিশ্বাস, ভারতবর্ষ আগাপাস্তলা বেদেদের দেশ, সবাই ঘুরে বেড়ায় সুতরাং কেউ বাড়ি-ঘরদোর বাঁধে না!

ব্যাপারটা কি ?'

আমি বললুম, 'আর কও কেন ? সেই কথাই তো এদের বোঝাতে যাচ্ছিলুম। সমস্ত বৈকেলটা কেটেছে ব্রিটিশ কনসুলেটে—বুনো হাঁস ধরার চেষ্টা কখনো করেছ ? তাইতেই হেথায় হাজিরাতে দেরি ?'

'বুনো হাঁস ! সে আবার কি ?'

'নয় তো কি ? কিন্তু আমার সঙ্গে যে চিড়িয়া দেখেছিলে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন চীজ। আমার দেশের লোক।'

কাফে অবাক। 'সে কি ? আমরা তো জানতুম, তুমি কোথাকার সেই বাঙ্গলা না, কি যেন বলে, সেই দেশের একমাত্র লক্ষ্মীছাড়া এসেছ এদেশে।'

'সে কথা পরে হবে। উপস্থিত শুধোই, বিদেশে-বিভুঁইয়ে কেউ কখনো পাসপরট্ হারিয়েছ ?' সকলেই একসঙ্গে শিউরে উঠলেন, কারো কপালে ঘাম দেখা দিল, কেউ বা চোখ বন্ধ করে আল্লারসুলের নাম স্মরণ করছেন।

পাঠককে বুঝিয়ে বলি, এ সংসারে নানান ভয়াবহ অবস্থা আমরা দেখি, কাগজে পড়ি,—শ্রবণ বা স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান না হয় বাদই দিলুম। কিন্তু এ সব কটাকে হার মানায় মাত্র একটি নিদারুণ দুর্দৈব—বিদেশে পাসপরটি হারানো।

ছুটুন কনস্যুলেটে। তারা কানই দেবে না। লিখুন আপন দেশে। নো রিপলাই। কিংবা শুধোবে, পাসপরটের নম্বর, ইস্যুর তারিখ গয়রহ জানাও। সেগুলো আপনি ডাইরিতে টুকে রাখেননি। আবার কনস্যুলেটে ধন্না। সঙ্গে নিয়ে গেছেন দু-পাঁচজন ভারতীয়। তাঁরা হলপ খেলেন, আপনি যে ভারতীয় সে বাবদে তাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। কনস্যুলেট বলবে, মাডাগাসকারের বিস্তর লোক ভারতীয় ভাষার কথা কয় ; তাই বলে তারা ভারতীয় ? ইনডিয়ান নেশনালিটির প্রমাণ কোথায় যে আমরা নয়া পাসপরট্ দেব ? বের করুন বার্থ সারটি'ফকেট, এবং প্রমাণ করুন সেটা আপনারই।

হাজারোগণ্ডার হাবিজাবী হেনাতেনা চাইবে। এবং তাদের চাওয়াটা সম্পূর্ণ ন্যায্যতঃ হক্কতঃ। না চাইলে দুনিয়ার যত ভাগাবণ্ড ভ্লাডিভসটক থেকে আলস্কা—এসে কিউ লাগাবে একখানা করকরে, ঝাঁ চকচকে, সোঁদা সোঁদা গন্ধওলা ইনডিয়ান পাসপরটের লোভে। এক ঝটকায় হয়ে যাবে ইনডিয়ান ন্যাশনাল, সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে মহারাণীর মোলাকাৎ চাইবে। যে বেচারাকে টারক তওফীক দেখেছিল পথিমধ্যে, সে সত্যি সিলেটের লোক।

আমি গিয়েছিলুম কনস্যুলেটে, প্যালেসটাইন যাবার জন্য অনুমতির ('ভিজার') সন্ধানে। সেই জরাজীর্ণ লোকটাকে জবুথবু হয়ে এক কোণে বসে থাকা অবস্থাতে দেখেই বুঝে গেলুম লোকটা সিলেটি।

এবং তাই। আমার মুখে সিলেটি শুনে ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে। আমি একপাল লোকের সামনে মহা অপ্রস্তুত।

ব্যাপারটা সরল, কিন্তু পরিণামে হয়ে গেছে বেজায় জটিল। মাসখানেক পূর্বে আলেকজান্দরিয়া বন্দরের কিছু দূরে একটা জাহাজডুবি হয়—ঐ কোনো

গতিকে বেঁচেছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায়, গায়ের চামড়াও কিছুটা পুড়েছে। পাসপরট্ তো সাপের মণি—রক্তিভর ডকুমেণ্ট তার কাছে নেই। আর ঐ একমাত্র 'সিলট্যা' ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় একটি শব্দও সে বুঝতে পারে না।

কুল্লে কাফে মাথা নেড়ে সায় দিলে, ব্যাপারটা সঙ্গীন।

ভাগ্যিস, ডেপুটি কনসালটি ছিলেন আমার পরিচিত—অতিশয় অমায়িক খানদানী ইংরেজ ভদ্রলোক। আমার আপন কাজ শেষ হয়ে গেলে খালাসিটার কথা পাড়লুম। সায়েব মাথা নেড়ে বললেন, 'বিলকুল হুমবগ্। আমি কলকাতায় কাজ করেছি পাঁচটি বৎসর। বাঙলা শুনলে বেশ বুঝতে পারি। ও যা বললে সে তো বাঙলা নয়।'

মনে মনে আমাকে বলতে হল, 'পোরা কপাল আমার।' সাহেবকে বললুম 'ওকে একটু ডাকলে হয় না?' সায়েব সদাশয় লোক, বললেন, 'আলবৎ।'

লোকটা আসামাত্রই আমি চালালুম তোড়সে সিলেটি। কিঞ্চিৎ কটুকাটব্যের কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে। উদ্দেশ্য তাকে একটু অতিশয় তাতিয়ে দেওয়া, নইলে যে রকম ন'সিকে ভিলেজ-ইডিয়ট, পেটে বোমা মারলেও··। দাওয়াই ধরলো। কাঁইকুঁই করে বলে গেল অনেক দুঃখের কাহিনী—চোখে সাত দরিয়ার নোনা-জল। মিনিট পাঁচেক চললো 'রসালাপ'। সায়েব খালাসীকে বললেন, 'টুম্ যাও।' আমাকে শুধোলেন, 'এও বাঙলা'? আমি বললুম, 'লণ্ডনের সঙ্গে উত্তর স্কটল্যাণ্ডের ভাষায় যে মিল—এ বাঙলার মিল কলকাত্তাইর সঙ্গে তার চেয়েও কম।'

এরপর সায়েব যা বললে, তার থেকে পরিষ্কার বুঝে গেলুম, লোকটি সত্যকার ডিপলমেট। বললেন, 'দু-একটা শব্দ যে একবারই বুঝতে পারিনি তা নয়। তবে কি জানো, ব্যাবু, ব্যাপারখানা আসলে কি? কোনো বিশুদ্ধ স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষা··যেমন মনে করো প্যারিসের ফরাসী, কিংবা ধরো লণ্ডনে প্রচলিত খানদানী ঘরের ইংরেজী—সেটা শেখা কিছু অত্যধিক কঠিন কর্ম নয়। হাজার হাজার রুশ, পোল, হাঙগেরিয়ান চোস্ত ইংরিজী বলে, খাসা ফরাসী কপচায়—কার সাধ্যি বলে কোন্‌টা কার মাতৃভাষা নয়—এবং প্রসঙ্গত বলি, এরাই হয় বেস্ট স্পাই। কিন্তু মশাই, বিশুদ্ধ গাঁইয়া ডায়লেকট রপ্ত করাটা বড়ই কঠিন, প্রায় অসম্ভব। লণ্ডনের কটা খানদানী ইংরেজই বলতে পারে খাঁটি ককনি?'

সায়েবটি ছিল একটু দুঁদে টাইপ। খালাসিটার জন্মভূমির গ্রাম থানায় চিঠি না লিখে রেডটেপিজেমের মূর্ত প্রতীক 'এনকোয়ারি' না করেই আপন জিম্মায় ছেড়ে দিলে একখানা পাসপরট্।

নইলে ঐ হতভাগা ক'মাস ধরে কে জানে, হয়তো বারো বছর ধরে আপিসে দফতরে ধন্না দিত, রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াতো, খেত কি, মাথা গুঁজতো কোথায়?

আর ইতিমধ্যে যদি কোনো সমধিক কর্মনিষ্ঠ তথা অত্যুৎসাহী উৎকোচাশ্রয়ী মিশরী পুলিসম্যানের নজর পড়ে যেত? কাঁধে খাবলা মেরে শুধতো 'তুমি তো বিদেশী বলে মনে হচ্ছে হে—নিকালো বাসবর' (আরবীতে 'প' নেই বলে 'ব'

আদেশ, এবং শব্দটি আরবরা ফরাসী থেকে নিয়েছে বলে শেষের 'টি' উচ্চারিত হয় না—একুনে পাসপরট্ উচ্চারিত হয় 'বাসবর', বা 'বাসাবর') তাহলে ?

শ্রীঘর। তাতে যে আমাগো সিলট্যা মোতিমিয়ার খুব একটা ভয়ংকর আপত্য (আপত্তি শব্দের সিলেটি রূপ) আছে তা নয়; জাহাজের কয়লাঘরের কারবালায় কারবার করছে যে লোক তার পক্ষে কাইরোয় কারাগার করীমা বখশায় বর হাল-ই-মা—আল্লার কৃপা তার উপরে এসেছে।

কিন্তু ততোমধ্যে তার নয়া বাসবরের জন্যে যেটুকু ধর্না দেওয়া, তদবির করা সেটুকুনই বা করবে কে ? অবশ্য আখেরে এস্থলে তদবির করা না করা—বরাবর বসুন্ধরা সর্বত্রই তদ্বীর-ভোগ্যা নন—এখানে প্রকৃতি তার আপন গতি নেয়।

সাঁইমুরশীদ কবুল, আমি স্নব নই। কিন্তু আপনার আমার মতো ক্ষীণ-কায় মধ্যশ্রেণীর ভদ্রসন্তানকে যদি বিদেশের জেলে ঠেসে দেয় তবে টেঁসে যেতে কতক্ষণ ? না হয় সপ্রমাণ হল, কাইরোর জেলকে আপনি হার মানিয়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বেরনো মাত্রই তো আপনি সেই ক্রাইমটি ফের করে ফেলেছেন, বিদেশে বিনা পাসপরটে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

অবশ্য আপনি তর্ক তুলতে পারেন, মিশর সরকারই আপনাকে রাস্তায় নামিয়ে ক্রাইমটি করছে, সে-ই কাজের আপনি ইফেকট মাত্র। ততোধিক কুতর্ক করতে পারেন, আজ যদি মিশর সরকারের প্রতিভূ পুলিসম্যান আপনাকে চোদ্দ-তলা বাড়ির ছাদ থেকে পেভমেণ্টে ফেলে দেয় তবে সেটা আত্মহত্যা নয়।

* * *

কাফেতে এ নিয়ে বিস্তর মাথা-ফাটাফাটি হয়।

একমাত্র তওফীক আফেন্দী চরম অবহেলাভরা সুরে পরম তাচ্ছিল্য সহ মাঝে মাঝে বলছিল 'যত সব !' কিংবা 'আদিখেত্তায় মানওয়ারী' অথবা ডিমের খোসায় কালবৈশাখী !

শেষটায় বললে, ছোঃ ! আমার কাছে নিয়ে এলে না কেন ?

নিবেদন করলুম, 'জানি তুমি একদা ছিলে মুস্তাফা কামালের 'বিবেকরক্ষক', অধুনা ইসমেৎ ইনেনুর অমনিবাস এমবেসডর, কিন্তু তথাপি—'

বললে, যাঃ ! এইটুকু মশা মারতে বাঘের উপরে টাগ !—না। কিনে দিতুম। কী আর এমন ক্লেওপাতার গুপ্তধন প্রয়োজন ঐ সাসিটুকুর জন্য ?'

আমি অবাক হয়ে শুধোলুম, 'সে কি ? পাসপরট্ কি হাটের বেসাতি, যে—'

গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'দেখো, বৎস ! তুমি আজহর মাদরাসার ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করো ; না-ই বা জানলে এসব জাল-জচ্চুরির কায়দা-কেতা।' ॥

'ঈস্ট ইজ ঈস্ট অ্যান্ড্—'

ইজ্‌রাএল (ইসরাইল) নিমিত্ত মাত্র। অর্‌-রঈস জমাল্‌ আবদুন নাসিরও নিমিত্ত মাত্র। দুজনের পিছনে রয়েছে দ্বিধা বসুন্ধরা—যাকে আমরা এতদিন প্রাচী তথা প্রতীচী নামে চিনেছি। ইংরেজ ফরাসী গয়রহ বলেছে, অরিএনট এবং অকসিডেণ্ট। জর্মনরা এ দুটো শব্দ ব্যবহার করে বটে, কিন্তু খাঁটি জরমনে বলা হয় মরগেন্‌লান্‌ট (উদয়াচল) ও আবেন্‌ট্‌লান্‌ট (অস্তাচল—অবশ্য লান্‌ট্‌ = ভূমি, দেশ); আরবরা হুবহু ঐ রকমই মশরিক্‌ ও মগরিব[১] (মগরিব বলতে আবার দক্ষিণ আফরিকাকেও বোঝায়) বলে থাকে।

এই দুই ভূখণ্ড নিজেদের ভিতর প্রায় সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সম্মুখীন হয়েছে—যুদ্ধং দেহি।

এ-লেখা বেরুবার পূর্বেই হয়তো উভয় পক্ষ অস্ত্রসংবরণ করে নেবেন। কিন্তু এর শেষ অতি অবশ্যই এখানে নয়। এ শুধু আরম্ভ মাত্র।

প্রতীচীর শক্তিশালী যুযুধান বলতে উপস্থিত বুঝি জনসন, উইলসন[২] ও দ্য গল। প্রাচীর ভীষ্ম কর্ণ বলতে বুঝি কসিগিন মাও।

ইজ্‌রাএলের পিছনে দাঁড়িয়েছেন মারকিন ও ইংরেজ। আরব রাষ্ট্রপুঞ্জের পশ্চাতে রুশ ও চীন।

দ্য গল বাত্যায়। অনেকটা শ্রীকৃষ্ণের মত। অনেকটা শ্রীকৃষ্ণেরই মত তিনি একটা শান্তিসভার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন এবং সে প্রস্তাবের পশ্চাতে তাঁর কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু কূট কসিগিন সঙ্গে-সঙ্গেই অনুমান করে নিলেন যে ধড়িবাজ মারকিন ইংরেজ এই সভাটাকেই মুষলে পরিবর্তিত করে আরব বংশ ধ্বংস করতে চাইবে। তাই কসিগিন যা বললেন, যার ব্যঞ্জনা দিলেন, এবং যা বললেন না কিন্তু মীন করলেন তার সব কটা একুনে দাঁড়ায়ঃ 'শান্তির প্রস্তাব তো উত্তম প্রস্তাব', কিন্তু প্রশ্ন, তুমি জনসন, এবং উনি উইলসন যে দুটি আপন আপন খাসা নৌবহর ভূমধ্যসাগরে রোঁদ মারিয়ে ফেরাচ্ছো,

---

১ বাঙলা গরিব শব্দ ও মগরিব মূলে একই ধাতু থেকে। গরিব আরবীতে 'বিচিত্র' 'অদ্ভুত' অর্থ ধরে।

২ একদা এ দেশে বলা হত বাঙালীর জাত মারছে তিন 'সেন'-এ মিলে। উইলসেন-এর হোটেলে বাঙালী খেত নিষিদ্ধ মাংস, কেশব সেন তাদের করে ফেলত 'বেম্মজ্ঞেনী', আর ইস্টিসেনে বাহান্ন জাত-বেজাতের সঙ্গে মেলা-মেশা এড়ানো যেতো না। এখন পৃথিবীর জাত মারার জন্য এসেছেন অন্য তিন সেন। মার্কিন জনসেন, ইংরেজ উইলসেন এবং কানাডার পিয়ারসেন। তৃতীয়োক্ত ব্যক্তিটি নিতান্তই চুনোপুঁটি। কিন্তু স্বয়ং জনসেন মুক্তকচ্ছ হয়ে এঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এঁকে বেজাতে তুলেছেন, কিংবা বলবো এঁর জাত মেরেছেন।

দুনিয়ার সর্বত্র ছড়ানো বাদবাকিগুলোকে নোঙর ভেঙে ফেলে ফুল ইস্টীমে ওদিক-বাগে ধাওয়া করতে হুকুম দিচ্ছো (মুখে যদিও বলছো, 'ওরা তো চলাফেরা করছে কবেকার সেই ঈসু করা প্রাচীন দিনের টাইম-টেবিল অনুযায়ী) তারা কি ওখানে আসছে ফেরেস্তাদের প্যাটারনে পিঠে ড্যানা গজিয়ে, হাতে হারপ যন্ত্র নিয়ে "হাল্লেলুইয়া" কীর্তন সহ যীশুদত্ত আপ্ত আপ্ত শান্তি সঙ্গীত গাইতে ঃ

"অগ্রসর হও আজি খৃষ্টসেনাগণ
সবে মিলি আইস—"

থাক না, বাছারা, ওসব সন্-ডে ইস্কুলের মোলায়েম মোলায়েম মধুরসের মোরব্বা! আর সেই যদি কইছ, ভূমধ্যসাগরে, ইজরাএলের ধারে ধারে, মিশরের বন্দরে বন্দরে মানওয়ারিদের কোনো প্রকারের ভালোমন্দ মতলব নেই তবে একটা সরল কর্ম করলেই তো হয়। বেচারী খালাসীমাল্লারাও লক্ষ্য-হস্ত তুলে তোমাদের আশীর্বাদ করবে আপন আপন দেশের বন্দরে দারাপুত্রপরিবার সহ সম্মিলিত হয়ে—যাক না এরা ফিরে আন্‌কল্ স্যামের সোনার দেশে, ডিফেনডার অব-ফেৎ-রুল-ব্রিটানিয়ার অক্ষয় স্বর্গে—আহা! ন্যু ইয়রক সাউত্যামটনে ফুল কত না অজস্র, আসব কত না সুলভ, আর ললনারা কতই না উন্মুক্ত হৃদয় (পাঠক, আমি শব্দার্থে বলছি না!—খেয়াল থাকে যেন—লেখক)। শান্তি সম্মেলনে তো যাবো, ওদিকে যারা তোমাদের দলে নয়, তাদের প্রত্যেকের পিছনে থাকবে ছোরা-হাতে একটি একটি করে মানওয়ারী গুণ্ডা (হিটলার রাইষটাগে এই ব্যবস্থা করাতেন গোড়ার দিকে, বিপক্ষ দল নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত)। ঐ আনন্দেই থাক।"

সরল পাঠক হয়তো এই বলে প্রশ্ন শুধোবেন, আমরা তো জানি, রুশরাও ইউরোপীয়, অকসিডেণ্টাল, প্রতীচ্য জাত। আদৌ তা নয়। রুশ কেন, চেক পোল ইত্যাদিকেও অনেকে ইয়োরোপীয় ঈসটারন বলে থাকে। এই তো সেদিন জরমনির কন্‌স্টান্‌ৎস্ শহরে এক সাহিত্য সম্মেলন হয়—তাতে 'ইসটে'র প্রতিভূ হয়ে আসেন এক চেক, অন্যজনা পোল্ বা রাশান। আর হিটলার তো যুদ্ধ লড়তে লড়তে বরাবর চিৎকার করে গেছেন, 'এ সংগ্রামে এক পক্ষে সভ্য ঐতিহ্যশীল ইউরোপীয়, অন্যপক্ষে বর্বর ঈসটারন্—রুশ।' মৃত্যুবরণের পূর্বে বলেন, 'আমি ছিলুম ইউরোপের শেষ আশা। কিন্তু সপ্রমাণ হল, প্রাচী আমার চেয়ে শক্তিশালী।'

সরল পাঠককে বোঝাই, তাঁরই মত সরল—অবশ্য ওদেশে বিরল—ইয়োরোপীয় মাত্রই একটি অতি বাস্তব, ধরা-ছোঁওয়ার জিনিস দিয়ে প্রতীচী প্রাচীর তফাত করে। জামার সামনের দিকটা পাতলুনের ভিতর যে গুঁজে দেয় সে ইয়োরোপীয়, যে বাইরে ঝুলিয়ে রাখে সে প্রাচ্যদেশীয়। রুশরা যখন তাদের খাঁটি দিশী পোশাক—বাতুশ্‌কা, স্তালিন যা পরতেন—গায়ে চড়ায় তখন তাদের কারুকার্য-করা শারটটি (ব্লাউজও বলা হয়) পাতলুনের উপরে ঝুলিয়ে দেয়, আমরা যে রকম পাঞ্জাবির সামনের দিকটা (দামন, অঞ্চল) ধুতির উপরে

ঝুলিয়ে রাখি।[৩] এখানে বুশ্-শারটের 'রেজো দেৎর' নিয়ে আলোচনা করাটা সমীচীন, কিন্তু তাহলে মূল বক্তব্য থেকে অনেক দূরে চলে যাবো ; তবে পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, উত্তম বুশ্-শারটের দামন ভিতরে গুঁজে টাইপরা যায়, আবার বাইরে ঝুলিয়ে মিন্-টাই হওয়াও যায়।

মধ্য-প্রাচ্য উপলক্ষ মাত্র।

এক দিকে জনসন-উইলসন চালিত ইয়োরোপ—লক্ষ্য করেছেন চ্যাংড়া ডেন্ মার্ক তক্ বাঁদর নাচ নেচে রুশের কাছে ধমক খেয়েছে ?—অন্য দিকে রুশ-চীন চালিত এশিয়া, এবং আফরিকাও এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অর্থাৎ এক দিকে সাদা, অন্যদিকে কালো—বা রঙিন বলতে পারেন। সাদার পাল এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে, ইউরোপের বাইরের সবাইকে কলর্ড্ নাম দিয়ে কী থানডারিং ব্লানডারই না সে করছে ! পীলা চীন, কালা নিগ্রো, তাঁবাটে আরব, আধা-পিলা রুশ (ইংরেজাদির দৃঢ় সংস্কার, রুশের গায়ে প্রধানত মন্গোল-তাতার রক্ত) হয়েছে এক-জোট -ওদিকে মার্কিন নিগ্রো মুহম্মদ আলী (কেসিয়াস ক্লে) বলছে, মারকিনের হয়ে লড়তে তার বিবেক-জাত ঘোরতর অধর্মবোধ রয়েছে -পিছনে রঙ-বেরঙের ভারতীয়-পাকিস্তানীও সায় দিয়ে মাথা নাড়ছে ; এস্তেক যে, লেবানন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—কারণ সে আধা ক্রিশ্চান আধা মুসলমান—যে কিনা এতদিন সর্বসংঘাতে গা বাঁচিয়ে 'দেহ রক্ষা' করেছে, সেও আব্দুন নাসিরের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু লক্ষ্য করার মত দেশ, জাপান। পশ্চিমের দ্য গলের মত [illegible]ও এতাবৎ নিরপেক্ষ। তা, এরকম দু'একটা ব্যত্যয় না থাকলে মাথাভরা চুলের প্রকৃত বাহার মালুম হয় না।

হাজার চার-পাঁচেক বছর পূর্বে ঠিক এই প্যাটার্ন্টিই ভারতবর্ষে রূপ নিয়েছিল—যার প্রতি ইঙ্গিত, যার সঙ্গে বর্তমান সমস্যা—প্যাটার্নের তুলনা আমি এই ক্ষুদ্র লেখায় এতক্ষণ দিলুম ঃ বিরাট দেশ ভারতবর্ষ, নানা বর্ণ[৪]—বিশুদ্ধ সংমিশ্রিত—নানা জাতি, নানা সভ্যতার লোক একদা কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিল। এক দিকে দুর্যোধনের পশুবল ; অন্য দিকে ধর্মরাজের ধর্মবল।

---

৩ মধ্য বা পশ্চিম ইয়োরোপে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেরুলে একাধিক সজ্জন আপনার কানে কানে ফিসফিস করে বলবে, 'স্যার ! শার্টটা গুঁজতে ভুলে গিয়েছেন।' তাঁর মনে হয়েছে, আপনি শৌচাগারের প্রয়োজনীয় কর্মটি করার পর দামনটি গুঁজতে ভুলে গেছেন—বুড়া অধ্যাপকরা যে রকম ক্ষুদ্রতর কর্মের পর পাতলুনের বোতাম লাগাতে ভুলে যান।

৪ অনেকের বিশ্বাস, কৃষ্ণের যদুবংশ ছিল কালো, কৌরবেরা ছিলেন গোরা আর পাণ্ডবরা ছিলেন পাণ্ডু, অর্থাৎ পিলা, হলদে। পাণ্ডবরা নাকি আসলে তিব্বতের মঙ্গোলীয়ান। (Winternitz পশ্য। এ বাদ বা বিবাদে যোগ দেবার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই।) মহাভারতের যুদ্ধ নাকি কৃষ্ণ-পাণ্ডু বনাম গোরা-কৌরব।

আজ সেই প্যাটারনই বোনা হচ্ছে গোটা বিশ্বের নানা রঙের সুতো দিয়ে।

হয়তো শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ লাগবে না। কিন্তু সে 'শান্তি' দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

তেইশ বৎসর পূর্বে—তখন স্বরাজ হয়নি—'আনন্দবাজারে' আমি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি—মারকিন-ইংরেজের এই বে-আদপী বেতমিজীকে 'ধবলদম্ভ' নাম দিয়ে। ইংরেজ যে-রকম একটা চীনকে 'পীতাতঙ্ক' (ইয়েলো পেরিল) নামে ডাকত, আজ বিশ্ব জুড়ে তারই পুনরাবির্ভাব!

হাজার পাঁচেক বৎসর পূর্বে হয় মহাভারত; আজ না-হোক, দুদিন বাদে হবে বিশ্বভারত।

বিষবৃক্ষ

নিতান্ত বাধ্য হয়ে আমাকে কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতে হচ্ছে। আমি খবরের কাগজের সম্মানিত রিপরটার নই। তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা, যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক (ইম্পারসনাল) ভাবে আপন বয়ান পাঠকের সম্মুখে পেশ করা। তৎসত্ত্বেও তাঁরা মাঝে মাঝে কটুবাক্য শুনতে পান। পাঠকসাধারণ ভুলে যান, রিপরটারও মাটির মানুষ, তারও ধর্মবুদ্ধি আছে, সেও অন্যায় অবিচারের সামনে কখনো-কখনো আত্মসংযম না করতে পেরে উত্তেজিত ভাষা ব্যবহার করে। ফলে কখনো বা কটুবাক্য শুনতে হয়, কখনো বা হাততালিও পেয়ে যায়। প্রকৃত রিপরটার অবশ্য কোনোটারই তোয়াক্কা করে না। সে আত্ম-প্রসাদ অনুভব করে যদি দেখে যে, সে নির্ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে পেরেছে।

রিপরটার হওয়ার মত শক্তি আমার নেই। তদুপরি দৈনন্দিন যে-সব ঘটনা রিপরটেড হচ্ছে, তার যদি কোনো ঐতিহাসিক মূল্য না থাকে, সে যদি আমাকে মানবসমাজের পতন-উত্থান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তার খোরাক না যোগায় তবে সে জিনিসের প্রতি আপনার আমার মত সাধারণজনের চিত্ত আকর্ষিত হয় না।

যেমন ধরুন আরব-ইজরাএল দ্বন্দ্ব। কথার কথা কইছি, কাল যদি মার্কিন, ইংরেজ, ফরাসী, রুশ সবাই একজোট হয়ে একটা সমাধান করে দেন—যার চেষ্টা এখন প্রতিদিনই হচ্ছে—তবে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, উভয় পক্ষই যখন শান্ত হয়ে গেছেন তখন আমরাও নিশ্চিন্ত মনে আর পাঁচটা খবরের দিকে নজর বুলাই। আর রিপরটারদের তো কথাই নেই। দুই প্রতিবেশী শান্তিতে আছে—এটা খবর নয়। দুই প্রতিবেশীতে খুনোখুনি হচ্ছে সেটা খবর। সংবাদ-সরবরাহ-ভুবনের আপ্তবাক্য—কুকুর মানুষকে কামড়ালে সেটা খবর নয়, মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা খবর।

অথচ আমি বিলক্ষণ জানি, আরব-ইজরাএল সমস্যার প্রকৃত সমাধান যে কি, তার সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। নাসির বলছেন, আমি ইজরাএলকে সমূলে উৎপাটন করবো। ওদিকে ইজরাএল যেটুকু জমির উপর এখন রাজত্ব

করছেন তা নিয়ে যে তিনি একদম সন্তুষ্ট নন, সে কথাও তিনি গোপন রাখেন না। অ্যানটনি ঈডন-এর গোঁয়ার অভিযানের ফলে যখন ইজরাএল সৈন্য সবলে মিশরের সাইনাই (সিনাই, আরবীতে[১] সীনিন, সীনা) অধিকার করে তখন আনন্দে উল্লাসে কম্পিত, ভাবাবেগ দমনে অশক্ত ইজরাএল-প্রধান বেন গুরিয়ন যাজকসুলভ গম্ভীর কণ্ঠে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তার অর্থ, আমরা আমাদের ন্যায্য ভূমি অধিকার করেছি, এ-ভূমি আমরা আর কখনো পরিত্যাগ করবো না। তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল (এবং আজ সেখানে পুনরায় দুই দল সম্মুখীন হয়েছেন), কিন্তু তাঁর বাক্যের প্রথমার্ধ, অর্থাৎ সাইনাই ইজরাএলের প্রাপ্য, এটা ইজরাএল-দৃষ্টিবিন্দু থেকে সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। রাজা সলমনের (আরবীতে সুলেমান) আমলে ইহুদি রাজত্ব কতখানি বিস্তৃত ছিল সেটা পাঠক বাইবেলের পিছনে যে প্রাচীন যুগের ম্যাপ দেওয়া থাকে সেইটে দেখলেই কিছুটা বুঝতে পারবেন। আজ তার বৃহৎ অংশ লেবানন, সীরিয়া, জর্ডন, মিশরের দখলে। কিন্তু হায়, বিশ্বের আদালত ইজরাএলের আড়াই হাজার বছরের তামাদি এ দাবি মানবে না। প্রায় দু' হাজার বছর ধরে ইহুদিরা তাদের পুণ্যভূমি প্যালেসটাইন ত্যাগ করে দলে দলে সেই সুদূর রুশ দেশ থেকে আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এ-কথাও সত্য, ইহুদিদের যাজক-সম্প্রদায় কখনোই আপন পুণ্যভূমিতে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেননি। কারণ, স্বয়ং ইহুদির সদাজাগ্রত প্রভু য়াহবে ধর্মগ্রন্থ তোরাতে প্রতিজ্ঞা করেছেন, 'আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, সেই দুগ্ধ-মধু'র দেশে।' এ-স্বপ্ন বাস্তবে দানা বাঁধতে আরম্ভ করে প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীতে—এরই নাম জায়োনিজম এবং এর প্রধান কেন্দ্র ছিল জরমনিতে। মহাকবি হাইনে কিছুদিন বারলিনে এ আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিন্তু পরে সেটা ত্যাগ করেন; বস্তুত জায়োনিজমের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই একদল শক্তিশালী ইহুদি এ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। তাঁদের বক্তব্য ছিল: 'প্যালেস্টাইনে স্বাধীন ইহুদি রাজ্য নির্মাণের প্রস্তাব দূরে থাক, সেখানে ইহুদিদের জন্য কোনো ধরনেরই খাস 'ন্যাশনাল হোম' করা হবে ভুল। কারণ সে দেশ ছেড়েছি আমরা দু' হাজার বছর পূর্বে, এখন (১৯/২০ শতাব্দীতে) সেখানে শতকরা দশজন ইহুদিও বাস করে না বাদবাকি শতকরা ৭০/৮০ মুসলমান, ১৫/২০ খৃষ্টান (হিসেবটা খুবই মোটামুটি, কারণ সে-যুগে এ-অঞ্চলের তুর্কী শাসনকর্তারা আদমসুমারিতে বিশ্বাস করতেন না) এখানে শত শত বৎসর ধরে বাস করছে (এবং এঁরা না বললেও আমরা জানি, এই মুসলমান এবং খৃষ্টানদের অনেকেই গোড়াতে ইহুদি ছিল, পরে ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান খৃষ্টান হয়। প্রভু যীশু স্বয়ং ইহুদি ছিলেন এবং তিনি যাঁদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেন তার ৯৯% ছিলেন জাত-ইহুদি। পরবর্তী যুগে এঁদের অনেকেই হয়ে যান মুসলমান)। এঁদের

---

১ ইহুদি আরব উভয়ের কাছেই এ গিরি পূতপবিত্র। কুরানশরীফে আল্লাতালা এর নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। ৯৫ সুরা, ২য় ছত্র।

অধিকাংশই চাষা, জেলে। এঁদের ভিটেমাটি কেড়ে না নিয়ে নবাগত ইহুদিদের বসাবে কোথায়?…তার চেয়ে বহুতর গুণে কাম্য আমরা, ইহুদিরা, যেন যে-সব দেশে বাস করি সেই সব দেশের পূর্ণ নাগরিক হয়ে যাই।' আমার যতদূর মনে পড়ছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন লয়েড জরজ ইহুদির জন্য 'ন্যাশনাল হোমে'র খসড়া বানাচ্ছেন তখন ভারত-খ্যাত ইহুদি (?) মনটাগু এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বার বার বলেন, এতে করে আখেরে ইহুদিকুলের অমঙ্গল হবে।

কিন্তু যুক্তিতর্ক এক জিনিস আর অনাগত যুগের সুখস্বপ্ন দেখা অন্য বিলাস। রাজকুমারী মীরাকে রাজসভার গুণীজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই অত্যুত্তমরূপে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, বৃন্দাবনের পেভমেণ্ট (!) সোনা দিয়ে গড়া নয়, যদ্যপি বর্ষারম্ভে মেঘাগমনে তথাকার আকাশ মেদুর হয় অতি অবশ্য, ঘন তমালদ্রুম-রাজি জনপদভূমিকে শ্যামল করে রাখে নিঃসন্দেহেই, কিন্তু সেস্থলে বিষধর সর্পও ঠিক ওই সময়েই গোপগোপীদের প্রাণহরণ করে, তদুপরি—তদুপরি নিশ্চয়ই সভাসদরা বিস্তর অকাট্য যুক্তিতর্ক দ্বারা সপ্রমাণ করেছিলেন যে, ওই সাতিশয় অগণ্ড-গ্রাম রাজকন্যার বাসভূমি হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তথাপি তিনি স্বপন দেখছেন,

চাকর রহসুঁ বাগ লাগাসুঁ
নিতি উঠি দরশন্ পাসুঁ
বৃন্দাবনকে কুঞ্জগলিমে
তেরী লীলা গাসুঁ!

পিস্তলের বুলেট দিয়ে যে-রকম ভূত মারা যায় না, যুক্তিতর্কের খাণ্ডায় দিয়েও সুখস্বপ্ন খণ্ডবিখণ্ড করা যায় না।

স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতি দিয়ে গড়া মেলা ঝামেলার ভিতর রিপরটার অনুপ্রবেশ করে খামখা হায়রান হতে চান না—তাই বলেছিলুম, আমি রিপরটার নই, হবার মত এলেম ও হক্কও আমার নেই।

কিন্তু সেই ১৯২৯ থেকে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় ইহুদিদের সংস্পর্শে এসেছি। বোম্বাই অঞ্চলে 'শনিবারের তিলী' নামে পরিচিত এ-দেশে অতি প্রাচীনকালে আগত ইহুদিদের সঙ্গে আমি বাস করেছি (ব্যক্তিগতভাবে আমি এঁদেরই ইহজগতের সর্বোত্তম ইহুদি বলে মনে করি), দ্বিগ্বিজয়ী ইহুদি পণ্ডিতের কাছে হীব্রু শেখার নিষ্ফল প্রচেষ্টা আমি দিয়েছি (দোষ রাব্বির নয়, আমার), ইহুদির (তথা খৃষ্টান ও মুসলমানেরও) পুণ্যভূমিতে আমি বাস করেছি, জরডনের পাক পানিতে ওজু করেছি, গ্যালিলিয় হ্রদের অতিশয় সুস্বাদু মৎস্য আমি দিনের পর দিন দুবেলা পরম তৃপ্তি সহকারে ভক্ষণ করেছি, বস্তুত প্যালে-স্টাইনের উত্তরতম সীমান্ত থেকে—যেখানে সীরিয়া আজ সৈন্য সমাবেশ করেছে—দক্ষিণতম সীমান্ত গিজা অবধি, তথা পূর্বতম সীমান্ত (ট্র্যান্স্) জরডন থেকে পশ্চিমতম সীমান্তের খাস ইহুদি নগরী তেল আবিব ('বসন্তগিরি') পর্যন্ত অবাধে যাতায়াত করেছি।

* * *

পরম পরিতাপের বিষয় উপরের ছত্রের কালি শুকোতে না শুকোতে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ এসেছে যে আরবে ইহুদিতে কোনো প্রকারের সমঝওতা সম্ভবপর হল না বলে সশস্ত্র যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

এ দুঃসংবাদের পর বিমূঢ় মুহ্যমান হয়ে আমার এ অক্ষম লেখনী আর এগোতে চায় না।

যদি ইজরাএল হারে তবে তার তিনদিকে আরব বেদুইন ও বাস্তুহারা আরব (প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার) যারা জরডন অঞ্চলে কেউ কুড়ি বৎসর ধরে, কেউ বা এগারো বৎসর ধরে তাঁবুতে তাঁবুতে দুঃখদৈন্যের জীবন কাটাতে কাটাতে এই মহালগ্নের অপেক্ষা করছিল তারা পঙ্গপালের মত সমস্ত ইজরাএলে ছেয়ে পড়ে বালবৃদ্ধনারী কাউকে নিষ্কৃতি দেবে না। হিটলারকে ছাড়িয়ে যাবে।

আর সম্মিলিত আরব জাতিপুঞ্জ যদি হেরে যায় তবে তাদের সে অবমাননা —ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও—তাদের সে অবমাননা, তাদের আত্মসম্মান-বোধের পরিপূর্ণ পদদলিত বিনাশ—তাদের করে তুলবে নিষ্ঠুরের চেয়ে নিষ্ঠুর, সর্বনেশে ভবিষ্যতের প্রতিশোধকামী জিঘাংসু জীবন্ত প্রেতাত্মার মত।

মধ্যযুগের সেই নির্মম ক্রুসেডের মত এর প্রস্তুতি চলবে পুনরায় শত বৎসর ধরে, পরিণাম হবে শত শত বর্ষব্যাপী।

প্রথম লেখনেই আরম্ভ করেছিলুম এই বলে যে, এ তো শুধু অবতরণিকা। মনে মনে দুরাশা করেছিলুম, এই বিষবৃক্ষের চারাটাকে বিশ্বমানবের শুভবুদ্ধি হয়তো বা উৎপাটিত করে দেবে; এখন দেখছি, এই শিশু বিষবৃক্ষ মহীরুহ হয়ে উঠবে একদিন—শত শত বৎসর ধরে এ বিষবৃক্ষ পাবে উভয়পক্ষের ক্রোধোন্মত্ত প্রতিশোধ কামনার অপবিত্র শুকররক্তের উর্বরতাদায়ক খাদ্যনিষ্কর্ষ।

এ বিষবৃক্ষকে তখন আর সমূলে উৎপাটিত করা যাবে না।

যদি যায়, কিংবা বিধির আদেশে কোনো দৈবাগত ঝঞ্ঝায় সে ভূপাতিত হয় তবে সে মৃত্যু বরণ করার পূর্বে সঙ্গে নিয়ে যাবে অসংখ্য নরনারী বালবৃদ্ধকে নিষ্পিষ্ট করে তাদের প্রাণবায়ু॥

আরব-ইজরাএল যুদ্ধারম্ভ দিবস।

"দুঃখ তব যন্ত্রণায়"

আমাদের কৈশোরে রমা রলাঁ ছিলেন অতিশয় জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। বস্তুত এমনও একটা সময় গিয়েছে, যখন বাঙলা দেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস বলতে রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফই বোঝাত।

সে-যুগে ঔপন্যাসিক ছাড়া অন্য কোনো রূপে রলাঁ আত্মপ্রকাশ করেছেন কিনা, সে সম্বন্ধে আমরা কোনো কৌতূহল প্রকাশ করিনি।

অথচ ইয়োরোপের ভাবুকজন মাত্রই রলাঁকে চেনেন আরো অন্য একটি রূপে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বহু আগের থেকেই রলাঁ ইউরোপে ক্রমবর্ধমান উৎকট জাতীয়তাবাদ (শভিনিজিম) যে ভিন্ন ভিন্ন দেশকে অবশ্যম্ভাবী প্রলয়ংকরী যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যান এবং দেশবাসী ফরাসী তথা জরমনদের (রলাঁ ছিলেন জরমন সংগীতের আবাল্য একনিষ্ঠ ভক্ত) এ বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন সাবধানবাণী শোনান। বলা বাহুল্য, এহেন পরিস্থিতিতে সর্বত্র, সর্বকালে যা হয়ে থাকে, তাই হল। উভয় দেশই তাঁকে আপন আপন শত্রু বলে ধরে নিল।

বিশ্বযুদ্ধ লাগার সময় রলাঁ ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডে। তিনি রেডক্রসে যোগ দিলেন এবং দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, প্রায় সমস্ত যুদ্ধকালটা ফ্রান্সের উদগ্র শভিনিজমের বিরুদ্ধে দৈনিক মাসিকে প্রচার-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। যুদ্ধশেষের সময় ভগ্নোৎসাহ ক্লান্ত রলাঁ খুঁজলেন শান্তির সন্ধান। ডুব দিলেন তাঁর স্বদেশের শত্রু জরমন জাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীতসৃষ্টিকার বেটোফেনের সংগীতের আরও গভীরে। বেটোফেন জরমন হয়েও জরমনদের বহু ঊর্ধ্বে – তাঁর সংগীত মানুষকে তুলে নিয়ে যায় নভঃলোকে, যেখানে ক্ষুদ্র-নীচ শভিনিজম পেঁছিতে পারে না। একদা তিনি তাঁরই মত মহামানব কবি গ্যোটেকে বলেছিলেন, 'আপনি আমি দেবদূতঃ আমাদের কাজ—মাটির মানুষকে স্বর্গলোকের দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।'

রলাঁ যে বেটোফেনের আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেটাকে মডার্ন উন্নাসিক 'ইসকেপিজম, পলায়নী-মনোবৃত্তি' নাম দিয়ে সস্তায় কিস্তিমাত করবেন। কিন্তু ভুললে চলবে না, রলাঁ অবগাহন করতে নেমেছিলেন সুরগঙ্গায় ক্লান্ত দেহমন স্নিগ্ধ করে নিয়ে পুনরায় তাঁর কর্তব্য-কর্মে মনোনিবেশ করার জন্য। তিনি গঙ্গা নদীর মীন হয়ে ইসকেপিজমের নদীগর্ভে বিলীন হতে চাননি।

* * *

আঁদ্রে জিদ-এর কপালে ছিল নিদারুণতর দুর্দৈব। তিনিও জাতি-ধর্ম-দেশের ঊর্ধ্বে বিরাজ করতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রলাঁ যেরকম আশু দুর্যোগের

১ দুঃখের বিষয়, মূল পাঠটি আমার কাছে নেই। উভয় মহাপুরুষের পরিচয় হয় কারলস বাড-এ (চেক নাম Karlovy Vary)। ছোট গলির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে উভয়ের দেখা হয় জনা দু-তিন রাজপুত্রের সঙ্গে। গ্যোটে সসম্মানে তাঁদের পথ ছেড়ে দেন। বেটোফেন পাগলা ষাঁড়ের মত সোজা চলতে থাকলে রাজপুত্ররা সবিনয় তাঁর জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে যান। গলির শেষে পেঁছে বেটোফেন প্রতীক্ষা করেন গ্যোটের জন্য। তিনি পেঁছলে পর রাজপুত্রদের প্রতি ইঙ্গিত করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন, 'এরা কারা ? আপনি আমি দেবদূত—ইত্যাদি।' সমস্ত ঘটনাটিই হয়তো কিংবদন্তীমূলক। এর একাধিক 'পাঠ' (ভারসন) আমি কারলস বাডে বাসকালীন শুনেছি। তবে রলাঁও তাঁর বেটোফেন-গ্যোটে সম্বন্ধে পুস্তকে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

পূর্বাভাস সুস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন তিনিও তেমনি পেয়েছিলেন দ্বিতীয়ের পূর্বাভা। যুদ্ধ লাগার পর তাঁকে যখন বেতারে প্রোপাগাণ্ডা করতে বলা হল, তিনি অসম্মতি জানালেন। দেশকে ভালবাসতেন রলাঁ, জিদ উভয়েই, কিন্তু যে স্থূল পদ্ধতিতে অশ্রাব্য কটু ভাষণে যুদ্ধের সময় এক জাতি অন্য জাতিকে গালাগাল দেয়, স্পর্শকাতর বিশ্ব-নাগরিক এবং সর্বোপরি বিদগ্ধ কলাকার জিদ তার সঙ্গে সুর মেলাবেন কি করে! জিদ তাঁর জুরনালে (রোজনামচাতে) লিখছেন, ণ'। দেসিদেমাঁ, জ্য ন্য পারলরে পা আ লা রাদিয়ো—'না, আমার স্থির সিদ্ধান্ত, আমি বেতারে বক্তৃতা দেব না। ··খবরের কাগজগুলো এমনিতেই যথেষ্ট দেশপ্রেমের ঘেউ-ঘেউয়ে ভর্তি। নিজেকে যতই ফরাসী বলে অনুভব করি ততই আমার ঘেন্না করে।' এর পর জিদ বড় সুন্দর করে বলেছেন; তিনি নিজেকে যেভাবে ফরাসী মনে করে গর্ব অনুভব করেন, এই স্থূল পদ্ধতির সঙ্গে তো তার কোনো মিল নেই।

জিদের স্মরণে এল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময়কার কথা। তখন কিছু লোক এমনই হাস্যকর 'প্রচারকার্য' আরম্ভ করে যে, তখনকার দিনের অন্যতম খ্যাতনামা লেখক ল্যুসিআঁ জাক্ বলেন, 'চুপ করে থাকাটা কি তবে এমনই কঠিন?'—'সে দ'ক্ সি দিফিসিল দ্য স্য ত্যার?'

তারপর জিদ বলছেন, 'কিন্তু হৃদয় যখন ফেটে পড়তে চায়, তখন নীরব থাকটা যে বড়ই বেদনাময়।' এটা স্বীকার করে তিনি শেষ করেছেন এই বলে, 'কিন্তু আমি তো চাই নে আজ এমন কিছু লিখতে, যার জন্য কাল আমাকে মাথা হেঁট করতে হয়'!

এই সময় জিদ পড়ছেন জরমন কবি ও ঔপন্যাসিক আইসেনডরফের বই 'নিষ্কর্মা';

অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটে যেতে লাগল জিদের চোখের সম্মুখে। অবিশ্বাস্য মনে হল বিশ্বজনের কাছে যে, নেপোলিয়নের দেশ ফ্রান্স মাত্র পাঁচ-ছয় সপ্তাহের একতরফা যুদ্ধের পর—বস্তুত ফ্রান্স একবার মাত্রও পুরো জোর হামলা করতে পারেনি!—বিজয়ী জরমনির পদতলে লুণ্ঠিত হল।

জিদ বলছেন, 'শত্রু যখন প্রচণ্ড শক্তিশালী, তখন তার কাছে পরাজিত হওয়াতে নিশ্চয়ই কোনো লজ্জা নেই; এবং আমিও কোনো লজ্জা অনুভব করি নে। কিন্তু যখন ভাবি আমরা কি-সব স্তোকবাক্যের উপর নির্ভর করে কর্তব্য-কর্ম অবহেলা করে পরাজয় ডেকে এনেছি—তখন যে গভীর বেদনা অনুভব করি সেটা ভাষাতে প্রকাশ করতে পারি নে, অস্পষ্ট মূর্খ আদর্শবাদ, প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে মোহাচ্ছন্ন অপরিচয়, অপরিণামদর্শিতা, মূর্খের মত অর্থহীন এমন সব বাগাড়ম্বরে অন্ধবিশ্বাস—যার মূল্য আছে শুধু অপোগণ্ডের কল্পরাজ্যে।'

নিরঙ্কুশ পরাজয়ের পরের দিন জিদ লিখছেন:

'একমাত্র গ্যোটের সঙ্গে কথোপকথনই আমাকে দুশ্চিন্তার এই মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে কিঞ্চিৎ মুক্তি এনে দেয়'—

'Seules les Conversations avec Goethe parviennent a distraire un peu ma pensee de Pangoisse.'

পাঠক লক্ষ্য করবেন, 'গ্যোটের সঙ্গে কথোপকথন' 'Conversation with Goethe' (মূল জরমনে Gaspraeche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens')

গ্যোটে সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক অত্যুত্তম 'জীবিত' জীবনী লিখেছেন গ্যোটের সখা এবং শিষ্য একেরনান (অনেকটা 'শ্রীম')। কথোপকথন হয়েছে গ্যোটে এবং একেরমানে। অথচ জিদ ইচ্ছে করে এমনভাবে বাক্যটি রচনা করেছেন যে মনে হয় তিনি, জিদ-ই, যেন স্বয়ং কথাবার্তা বলছেন জরমন মহাকবি ঋষি গ্যোটের সঙ্গে, ইঙ্গিত করছেন, তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ঋষির বাণী, তাঁর কণ্ঠস্বর। দুশ্চিন্তার বিভীষিকায় যে-টুকু সান্ত্বনা তিনি আদৌ পাচ্ছেন সেটি তাঁরই কাছ থেকে।

জিদ ঋষি নন—গ্যোটের মত। কিন্তু তিনি তখন ফ্রান্সের গ্রাঁ ম্যৎর্—গ্র্যান্ড্ মাস্টার—অর্থাৎ ফ্রান্সের পথদ্রষ্টা সাহিত্যসম্রাট। সেই ফরাসী সম্রাট সঞ্জীবনী সান্ত্বনা নিচ্ছেন—যে জরমনি নির্মমভাবে ভুলুণ্ঠিত করেছে গরবিনী ফ্রান্সকে, তারই ঋষি কবির কাছ থেকে!

* * *

মিশরের আড্ডা সম্বন্ধে পক্ষাধিককাল পূর্বে যখন লিখি তখন কল্পনাও করতে পারিনি, এই মিশরই দু-পাঁচদিনের ভিতর লেগে যাবে জীবনমরণ সংগ্রামে। সেই আড্ডাতে যিনি ছিলেন আমাদের 'কবিসম্রাট' তাঁর কবিতা পড়লে মনে হত তিনি যেন ইসলাম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী যুগের বেদুইন ভাট। কথায় কথায় 'বিশাল মরু দিগন্তে বিলীম', 'ছুটছে ঘোড়া উড়ছে বালি' আর জাত ইহুদি ইব্রাহিমের পুত্র মিশররাজ ইউসুফ ও জোলেখার সাহারার উষ্ণশ্বাস-ভরা নীলনদের দুকূল-ভাঙা প্রেম।[২] আলট্রা মডারন কাইরো শহরের শিক্ পশ্ কাফের বাতাবরণে আমাদের কবিরাজ আহমদ ইবন শহরস্তানী অল্-মুকদ্দসী যখন তার সেই ফারাও যুগের প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো, তখন আমার মনে হত এ রস রোমান্টিক, ক্লাসিক, এপিক, বৈদিক, প্রাগৈতিহাসিক সব কিছু ছাড়িয়ে গিয়ে সোজা বেআনডারটালে পেঁছে গেছে। কবিও তাই চাইতেন।

আমাদের মুকদ্দসী কিন্তু আর্ট্ কি, অলঙ্কার কাকে বলে, আর্ট্ অনুভূতিপ্রধান না তাতে অন্য কোনো মনোবৃত্তি চিত্তবৃত্তি প্রবেশ করতে পারে কি না সে নিয়ে কোনো আলোচনা করতে চাইতো না, পারতোও না। এ কিছু

২ আমরা যে গ্রন্থকে ওলড টেস্টামেণ্ট বলি সেইটেই ইহুদিদের 'তোরা' ইত্যাদি। সেসব গ্রন্থে বর্ণিত অনেক পয়গম্বর কুরানেও বর্ণিত হয়েছেন। ইউসুফ তাঁদেরই একজন। নজরুল ইসলাম হাফিজের অনুবাদ করেছেন:

দুঃখ করো না, হারানো ইউসুফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে।

নূতন তত্ত্ব নয়। মা-ঠাকুরমার রূপকথা শুনে আমরা, হ্যাঁ, বয়োবৃদ্ধরা পর্যন্ত বিমোহিত হয়ে ভাবি, রূপকথা কল্পনা করার, তাকে অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করার রহস্যটা কোন্‌খানে। প্রশ্ন শুধিয়ে দেখি ঠাকুরমাও জানেন না। মুকদ্দসীর বেলাও হুবহু তাই।

শুধু একটি কথা মাঝে মাঝে মাথা দোলাতে দোলাতে বলতো, কবি হওয়ার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে হে, কবি হওয়ার একটা বিশেষ মূল্য আছে। সে মূল্য কিন্তু অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি কোনো-কিছুর মাপকাঠি দিয়েই বিচার করা যায় না। কোন্ এক ইরানী কবি নাকি পেয়েছিলেন লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, দান্‌তে পেয়েছিলেন বেয়াৎরিচের কাছ থেকে একটি ফুল, কিংবা কি জানি, কার ঠোঁটের কোণে স্বীকৃতির একটুখানি স্মিতহাস্য, কি জানি—।'

* * *

কবি মুকদ্দসী বড় স্পর্শকাতর। সে আরব। ইহুদিদের কাছে তারা নির্দয়ভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে। তাকে চিঠি লিখেছি, 'সখা তুমি ইহুদিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হাইনরিষ হাইনে পড়ো।'

* * *

যে একেরমান গ্যোটের সঙ্গে কথোপকথনের বিবৃতি দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হন তিনি ছাত্রাবস্থায় গ্যোটিঙেন শহরে হাইনের বন্ধুত্ব লাভ করেন। এক জহুরিকে চিনতে অন্য জহুরির বেশীক্ষণ সময় লাগেনি। প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়।

ছাত্রাবস্থাতেই হাইনের সরল মধুর কবিতা জরমানির সর্বত্র খ্যাতিলাভ করে। অতিশয় সাধারণ জন-দফতরের কেরানী, ম্যাট্রিকের মেয়ে, ছাপাখানার ছোকরা—তাকে যেন দু বাহু মেলে আলিঙ্গন করে নেয়। আর ওদিকে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আলংকারিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ফন্ শ্লেগেল তো তাকে প্রথম দিনই বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন একেরমান; ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। তারপর সেটি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্যোটিঙেন থেকে ঘোড়ার গাড়িতে ঘণ্টাখানেকের পথ—লানট্‌ভের বিয়ের-গারটেন। খোলামেলাতে বিয়ারের আড্ডা। রববার দিন গ্যোটিঙেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেখানে এসে জালা জালা বিয়ার খায়, হইহুল্লোড় করে, আর নৃত্যগীত তো লেগেই আছে।

একেরমান, হাইনে এবং কলেজের আরো কয়েকজন ইয়ার বক্‌সী গেছেন সেখানে ফুর্তি করতে।

হাইনে আগের থেকেই মৌজে—বোধ হয় হামবুর্গের ব্যাংকার কাকার কাছ থেকে বেশ কিছু পেয়েছেন।[৩] তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর আনন্দোল্লাসের

---

৩ টাকাকড়ি বাবদে হাইনে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন অত্যন্ত বেহিসেবী। তিনি স্বয়ং এক জায়গায় লিখেছেন, কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে তখনই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

লাগাম—বাক্যস্রোত ছুটেছে তুরুক সোওয়ারের মত। বিয়ার তাদের টেবিলে দিয়ে এসেছে পাব্-এর খাবসুরুত কোমলাঙ্গী তরুণী লটে (Lotte), হাইনে ফুর্তির চোটে জড়িয়ে ধরেছেন সুন্দরী লটেকে। কিন্তু একেরমান ও অন্যান্য ইয়াররা পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে জানতেন, এই লটেটি বিয়ার-খানার আর পাঁচটা বার্-গার্লের মত ঢলাঢলির পাত্রী নয়। রাগে তার বাঁশীর মত নাকের ডগাটি হয়ে গেছে টুকটুকে রাঙা, চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে আগুনের হল্কা, আর সে এমনই ধস্তাধস্তি আর পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়তে আরম্ভ করেছে যে ইয়ারগোষ্ঠী কানে আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছেন। হাইনে ওটা মস্করা হিসেবেই ভেবে নিয়েছিলেন গোড়ার দিকে, কিন্তু একটু পরেই কি যেন ভেবে অপ্রতিভ হয়ে চুপ মেরে গেলেন —যেন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।৪

পরের সপ্তাহে একেরমানরা যখন হাইনেকে তুলে নিতে এলেন, তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে যেতে কবুল নারাজ। শেষটায় একরকম গায়ের জোরে জাবড়ে ধরে তাঁকে গাড়িতে তুলতে হল।

কাফেতে আসন নিয়ে হাইনে মাথা হেঁট করে রইলেন চুপ। ঘাড় তুলে মেয়েটির দিকে তাকাবার মত সাহস পর্যন্ত তাঁর নেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য! লটে স্বয়ং এসে উপস্থিত হাইনেদের টেবিলে। মধুর হাসি হেসে হাইনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালে। ইয়ার-দোস্তরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লটে হাইনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার উপর রাগ করবেন না, স্যর। আপনি অন্য ছাত্রদের মত নন। আমি আপনার কবিতা পড়েছি। কী সুন্দর! কী সুন্দর!! আপনার যদি ইচ্ছে যায়, তবে এই সব ভদ্রলোকের সামনাসামনি আমাকে আলিঙ্গন করতে পারেন—কিন্তু ঐসব মধুর কবিতা আপনাকে রচনা করে যেতেই হবে।'

বলেই লটে তার গাল বাড়িয়ে দিলে হাইনের দিকে। আর হাইনে?—কে জানতো হাইনের মত সপ্রতিভ লোকও লজ্জায় লাল হয়ে যেতে পারেন—লজ্জায় লাল হয়ে তিনি চুমো খেলেন।

একেরমান বলেছেন, 'লক্ষ্য করলুম (নটবর) বন্ধু স্পিটা হিংসেয় একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।'

* * *

হাইনের চোখ দু'টি ভিজে গিয়েছে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এ জীবনে এর চেয়ে সুখী আমি আর কখনো হইনি। এই আমি প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলুম, কবি হওয়ার মূল্য আছে, কবি হওয়া সার্থক।'

* * *

সখা মুকদ্দসী, কবি হওয়া সার্থক!

৪ কনটিনেনটের ছাত্র-পাবে এ ঘটনা নিত্য নিত্য ঘটে। কেউ বড় একটা সিরিয়াসলি নেয় না। চেঁচামেচিটা অনেক ক্ষেত্রেই 'ন্যাকরা' বলে ধরা হয়।

'সাঙ্গ হয়েছে রণ—'

রবীন্দ্রনাথ

এ-রণ সাঙ্গ হয়নি। সবে আরম্ভ মাত্র। কত শতাব্দী ধরে চলবে কেউ বলতে পারে না। কিংবা, কত হাজার বছর ধরে। 'হাজার বছর ধরে' বলছি ভেবেচিন্তেই। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্যালেস্টাইনের ইহুদি জাত আপন রাষ্ট্র আপন স্বাধীনতা হারায়। সেই সময় থেকে ইহুদিরা পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। ফলে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্যালেস্টাইনের ইহুদি জনসংখ্যা শতকরা পাঁচ থেকে দশের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ১৯১৯।২০ থেকে পুনরায় ইহুদিদের বহু লোক প্যালেস্টাইনে ফিরে আসতে লাগলো। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে (ইহুদি গণনায় ৫৭০৮ সালে—অবশ্য এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে) ইউনাইটেড নেশনসের অনুশাসনানুসারে প্রাচীন প্যালেস্টাইনের একাংশ নিয়ে ইজরাএল রাষ্ট্র (Erez Jissrael) গঠিত হয়। অর্থাৎ অন্তত আড়াই হাজার বছর লাগলো একটা মৃত রাষ্ট্রকে পুনরুজ্জীবিত করতে। তাই এ রাষ্ট্র যদি আবার লোপ পায় তবে হয়তো লাগবে আরো হাজার দুই তাকে পুনরায় প্রাণ দিতে। তাই গোড়াতেই বলেছি, এ সংগ্রাম হয়তো চলবে আরো কয়েক হাজার বছর ধরে।

কিন্তু প্রশ্ন, এ-রাষ্ট্র কি আবার লোপ পেতে পারে? অতি ক্ষুদ্র যে রাষ্ট্র এতগুলো বিরাট বিরাট আরব রাষ্ট্রকে চারদিনের ভিতর চূড়ান্ত পরাজয় দিল (বস্তুত এক ঘণ্টার ভিতরেই আরবশক্তির চোদ্দ আনা জঙ্গী বিমান নষ্ট হয়, এবং ফলে আরবরা কোনো যুদ্ধক্ষেত্রেই সামান্যতম সার্থক আক্রমণ চালাতে পারেনি) সে কি কস্মিনকালেও এদের কাছে পরাজিত হবে? অবিশ্বাস্য।

মাত্র একটি যোগাযোগের ফলে এ বিপর্যয় ঘটতে পারে। এবং উপস্থিত আরবরা যে সন্ধিপত্রেই দস্তখৎ করুক না কেন, তারা সেই মহালগনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনবে।

সকলেই জানেন, আরব ইজরাএল দুই পক্ষই লড়েছেন পশ্চিমাগত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। কোনোদিন যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায় (এবারে আব্দুন নাসির তাই চেয়েছিলেন কিন্তু রুশ তাঁকে ডোবাল) তবে ইজরাএলের সর্ব সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে—এমন কি খাদ্যশস্যও। মিশর ইরাক তখন লড়বে অনেকটা রুশ যে রকম হিটলারের সঙ্গে লড়েছিল। ইরাক জরডন হটে হটে যতদূর খুশি যেতে পারে, মিশরের বেলাও তাই। আরব বাহিনী হুবহু রুশদের মতই কোনো জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে নিজেদের কিছুতেই বিধ্বস্ত হতে দেবে না। এবারেও কোনো কোনো আরব রাষ্ট্র মিশরকে এই ট্যাকটিক বরণ করতে বলেছিল। কিন্তু নাসের জানতেন, ইজরাএল কালক্রমে যদি পরাজয়ের সম্মুখীনও হয় তবে মার্কিনিংরেজ শেষ মুহূর্তে তার পক্ষে নামবেই। আর ইতিমধ্যে প্লেন, তেল বোমার সাপলাই তো চালু থাকবেই। তাই ভবিষ্যতে আরব রাষ্ট্রপুঞ্জ শুধু তখনই ইজরাএল আক্রমণ করবে যখন গোড়াতেই দেখবে মার্কিনিংরেজ রুশ বা

চীনের কিংবা উভয়ের সঙ্গে 'মরণ-আলিঙ্গনে/কণ্ঠ পাকড়ি ধরেছে আঁকড়ি/দুইজনা দুইজনে/'। তখন ইজরাএলের সাহায্যের জন্য এরা কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পারবে না। ইজরাএল অবশ্যই তার প্রতি-ব্যবস্থা বছরের পর বছর করে যাবে, কিন্তু যুদ্ধবিশারদ তথা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলেন ঃ ক্ষুদ্র একটি রাষ্ট্র যার লোকবল যৎসামান্যেরও কম, যার প্রায় তাবৎ 'উপার্জন' বিশ্ব ইহুদি সংঘের দান-খয়রাত থেকে, যার আপন উৎপাদনী শক্তি প্রয়োজন মেটানোর চেয়েও ঢের ঢের কম তার পক্ষে এহেন অর্থনৈতিক পলিসি আত্মহত্যার শামিল। তাই আজ থেকে আরব ঠিক এইটেই কামনা করছে।

আর আরব সম্পূর্ণ নিরাশ হবেই বা কেন? ক্রুসেডের সময় আরবভূমির এক ক্ষুদ্রাংশ তিনশ বছর ধরে লড়েছে পোপের নেতৃত্বে জমায়েত তাবৎ ইয়োরোপের সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা হোলিল্যাণ্ড ত্যাগ করে ফিরে যান যাঁর যাঁর দেশে—পোপের কাতর ক্রন্দন, তীব্র অভিসম্পাত উপেক্ষা করে। ইহুদি যদি দু হাজার বছরের মড়া রাষ্ট্রের প্রাণ দিতে পারে, তবে আরবই বা তার মাত্র এক হাজার বছরের পুরনো রাষ্ট্রশক্তিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না কেন?

তা হলে প্রশ্ন, এ সমস্যার কি কোনো সমাধান নেই?

আছে হয়তো। কিন্তু যে-সমাধান এক পক্ষ কিছুতেই স্বীকার করবে না সেটাকে সমাধান বলি কি প্রকারে? তবু দেখা যাক।

যুদ্ধবিরতির সঙ্গে-সঙ্গেই মারকিনিংরেজের শুধু একটি চিন্তা ঃ এই যে আরববলদের মড়াটা পড়েছে পায়ের কাছে এর কতটা অংশ পাবো আমি—সিংহ-আন্‌কল-স্যাম, কতটা পাবে জনবুল-নেকড়ে, আর কতটা পাবে ইহুদি-ফেউ?—যদ্যপি বেচারী ফেউটাই এস্থলে করেছে লড়াই। কিন্তু সে ফালতো জমিজমা নিয়ে করবে কি? অত ইহুদি পাবে কোথায়? হাতের চেয়ে যে আঁব বড় হয়ে যাবে! আর সে যদি নিতে চায়, নিক। আমরা নেব সীনা, গুর্দা, কলিজা! শাঁসালো বস্তু। সেগুলো কি, এখখুনি নিবেদন করছি।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, বি বি সি যুদ্ধবিরতির প্রথম খবর দেবার ঠিক আট মিনিট দশ সেকেণ্ড পর একটি talk-টিপ্পনী বেতারিত করলে। বক্তা ইংরেজ ইহুদি কিনা জানি নে; তাকে ইহুদি বলে ধরে নিয়ে আমি ইহুদিজাতকে অপমান করতে চাই নে।

নাকি-নাকি ন্যাকা সুরে নিজের স্বার্থ যতখানি গোপন করা যায় তাই ক'রে—এবং ইংরিজী ভাষা যে ভণ্ডামির জন্য প্রকৃষ্টতম ভাষা সে-কথা যে-হটেনটট্ সাত অবধি গুনতে পারে না সেও জানে—যা বললেন তার বিগলিতার্থ, 'এ-রকম লড়াই বড়ই খারাপ, বড়ই খারাপ। এরকম ফের হতে দেওয়া উচিত নয় উচিত নয়। এই দেখুন না, এরই ফলে আরব জাত বন্ধ করে দিলে সুয়েজ খাল—বলুন তো আমাদের জাহাজ চলাচল করবে কি করে? আবার কসম খেয়ে বসলো, তেল বেচবে না আমাদের কাছে—ওঃ! আমাদের বাস্-কারখানা তা হলে চলবে কি করে! আর গাল্‌ফ-অব-আকাবা, শর্‌ম্-উশ্-শেখ সে তো বটেই বটেই। অতএব এ-হেন অঘটন যাতে পুনরায় না ঘটে

তার জন্য ক) সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক কনট্রলে নিয়ে নাও, খ) তাবৎ আরবভূমির তেলেরও এমন ব্যবস্থা করো যাতে করে আসছে দুর্যোগে আরব জাত বস্তুটা নিয়ে ছিনিমিনি না খেলতে পারে এবং গ)—কিন্তু 'গ'—অর্থাৎ গালফ্ অব আকাবা সম্বন্ধে টীকাকারের উৎসাহ কম কারণ সেখানে প্রধান স্বার্থ ইজরাএলের। এর অর্থ কি? সুয়েজ খাল কনট্রলে এলে ইংরেজকে মাশুল বাবদ এক পৌণ্ডের জায়গায় দিতে হবে একটি ফার্দিং (ও! ফার্দিং বুঝি অধুনা দুর্লভ? তা সেটা দারুণ স্বার্থত্যাগ করে ফের টাঁকশালে বানাতে হবে বই কি! Oh Albion! Consider thy historical self-sacrifice!)। তেল কনট্রলে এলে হয় কোনো রয়েলটিই দেব না, নয় ঐ দু'একটা ফার্দিং থ্রোন টু দি অ্যারাব-বয়!

লড়াই করে ম'লো ইজরাএল আর লুটের বেলা এলবিয়ন। এর ঠিক উল্টো-টাকে বাঙলায় বলে—হায়, বাঙলা বড়ই নাঈফ শিশুর আধো-আধো ভাষা, ও নিয়ে আদৌ ভণ্ডামি করা যায় না—'খেলেন দই রমাকান্ত বিকারের বেলা গোবন্দন।' এস্থলে ইজরাএল আগেভাগেই বিকার করে বসে আছে, এবারে দই খাবেন গোবন্দন ইংরেজ মহাজন। তবে এর মধ্যে একটুখানি আশার আলো দেখা যাচ্ছে। অ্যান্দিন ইংরেজ 'বিজিনেস' বা শপ্-লিফটিং করেছেন অগা ভারতীয়দের সঙ্গে, শিশু নিগ্রোদের সঙ্গে, ক্যাবলাকান্ত আরবদের সঙ্গে, এবারে চাচা, নয়া ওঝার নয়া নয়া খেল। এরা আণ্ডা না ভেঙে মামলেট বানাতে পারে, দেখলে না, নেই নেই তো নেই, সেই নেই নেই থেকে দ্যাখ তো না দ্যাখ একটা নয়া চনমনে সমুচ্চ রাষ্ট্র ইজরাএল পয়দা করে দিয়ে সপ্রমাণ করে ফেললে, তোমাদের আড়াই হাজার বছরের পুরনো পদার্থবিদ্যা দর্শনের স্বতঃসিদ্ধ something cannot come out of nothing আগাপাস্তলা ভুল, বিলকুল ভণ্ডুল। জানি তোমরা 'হর্স্ ডীল' বা 'ঘোড়া বিক্রি'র জন্য পাঠাবে তোমাদের ঝানু ঝানু স্কটস্ম্যানদের কিন্তু ওদের খোঁয়াড়েও আছে গণ্ডায় গণ্ডায় ঝাণ্ডু ঝাণ্ডু স্কটিশ জুঁ—যারা ক্রমান্বয়ে চতুর্দশ পুরুষ স্কটল্যাণ্ডে জন্মমৃত্যু বিবাহ সেরে স্কটস্ম্যানদের চুষেছে এবং চুষে ভর্তি পকেটে হুইসিল দিতে দিতে পশুদিন এই হেথা ইজরাএলে এসেছে। তোমরা যদি সুয়েজখালে 'নাও চল কইরা দু পয়সা কামাও তবে ইহুদি গোপাল সেখানে স্রেফ ঢেউ গুনে দু আঁজি।'

কিন্তু এ সবেতে কিছু যায় আসে না। সুয়েজ, শরম্ উশ্-শেখ, তেল এ সব নিয়ে আরব লেনদেন করতে হরবকৎ তৈরি। এস্তেক—আমার বিশ্বাস—ইজরাএলের চতুর্দিকের জমাজমি নিয়েও সে দরদস্তুর করতে রাজী আছে, কিন্তু তার একটি মাত্র শর্ত মেনে নিতে হবে।

সে শর্তটি: যে-সব আরব চাষা জেলেদের প্যালেস্টাইন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ইজরাএল তৈরি করেছো তাদের ফিরিয়ে নিয়ে পূর্ণ নাগরিক অধিকার দিতে হবে।

ইহুদিদের প্যারিস তেল-আভিভ শহর হেসে গড়াগড়ি দেবে। তা

কখনো হয় !

উত্তরে আরব বলে, 'কেন হবে না ? তেরশ' বছর নয়, তারও বহুপূর্বের থেকে আরব ইহুদি পাশাপাশি বাস করেছে। পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ ইহুদিদের বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন। নিউ টেস্টামেন্টে পাই, ইহুদিরা প্রভু খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছে এবং তারই ফলস্বরূপ যুগ যুগ ধরে খৃষ্টানরা তোমাদের অত্যাচার করেছে, এখনও কোনো কোনো দেশে করে—আর হিটলারের কথা তুলবো না, সে তো বিশ্বজন জানে। অথচ কুরান শরীফে স্পষ্ট বলা হয়েছে, প্রভু যীশু আদৌ ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যাননি। যে কলঙ্ক থেকে আমাদের নির্ভুল আপ্তবাক্য কুরান শরীফ তেরশ' বছর পূর্বে তোমাদের বেকসুর মুক্তি দিয়েছে, সেই কলঙ্ক থেকে খৃষ্টানদের প্রতিভু হিজ হোলিনিস পোপ তোমাদের মুক্তি দিয়েছেন বছর দুই হয় কি না হয়। গ্রীক অর্থডক্স, কপট্, লুথেরিয়ান ইত্যাদি চার্চ এখনো দেয়নি। অর্থাৎ প্রায় এক হাজার ন' শ' ত্রিশ বছর ধরে পৃথিবীর সর্ব খৃষ্টান তোমাদের অপরাধী ধরে নিয়ে যেখানে সেখানে ঠেঙিয়েছে। তোমাদের নামে কুৎসিত কেলেঙ্কারি কেচ্ছা রটিয়েছে যে, তোমরা তোমাদের এক বিশেষ পরবের দিনে একটি নিষ্পাপ খৃষ্টান শিশুর গলা কেটে তার রক্তপান করাটা অবশ্য কর্তব্য পুণ্য বলে স্বীকার করো।[১] খৃষ্টানদের এই ইহুদি বিদ্বেষের জন্য বিশেষ ইংরিজী শব্দ 'এন্টি-সেমিটিজম'। এবং এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ইংরিজী ভাষা জরমন থেকে নিয়েছে 'যুডেনহেৎসে', সুদূর রুশ থেকে নিয়েছে 'পগ্রম'। আরবীতে সে রকম কোনো শব্দ আছে, না আমরা তোমাদের উপর কখনো কোনো অত্যাচার করেছি ? বস্তুত আমাদের নবী মদ খাওয়া এবং সুদ নেওয়া বারণ করে দেওয়াতে এ দুটো মুনাফার ব্যবসা তোমরা একচেটে চালিয়েছ তেরশ' বছর ধরে তামাম মধ্য প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা জুড়ে। এই যে ১৯১৯ থেকে তোমরা মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিদের বার বার তোমাদের হোলি ল্যাণ্ডে নিমন্ত্রণ জানিয়েছ তাদের সবাই এসেছে ?[২] এই গত যুদ্ধের সময়ও আমরা কোনো কোনো জায়গায় বিশেষ পুলিস মোতায়েন করেছি পাছে উত্তেজিত জনতা তাদের মারধোর করে। আর তোমাদের সঙ্গে লড়াই করে তো

---

১ দুর্বল স্মৃতিশক্তির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা বরে নিবেদন, চসার বোধ হয় ঐ ধরনের একটি নিষ্পাপ বালকের কাহিনী লিখেছেন। ইহুদিরা নাকি তার গলা পুরোপুরি কেটে ফেলতে পারেনি বলে সে বেঁচে যায় ও তার করুণ কাহিনী খৃষ্টানদের সামনে বর্ণনা করে।

২ আসলে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ইজরাএল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন ইহুদিরা সে রাজ্যের চাষীদের সঙ্গীনের খোঁচায় তাড়িয়ে দিয়ে, তাদের জমিতে বিদেশাগত জাতভাইদের বসালে তখন ইরাক, সিরিয়া ইত্যাদিতে (মিশর ও উত্তর আফরিকায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম) আরবরা সেখানকার ইহুদি বাসিন্দাদের উপর দাদ তুলতে লাগলো। ফলে বাধ্য হয়ে এরা ইজরাএলে চলে যেতে লাগলো।

আমরা জেরুজালেম দখল করিনি। লড়াই হয়েছিল খৃষ্টানদের সঙ্গে। শত্রু যদি আমাদের কেউ থাকে তবে সে খৃষ্টান। অথচ এই খৃষ্টানদের সঙ্গে আমরা সম্মিলিতভাবে অক্লেশে লেবাননে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি।

'তোমরাই বা আমাদের সঙ্গে একই রাষ্ট্রে বাস করতে পারবে না কেন?'

অসম্ভব! অসম্ভব! ইহুদি জানে সে আড়াই হাজার বছর ধরে ইজরাএলে যে নবীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুখস্বপ্ন গড়েছে সে-রাজ্য দাউদ (ডেভিড) সুলেমানের রাজ্যের হুবহু ফটোগ্রাফ। সে রাজ্য পূত-পবিত্র। তাতে কোনো বিধর্মী নেই। যারা ছিল তাদের বহু পূর্বেই নির্মূল করা হয়েছে। সলমনের গুরি তো তার বিধর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নির্মিত হয়নি। এসব প্রস্তাব শুনলেই কানে আঙুল দিতে হয়।[৩]

তাই বলেছিলুম, আরব ইহুদি সমস্যার সমাধান কোথায়?

জেরুসলেম

আইস, সুশীল পাঠক, যুদ্ধবিগ্রহ তথা রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকে যে মেছোহাটার গালাগালি এবং দর কষাকষি হচ্ছে সেগুলো ভুলে গিয়ে পুণ্যভূমি জেরুসলেমে তীর্থ করতে যাই।

অতি প্রাচীন নগর জেরুসলেম। খৃষ্টের দু'হাজার বছর পূর্বে জেরুসলেম মিশরীয়দের অধীনে ছিল। তখন তার নাম ছিল উরুসালিমুমু ('শান্তিনিকেতন' ত্রাণদুর্গ)। পরবর্তী রোমানযুগে রাজা হাদ্রিআন এর নাম দেন অ্যালিয়া কাপিতলিনা। খৃষ্টের প্রায় দেড়শ' বছর পর থেকে ইহুদিরা দলে দলে, কখনো রোমানদের দাসরূপে কখনো বা স্বেচ্ছায় জেরুসলেম ত্যাগ করে।[১] ঐ সময় থেকে সে নগরী আর ইহুদি ধর্মের কেন্দ্রভূমি হয়ে রইল না। সপ্তম শতাব্দীতে দ্বিতীয় খলীফা ওমরের আমলে যখন মক্কামদীনার আরবরা এ নগর

---

৩ অতীতের কোনো বিশেষ পূত পবিত্র যুগে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাটা ইহুদিদের একচেটে নয়। মুসলমানদের ওয়াহ্হাবী আন্দোলন এককালে তাই চাইত। অবশ্য তাদের প্রোগ্রামে বিধর্মীদের খেদাবার ব্যবস্থা নেই। কারণ তাহলে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য লোক পাবে কোথায়? শুনেছি স্বামী শ্রদ্ধানন্দও বৈদিক যুগ পুনরুজ্জীবিত করতে চাইতেন কিন্তু সেই ধর্মরাজ্যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের 'শুদ্ধি' করে নেবার ব্যবস্থা ছিল ('ব্রাত্য' ব্যবস্থা তুলনীয়)। এটাকেই যখন 'বিজ্ঞান'সম্মত পদ্ধতিতে পেশ করা হয় তখন তার জিগির "Back to nature!"

১ পুণ্যনগরী জেরুসলেম যে ইহুদিদের একদিন ত্যাগ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে হবে সে কথা এর প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্বে ইহুদি প্রফেটরা বার বার ভবিষ্যদ্বাণী করে ইহুদিদের সাবধান করেছেন; তারা কান দেয়নি; আচার-আচরণ বদলায়নি। এই 'বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার' নামই 'ডিসপারসেল', গ্রীক 'দিয়াসপরা'।

দখল করে তখন শহরের ৯৫% বাসিন্দা খৃষ্টান। এবারে প্রায় সকলেই ধীরে ধীরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। মক্কামদীনা ত্যাগ করে যে সব আরব এখানে আসে তাদের সংখ্যা ১%-ও হবে না। যে ৯১% মুসলমান হয়ে যায় তারা যুগ যুগ ধরে জেরুসলেম তথা প্যালেস্টাইনের (আরবীতে ফলস্তীন) আদিমতম বাসিন্দা (বস্তুত ইহুদিরা বাইরের থেকে এসে এদেশ জয় করে) এবং ইহুদি কর্তৃক যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত হয়েও আপন ধর্ম ত্যাগ করেনি, পরবর্তী যুগে খৃষ্টান হয়ে যায় এবং সর্বশেষে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিজয়ী সেনাপতি ইংরেজ লর্ড অ্যালেন্‌বি যখন প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করেন[২] তখন সেখানে শতকরা ৮৫ মুসলমান, ১০ খৃষ্টান ও ৫ জন ইহুদি। সে ইহুদিরা ততদিনে ধর্ম ছাড়া সর্ব বাবদে আরব হয়ে গিয়েছে—হিব্রু ভাষা বলতে পারে না, বলে আরবী। একাধিকজন কবিতা লিখে আরবী সাহিত্যে সেরা লেখকদের মধ্যে স্থান পেয়ে গিয়েছেন।

প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাজত্ব কায়েম হয়ে 'ইজরেএল' (আরবীতে ইসরাঈল) নাম ধরার তেরো বছর পূর্বে, অর্থাৎ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে আমি একদিন কুদ্‌স (জেরুসলেমের আরবী নাম) শহরের নগরপ্রাচীরের বাইরে দূর যাত্রীর বাস্‌-স্ট্যান্‌ডে দাঁড়িয়ে আছি, তোরঙ্গটি মাটিতে রেখে। বাসনা, যাবো ন্যাজারিথ (নাজরেৎ, আরবীতে অর্থাৎ বর্তমান যুগে প্রচলিত নাম 'অন্‌-নসীরা' —আদি যুগের খৃষ্টানদের ঐ নাম থেকে 'ন্যাজরীন' নামে ডাকা হত। মুসলমানরা আজো ওদের 'নসারা' নামে পরিচয় দেয়) যেখানে প্রভু যীশু বাল্যকাল কাটান, মা মেরি (আরবীতে 'মরিয়ম') যে কুয়োথেকে জল আনতে যেতেন সেটা নাকি তখনো আছে! আরো নাকি আছে, মা-মেরির বর জোসিফ-এর (আরবীতে ইউসুফ) ছুতোরের কারখানা। ইনি যীশুর পিতা নন। কারণ প্রভুর জন্ম হয়েছিল কুমারী-গর্ভে, পবিত্র আত্মা দ্বারা। নিউ টেসটামেনট ও কুরান শরীফ, দুই-ই এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, মা-মেরির বর জোসিফ র‍্যাঁদা দিয়ে কাঠ পরিষ্কার করে কাঠে কাঠে জোড়া দিতেন আর প্রভু যীশু মানুষের চরিত্র পরিষ্কার করে মানুষে মানুষে জোড়া দিতেন। যে

---

২ ইংরেজ অ্যালেন্‌বি যখন জেরুসলেমে প্রবেশ করেন তখন সে-খবর একজন অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যকে দিলে পর সে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে বলে, 'তাই তো! প্রভু খৃষ্টের জন্মকালে যে সব মেষপালককে দেবদূত সে-সুসমাচার জানান, তাদের বংশধরদের একটু হুঁশিয়ার করে দিলে হয় না যে—ইংরেজ ভেড়ার পালে ঢুকেছে—মতলবটা ভালো নয়।' 'শপ্‌-লিফ্‌টার' ইংরেজ 'শীপ্‌-লিফটিঙে'ও যে কিছু কম যান না সেতত্ত্ব আউসি বিলক্ষণ জানতো। তার হুঁশিয়ারি কিন্তু পরবর্তী যুগে টায় টায় ফলেনি। ইংরেজ যখন দেখলে যে সে 'নেটিভদের' সঙ্গে পেরে উঠবে না, তখন তাদের পিছনে ইহুদিদের লেলিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে গেল। আর ইহুদি যে শুধু ভেড়াগুলো মেরে দিলে তাই নয়, নেটিভদের জর্ডনের 'হে-পারে' (আমরা যেরকম বলি 'পদ্মার হে-পারে) খেদিয়ে দিলে।

স্যামারিটানদের প্রভু যীশুর গোষ্ঠী এবং তাঁর কট্টর ইহুদি সম্প্রদায়ের শিষ্যরা দু চক্ষে দেখতে পারে না তিনি করেছেন তাদের প্রশংসা—গুড স্যামারিটান। এই স্যামারিটানরাও ইহুদি, কিন্তু যেসব ইহুদিরা ইজরাএল সৃষ্টি করেছে এদের সঙ্গে স্যামারিটানদের দ্বন্দ্ব চলেছে প্রায় তিন হাজার বছর ধরে। জেরুসলেমে প্রতিষ্ঠিত রাজা সলমনের (আরবীতে সুলেমান) মন্দির যে ইহুদির পরমেশ্বর য়াহভের (জেহোভা, ইলোহিম) পীঠস্থল একথা স্বীকার করেনি। আজ সেখানে নাবলুস শহর (বাইবেলের 'শেখেম') তারই পাশে গেরিজিম পাহাড়ের উপর ছিল তাদের আপন মন্দির।[৩]

একদা এই স্যামারিটান জাতি সংখ্যায়, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে মূল ইজরা-এলিদের চেয়ে কোনো অংশে হীন ছিল না। তাবৎ ইহুদি যখন প্যালেস্টাইন পরিত্যাগ করে তখন শত অত্যাচার সহ্য করে দেশের মাটি কামড়ে ধরে এরা পড়ে থাকে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'স্বগোত্রে' বিবাহের ফলে এদের সংখ্যা কমতে কমতে এখন মাত্র চারশতে এসে দাঁড়িয়েছে।

---

৩ এ জায়গাটা ছিল জরডন এলাকায়। হালে ইজরাএল বাহিনী সেখানে পেঁছে গেরিজিম মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর ইজরাএলের জাতীয় পতাকা তুলতে গেলে স্যামারিটানদের সঙ্গে হাতাহাতির উপক্রম হয়। পরধর্ম বাবদে ইহুদিরা ঈষৎ অসহিষ্ণু এ তত্ত্বটি ইংরেজ জানতো বলেই ইজরাএল রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় (১৯৪৮) তারা খৃষ্টান মুসলিম গির্জা মসজিদে ভর্তি প্রাচীন জেরুসলেম (ইহুদিদের বিশেষ কোনো স্থাপত্য এ শহরে আজ আর নেই, কারণ রাজা হাদরিয়ান শব্দার্থে এ নগরের উপর হাল চালিয়েছিলেন এবং ঐ সময়ই ইহুদিকুল শেষবারের মত জেরুসলেম পরিত্যাগ করে বলে পরবর্তী যুগে কিছু নির্মাণ করার সুযোগ পায়নি) ইজবাএলের শত মিনতিভরা কাতর রোদনে কর্ণপাত না করে মুসলমান জরডনরাজকে দিয়ে দেন। হালের যুদ্ধের ফলস্বরূপ ইজরাএল যখন প্রাচীন জেরুসলেম অধিকার করে তখন এ-যুগের ইংরেজ লেবার (অর্থাৎ ঐতিহ্যহীন অনভিজ্ঞ) সরকার কোনো উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু স্যামারিটানদের মন্দিরে ইজরাএলের ব্যভিচারের খবর ইংলণ্ডে পেঁছিনো মাত্রই লেবার-বাবুদের কানে জল গেছে। নিরাপত্তা পরিষদে চিৎকার করে ইংরেজের ফরিনমন্ত্রী ব্রাউন একাধিকবার বলেছেন, ইহুদিকে প্রাচীন জেরুসলেম ছেড়ে দিতেই হবে। এই প্রাচীন নগরের ভিতরে রয়েছে খৃষ্টের বিরাট—সত্যই অতি বিরাট—সমাধি। সৌধ (হোলি সেপালকর), গেৎসিমেনের বাগান যেখানে প্রভু যীশুর দেহ থেকে স্বেদের পরিবর্তে রক্ত বেরোয়, মাউণ্ট অলিভ এবং ভিয়া দলরসা—যে পথ দিয়ে প্রভু ক্রুশ বহন করে বধ্যভূমিতে পেঁছন। (মুসলমানদের হরমশরীফ, মসজীদ-উল-আকসা বাদ দিচ্ছি—এগুলোর জন্য ইংরেজের কোনো দরদ না থাকাই স্বাভাবিক)। ইজরাএলের 'সাতিশয় বিবেচক করুণ করে' এগুলো সঁপে দিতে ব্রাউন হিম্মৎ পাচ্ছেন না। কিসের হাতে যেন কি সমর্পণ!

আমি যখন পুণ্যভূমিতে যাই তখন দেখি খবরের কাগজে একটা তর্কবিতর্ক চলেছে। যদ্যপি আজ খবর-প্রতিষ্ঠানগুলো বলছেন, স্যামারিটানদের সংখ্যা আনুমানিক প্রায় চারশ', আমাকে কিন্তু তখন বলা হয়েছিল প্রায় আশী। খবরের কাগজে আলোচনা হচ্ছে, এই স্যামারিটানদের 'প্রধান রাব্বি'-র (পণ্ডিত পুরোহিতের) একমাত্র জোয়ান ব্যাটা—ইনিই পরে প্রধান রাব্বি হবেন—'সোমত্ত' হয়েছেন, এখন তাঁকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু হায়, কনে কোথায়? মাসীপিসীদের অর্থাৎ অগম্যাদের বাদ দিলে তিনি যে দুটি বধূকে বিয়ে করতে পারেন তাদের একটির বয়স ষাট এবং তিনি তারস্বরে চিৎকার করে বলছেন—আমাদের আইবুড়ো জাতকুলীন বৃদ্ধারা যা বলে থাকেন—'তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! এখন সাজবো কনে বউ! কী ঘ্যান্না। কী ঘ্যান্না'। এবং তদুপরি দ্রষ্টব্য, এই বৃদ্ধাকে বিয়ে করলে বংশ রক্ষা হবে না, এবং এ স্থলে সেইটেই সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বধূটি বোবাকালা ইডিয়েট।...স্যামারিটানরা আড়াই হাজার বছর ধরে ইজরাএলিদের সঙ্গে বিয়েশাদী করেনি। এখনই বা করে কি প্রকারে? এসব গুল-গ্যাশ আমি শুনেছি প্রাচীন জেরুসলেমের হেরোদ গেটের কাছের (এখানেই ভারতীয় হস্পিস্—সরাইখানা, চট্টি যা খুশী বলুন—অবস্থিত) কাফে—আড্ডাতে। এর শতকরা ৯৯% পাঠক বাদ দিতে পারেন। মোদ্দাটুক্ শুধু এই ঃ যুবক রাব্বিপুত্রের জন্য বিবাহযোগ্যা বধূ সে-কুলে নেই।

অতএব স্থির হল, ঐ জাতশত্রু ইজরাএলি ইহুদিদেরই কোনো মেয়ে বিয়ে করো। হাজার হোক, ওরা তো ইয়াহভে মানে, ধর্মগ্রন্থ পেনটাটয়েশ স্বীকার করে। খৃষ্টান, মুসলমান তো আর বাড়িতে তোলা যায় না।

ন্যাজরিথ যাবার পথে পড়ে স্যামারিটানদের নাবলুস; নিশ্চয়ই দেখে যেতে হবে। নিঃসন্দেহে যারা অন্তত তিন হাজার বছর ধরে ভিটের মাটি (ওঃ! আর সে কী মাটি, বালি পাথরে ভর্তি!) কামড়ে ধরে পরে আছে, তারা দ্রষ্টব্য বই কি।

* * *

সে-আমলে প্যালেস্টাইনে চলতো তিন রকমের বাস্। আরব বাস্ ইহুদি বাস্ আর স্টেট বাস্। কাট্যা ফালাইলেও ইহুদি চড়তো না আরবের বাস্ এবং ভাইস্ ভার্সা। দু'দলেই চড়তো স্টেট বাস্।

আত্মচিন্তায় নিমগন আমার সামনে এসে হঠাৎ দাঁড়ালো একখানা করকরে নতুন ট্যাক্সি। আরব ড্রাইভারের পাশে দেখি গোটা পাঁচেক মেল-ব্যাগ। পিছনের সীটে জাব্বা জোব্বা পরা ইয়া মানমনোহর গলকম্বল দাড়িওলা দুই রাব্বি। এক রাব্বি পিছনের দরজা খুলে বার বার বলে যাচ্ছেন, 'উঠে পড়ো, উঠে পড়ো'।

আমি ক্ষণে সালাম জানিয়ে, ক্ষণে জোড়-হাতে নমস্কার করে (এটা ভারতীয়দের পেটেন্ট মাল—বিদেশী মাত্রই চেনে!), ক্ষণে ডান হাত বুকের বাঁ দিকের উপর রেখে ঝুঁকে ঝুঁকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'ট্যাক্সিতে যাবার মত

কড়ি আমার গ্যাঁটে নেই। আমি যাবো বাস্-এ।'

দুই রাব্বি যা বলেছিলেন—আহা কী সুন্দর অত্যুৎকৃষ্ট বিদগ্ধ নাগরিক আরবী ভাষাতে—তার তাৎপর্য 'কী উৎপাত, কী জ্বালাতন! উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। আমরা কি কানা! দেখতে পাচ্ছি নে, তুমি ভিনদিশী? আমরা তো ট্যাক্সিটার সাকুল্যে পিছন দিকটা ভাড়া নিয়েছি। উঠে পড়ো উঠে পড়ো। কী মুশকিল! আচ্ছা বাপু, তুমি বাস্-এ যে ভাড়া দিতে সে-ই না হয় আমাদের দেবে।' এই বেলা বলে নি, পরে, বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও সেটা তাঁরা নেননি।)

কিন্তু ইয়া আল্লা, বসি কোথায়! গোটা তিনেক মোরগামুরগী ক্যাঁক মাক করছে, দু'তিন ঝুড়ি আলু-টমাটো-মটরশুঁটি-কপি, দু খালুই ডিম, আর কি কি ছিল খোদায় খবর।

রাব্বিরা বরাম্বর বলে যাচ্ছেন, 'হয়ে যাবে, হয়ে যাবে।'

এক রাব্বি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললেন, 'মেয়ের শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি। তাই এত সব।'

আমি চোখের তারা কপালে তুলে বললুম, 'বলেন কি মশাই! এই তিনটে আণ্ডা, গোটা কয়েক মুরগীতেই আপনাদের দেশের কন্যাপক্ষ খুশী হয়ে যায়! তাজ্জব! তাজ্জব!! আমাদের মোশয়, সিনাই পর্বত প্রমাণ মাল নিয়ে গেলেও হালাদের মুখে হাসি ফোটে না।'

আমার জেবে একটা হাতির দাঁতের ডিবাকার নস্যির কৌটো ছিল। নস্যা-ভাবে সেটাতে রাখতুম মিশরীয় সুগন্ধি। সেইটা তুলে ধরলুম তাদের সামনে।

দুই রাব্বি আমাকে জাবড়ে ধরে চুমো খেতে লাগলেন।

বিস্তর কথাবার্তা হল। নাবলুস, ন্যাজারিথ গল্পের তোড়ে পেরিয়ে গিয়ে তখন পেঁছে গিয়েছি গেলিলিয়ান লেক-এ।

দুই রাব্বি আমার মাথার উপর হাত রেখে বিস্তর মন্ত্র পড়ে গেলেন। তাঁদের আশীর্বাদের এক কণাও যদি সফল হয় তবে আমি ভারতবর্ষের রাজা হব।

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর

সুইটজারল্যান্ডের রামগাড়ল হ্যার পল্ডি নাকি একদা একটা দাঁড়কাক পুষেছিল।

বন্ধু শুধালে, এ কী ব্যাপার! কাক আবার কেউ পোষে নাকি? বৈজ্ঞানিক-সুলভ অর্ধমুদ্রিতনয়নে পল্ডি বললে, ঐ যে লোকে বলে দাঁড়কাক একশ' বছর বাঁচে, সেটা ঠিক কিনা আমি হাতে-নাতে নিজে দেখে নিতে চাই।

মুচকি হাসুন, আপত্তি নেই। কিন্তু আমি নিজেই পল্ডির মতই বটি।

চিন্তা করুন তো এই যে ইহুদি জাত—বিস্তর ঘোরাঘুরি করে, হাজার দুই

বছর ধরে এ-জাত, ও-জাত সে-জাতের কাছে মার খেয়ে খেয়ে গোলামী করে করে প্রথম আপন রাজ্য গড়ে তোলার সুযোগ পেল খৃষ্টজন্মের হাজারখানেক বছর পূর্বে, রাজা সুলেমানের আমলে। কিন্তু হায়, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সেই 'গ্লরি' খানখান হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তিনি ইহুদিদের সদাপ্রভু য়াহ্‌ভের জন্য যে 'বিরাট' মন্দির গড়েছিলেন তার স্মৃতি ইহুদিরা আজও প্রতি শনির স্যাবাৎ পরবে স্মরণ করে।[১]

তারপর খেল মার ফের ঝাড়া একটি হাজার বছর ধরে। আর বাবিলনের রাজা তো একবার প্রায় গোটা গোষ্ঠীটাকে ধরে নিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখে দিলেন আপন দেশে। দু' পুরুষ সেখানে কাটিয়ে কোনোগতিকে প্রাণ নিয়ে তারা ফিরলো ফের প্যালেস্টাইনে।

সুলেমানের হাজার বছর পর ফের তারা পেল আরেকটা চানস। প্রভু যীশুর জন্মের কয়েক বছর পূর্বে, রাজা হেরডের আমলে (এরই পুত্রের সামনে 'বিচারের' জন্য প্রভু যীশুকে পাঠানো হয়), আবার জেরুসলেম তথা ইহুদি জাতের মুখে হাসি ফুটলো। ধনদৌলত তো বাড়লোই, তদুপরি সুসভ্য বাবিলনে তারা যে-সব জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয় তারই কাঠামোতে ফেলে আপন প্রাচীন শাস্ত্রাদির নূতন নূতন টীকাটিপ্পনী রচনা করলে। হেরড আবার নূতন করে য়াহ্‌ভের মন্দির গড়লেন।

কিন্তু এবারে যে দুর্দৈব এল, তার সঙ্গে পূর্বেকার কোনো অভিজ্ঞতারই তুলনা হয় না।

খৃষ্টজন্মের ৭০ বৎসর পর রোমানরা জেরুসলেম আক্রমণ করে শহর এবং দুর্গ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে য়াহ্‌ভের মন্দির পুড়িয়ে ছাই করে দিল ; এক ইহুদি ঐতিহাসিকের ভাষায় "Amid circumstances of unparalelled horror, Jerusalem fell. The temple was burnt and the Jewish State was no more."

এই কি শেষ ? হ্যাঁ, কিন্তু ইহুদি রাষ্ট্র লোপ পাওয়া সত্ত্বেও ইহুদিরা জেরুসলেম নগরে বসবাস করতে লাগল। ওদিকে তাদের উপর রোম সম্রাটের কুশাসন ক্রমে ক্রমে এমনই বেড়ে যেতে লাগল যে শেষটায় ১৩২ খৃষ্টাব্দে তারা রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো—অবশ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য, ইহুদিদের অনেকেই এ রকম বছরের পর বছর ধরে বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করতে মানা করেছিলেন। আমরা জানি স্বয়ং খৃষ্ট রোমানদের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা

---

১ তিন হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এই মন্দিরের গুণকীর্তন করে করে তার পরিধি ও ঐশ্বর্য এমনই বাড়িয়েছে যে বাস্তবের সঙ্গে আজ আর তার কোনো মিলই নেই। বাইবেল অনুযায়ীই দেখা যাচ্ছে, মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট, প্রস্থ ৭০-এর একটু বেশী (বাইবেল, কিংজ ১ ; ৬ অধ্যায়)! এ যেন সেই—'লোক মরে লক্ষ লক্ষ কাতারে কাতার! গুনিয়া দেখিনু শেষে আড়াই হাজার॥'

করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

এবারে রোমানরা যা করল তার সঙ্গে ৭০ খৃষ্টাব্দের মন্দির পোড়ানোরও তুলনা হয় না। হাদ্‌রিয়ানের আদেশে সমস্ত শহর পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে তার উপর হাল চালানো হল। খুব সম্ভব হাদ্‌রিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল, রাজা দায়ুদের গোর, সুলেমানের মন্দির এমনই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, যাতে করে পরবর্তী যুগে ইহুদিরা সেগুলো খুঁজে বের করে সমাধিসৌধ এবং নূতন মন্দির গড়ে তাদেরই চতুর্দিকে নবীন বিদ্রোহ, নবীন রাষ্ট্রের সূত্রপাত না করে।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক হুকুম জারি হল ঃ ইহুদি মাত্রেরই হাদ্‌রিয়ান নির্মিত নবীন জেরুসলেমে প্রবেশ নিষেধ। অর্থাৎ রোমান, খৃষ্টান, আরব, গ্রীক ও অন্যান্য নানা সম্প্রদায় নানা শেমিতি তথা মিশরীয়রা সেখানে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারবে কিন্তু য়াহ্‌ভের উপাসকরা সেখানে প্রবেশাধিকারও পাবে না।

এর পরই ইহুদিরা ব্যাপকভাবে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো।

আজ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ। জেরুসলেমের উপর হাদ্‌রিয়ান হাল চালান ১৩২ খৃষ্টাব্দে, হেরডের মন্দির ধ্বংস হয় ৭০ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ আজ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী বীর রূপে যে ইহুদিরা জেরুসলেমে প্রবেশ করলো সেটা যথাক্রমে আঠারো বা উনিশশ' বছর পর। কিন্তু এই তৃতীয় পর্যায়ের কথা পরে হবে।

প্রথম পর্যায়ে রাজা সুলেমান যে ইহুদি-প্রাণাভিরাম মন্দির নির্মাণ করেছিলেন সেটা সম্ভব হয়েছিল প্রতিবেশী ফিনিশিয় রাজা টায়ার-(বর্তমান লেবানন অঞ্চল)-অধিপতি রাজা হিরমের সাহায্যে। বস্তুত রাজা সুলেমান স্বাধীন হলেও তাঁর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হিরমকে তিনি অনেক প্রকারে সেবা করে সে সাহায্য পান। এচ. জি. ওয়েলস তো তাঁর ইতিহাসে তাচ্ছিল্যভরে বলছেন, "There is much in all this (অর্থাৎ সুলেমানের সেবা) to remind the reader of the relations of some Central African chief to a European trading concern."

অর্থাৎ অর্ধ বর্বর নীগ্র চীফ যে রকম শক্তিশালী ইয়োরোপীয়কে কাঁচা মাল সস্তা লেবার যুগিয়ে সভ্য জগতের এটা সেটা পায়, সুলেমানের বেলাও তাই। এবং তার পরই বলছেন, "এবং বাইবেল পড়লেই দেখা যায়, সুলেমানের রাজ্য was a pawn between (হিরমের) Phoenicia and Egypt." এবং বাইবেলেই আছে সুলেমান তাঁর রাজ্যের উত্তরার্ধ হিরমকে দিয়ে দেন বা দিতে বাধ্য হন।[২]

---

২ বাইবেল, কিংজ ১।২১। উত্তর গ্যালিলির এই অঞ্চলেই ইজরায়েল সিরিয়ার হালে সংঘর্ষ হয়। অনুর্বর প্রস্তরময় এই ভূমি কিন্তু বড় ঐতিহাসিক মূল্য ধরে। গ্যালিলি হ্রদের এই উত্তর তীরে যীশু তাঁর প্রথম ও প্রধান প্রচারকার্য আরম্ভ করে টিলার উপরে বসে 'সারমন অব দ মাউনট' ('ধন্য যাহারা আত্মাতে দীন-হীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই') উপদেশ দেন। এখানেই তিনি সাত-

পূর্বেই বলেছি, এর হাজার বছর পর দ্বিতীয় চান্স্ পান রাজা 'হেরড দা গ্রেট'।

ইনি আবার সংস্কার করে গড়ে তুললেন নব জেরুসলেম। সুদৃঢ় নগর প্রাচীর, বিরাট রাজপ্রাসাদ, নানা অট্টালিকা—এবং সব চেয়ে বড় কথা—সুলেমানের মন্দির নব মহিমামণ্ডিত করে-গড়ে তুললেন। এ ছাড়া প্যালেস্টাইনের সর্বত্র প্রাচীন নগরী সংস্কার ও বহু নূতন নগর স্থাপনা করলেন। বস্তুত ইহুদিদের এ যুগকে দ্বিতীয় সত্যযুগ বলা যেতে পারে।

কিন্তু 'রাজা' হেরড ছিলেন সুলেমানের চেয়ে পরমুখাপেক্ষী। তিনি ছিলেন রোম সম্রাটের অধীনে পরাধীন রাজা। মিশর রাণী ক্লেওপাত্রা-বল্লভ-রোমশাসক অ্যানটনির কৃপায় তিনি 'রাজা' উপাধি পান ও তাঁকে রোম সাম্রাজ্যের 'ক্লাএন্ট প্রিন্স' হিসাবে প্যালেস্টাইন শাসন করতে হত। অ্যানটনির আত্মহত্যার পর তিনি পান রোম রাষ্ট্রপ্রধান (কার্যত সীজার) অক্টাভিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতা।

অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রথম দফায় সুলেমান তাঁর গ্লরি গড়লেন ফিনিশিয় রাজা হিরমের সহায়তায়; তার এক হাজার বছর পর দ্বিতীয় দফেতে 'রাজা' হেরড ইহুদিকুলের গৌরব বৈভব পূর্ণ করে তুললেন রোম শাসকের সাহায্যে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেটাও বিনষ্ট হল ৭০ বছরের ভিতর ও তারপর কেটে গেল আরও দু হাজার বৎসর। এবারে তৃতীয় দফাতে, ১৯৬৭-এর জুন মাসে ইহুদি প্রবেশ করল বিজয়ী বীরের বেশে প্রাচীন জেরুসলেম নগরে। পুরোভাগে জঙ্গীলাট দায়ান। বিশ্ব ইহুদি উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠলো, ইনিই "মাশীয়হ্।"—মিসায়া (Meesiah), খৃষ্টানের যীশু (খৃষ্ট শব্দের অর্থেও 'মিসায়া') মুসলমানের মসীহ =মাহ্দী, হিন্দুর কল্কি।

এবারে তৃতীয় দফাতে এ-'মাশীয়হ্' এ-কল্কির পিছনে কে?

আন্কল স্যাম—জনসন!

* * *

কিন্তু এবারেও যদি ইহুদিরা ফেল মারে তবে আগের এক হাজার, তারপর দু'হাজার সেই হিসেবে ফোর্থ চান্স পাবে চার হাজার বছর পরে।

লেখনারম্ভের পল্ডি হয়ত বা দেড়শ বছর পরমায়ু পেয়ে দাঁড়কাক একশ' বছর বাঁচে কিনা পরখ করে যেতে পারবে, কিন্তু 'ইওরস অবিডিয়ান্ট্লি' এ অধম তো চার হাজার বছর বাঁচবে না! আল্লাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমেন॥

খানি রুটি ও ছোট্ট কয়েকটি মাছ দিয়ে চার হাজার লোককে খাওয়ান। এরই কাছে মগদলা গ্রাম, যেখান থেকে নর্তকী, পরে তাপসী মেরি মগডলীন (অক্স্ফরডের মডলিন কলেজ। maudlin tears; কেম্ব্রিজের মডলিন বানানে পিছনে e অক্ষর আছে। যীশুর কাছে আসেন। পাঠক যদি অপরাধ না নেন তবে বলি, এখানেই আমি সর্বপ্রথম গ্যালিলি হ্রদের মাছ খাই। তার অপূর্ব স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এ অঞ্চল সম্বন্ধে সবিস্তর লেখার বাসনা আছে।

রোদন-প্রাচীর—ক্লাগে-মাস্তার

প্রাচীরটা যে প্রাচীন সেটা দেখা মাত্রই বোঝা যায়। কত প্রাচীন, সেটা অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঐতিহাসিক গবেষণা না করে বলতে যাওয়াটা অবিবেচকের কর্ম হবে। তবে এ নগরে যারা বাস করে তারা ছেলেবেলা থেকেই চতুর্দিকের এত সব প্রাচীন দিনের ভগ্নাবশেষ দেখে আসছে যে তাদের চোখ যেন বসে গেছে; আপন অজানতেই অবচেতন মন জরাজীর্ণ পাষাণ-স্তূপের একটার সঙ্গে আরেকটা তুলনা করে করে যেন প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের কতগুলো সাদামাটা কাঁচা-পাকা সূত্র নির্ণয় করে ফেলে। এমন কি যে বিদেশী প্রাচীন ভগ্নস্তূপ অতি অল্পই দেখেছে—যেমন ধরুন মামুলী মারকিন—সে পর্যন্ত এখানে কিছু-দিন থাকার পর এটা-ওটার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বেশ কিছুটা ওয়াকিফহাল হয়ে যায়—অবশ্য যদি 'গাঁইয়া' মারকিনের মত চোখে ফেটা কানে তুলো মেরে 'টুরিজম' কর্ম না করে।

মোটা, দড়, ভারিক্কি প্রাচীর। প্রায় বিশ গজ উঁচু, অন্তত পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন গজ লম্বা। রোদে জলে পাথরের চাঁই তার মসৃণতা হারিয়ে খোওয়া-খাওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু পাথরে পাথরে যে জোড়া লাগানো আছে সেটা আজো যেন প্রথম দিনের মত মোক্ষম। রঙ প্রায় কালো।

কিন্তু আশ্চর্য, এ প্রাচীর যে এখানে কি করতে আছে সেটা কিছুতেই অনুমান করতে পারলুম না। অন্য প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সে কোনো চত্বর বা বাড়ির বেষ্টনী নির্মাণ করেনি। শহরের মাঝখানে না হয়ে যদি ফাঁকা মাঠে এটা দেখতুম তবে হয়তো বলতুম, এটা চাঁদমারির (টারগেট শ্যুটিঙের) দেয়াল। এখানে এটার—স্থাপত্যে যাকে বলে আরকিটেকচরল ফংশন কি?

একটি প্রৌঢ়া মহিলা—সর্বাঙ্গ লম্বা ভারী কালো জোব্বায় ঢাকা, মাথায় কপাল পর্যন্ত অবগুণ্ঠন, শুধু মুখের লালচে হলুদ রঙের আভা দূর থেকে দেখা যাচ্ছে—এক হাত উপরে তুলে দেয়ালে রেখেছেন, দেয়ালে হেলান দিয়ে, মাথাটিও দেয়ালের উপর কাত করে রেখে যেন কোনো গতিকে দাঁড়িয়ে আছেন। খানিকটে এগিয়ে যেতে দেখি, তাঁর দু' চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, আর ঠোঁট দুটি অল্প-অল্প কাঁপছে যেন, কেমন মনে হল, মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। কোনো প্রিয়জনের স্মরণে? কিন্তু কই, কাছে-পিঠে কোথাও তো কোনো গোরস্তান নেই। আমি আর এগোলুম না। রোদ চড়তে আরম্ভ করেছে। বাঁদিকে মোড় নিয়ে হেরড গেটের কাছে ভারতীয় ধর্মশালার দিকে রওয়ানা হলুম।

একটা ছোট বাজারের ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

প্রায়ান্ধকার রাস্তা—হাত ছয় চওড়া। দুদিকে দোকানের সারি—আর রাস্তার উপরটাও ঢাকা বলে মনে হয় গোধূলির অন্ধকার যেন নেমে আসছে। তবু ফলের দোকানে কী রঙের বাহার! সব চেয়ে চোখে পড়ে আমাদের

কমলানেবুর তিনগুণ সাইজের জাফা অরেনজ্। মধুর মত মিষ্টি রসে টইটম্বুর। দুপুরে একটা খেলে সে-বেলা আর যেন অন্নে রুচি হয় না। দুটো খেলে গা বিড়োয়।

একটা কিউরিওর দোকান। টুকিটাকি অলঙ্কার, তাবিজ, তসবী, রেকাবি, গেলাস, তীর, ধনু, আরো কত কি! কোনোটা নাকি পাঁচশ, কোনোটা নাকি পাঁচ হাজার বছরের পুরনো! আমি অবশ্য জানতুম, এগুলোর ৯৯%কাইরোর কারখানায় তৈরি হয়। কোনো-কোনোটাতে এস্তেক সরকারী ক্ষুদে শীলমারা আছে: সরকারী মিউজিয়াম গ্যারান্টি দিচ্ছেন, এটা প্রাচীন দিনের কোনো পিরামিডে বা গোর খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। বলে আর কি হবে, মাল যেমন জাল, শীলও তেমনি।

সামনে দাঁড়িয়ে সেই জরমন টুরিস্ট্ ছোকরা। পরশুদিন আমি এদেশে এসেছি—ছোকরা বেশ কয়েক সপ্তাহ হল। আলাপ হয়েছে কাল সকালে, খৃষ্টের সমাধিসৌধে অর্থাৎ হোলি সেপাল্কর-এ। অবাক হয়ে বললুম, 'এ কি ভায়া, এসব যে বিলকুল ডাড্—জাল মাল।'

একগাল হেসে বললে, 'আমার নোটও জাল।'

একসঙ্গে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলুম।

খানিকক্ষণ পরে আমি সেই দেয়ালের ধারের মহিলাটির কথা পাড়লুম।

বললে, 'সে তো ক্লাগে-মাত্তার।'

জর্মন ভাষায় 'ক্লাগে' অর্থ 'লেমেনটেশন' অর্থাৎ 'বিলাপ': 'মাত্তার' অর্থ 'প্রাচীর'। বিলাপ করার প্রাচীর। আমি বললুম, খুলে বলো।

পরম তাচ্ছিল্যভরে ঘেঁৎ করে উঠলো, ইহুদিদের কি যেন একটা কী, আমার ও নিয়ে কোনো শিরঃপীড়া নেই। ঐ যে, কে এক হিটলার, সে শিখেছে ইহুদিদের কাছ থেকে একটা মারাত্মক তত্ত্ব—ইহুদিরাই এ পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বলে তারা বিশ্বেশ্বর য়াহ্ভের "নির্বাচিত সর্বোৎকৃষ্ট জাতি"—অন্যেরা বলতো, অমর ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রিয় জাতি আমরা। ওনরা বিশ্বেশ্বরের। হিটলার ওদেরই কাছ থেকে এই অদ্ভুত, প্রলয়ংকরী, জাতে জাতে রক্তাক্ত সংগ্রামসৃষ্টিকারী বীজমন্ত্র শিখে নিয়ে বললে, "বটে! এত বড় মিথ্যে কথা! সার সত্য কিন্তু, হে বিশ্বজন, জেনে নাও:—আমরা, আর্যরা, এবং তাদের ভিতরও নীল চোখ, সোনালী চুলওলা নরডিকরা ত্রিলোকের সর্বোৎকৃষ্ট জাত।" এবং এইখানেই হিটলার থামলো না; বললো, "এবং ইহুদিরা এ জগতে কাফরী নীগ্রোর মত উন্টর মেন্শ (মানব পর্যায়ের নিম্নস্তরের সৃষ্টি)ও নয়। তারা ভার্মিন, নরকের কীট! যথেষ্ট হয়েছে; আমি ওসব কেঁদলে নেই।'

* * *

নিরপেক্ষ ইতিহাস বলেন, হেরড দ গ্রেট খৃষ্টজন্মের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে জেরুসলেমে যে বিরাট বিচিত্র য়াহ্ভের মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন সেটা আকারে-প্রকারে সর্বভাবে হাজার বছর পূর্বেকার সুলেমানের টেম্পলের

চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল।[১] রোমানরা এ মন্দির ৭০ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে।

'পরিপূর্ণ সম্পূর্ণ বিনষ্ট' করেনি। বিরাট মন্দির-চত্বরের চতুর্দিকে যে প্রাচীর একে পরিবেষ্টন করে ছিল তার একটি ক্ষুদ্র অংশ, কি কারণে জানি না, আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে—এরই বর্ণনা দিয়ে এ-লেখা আরম্ভ করেছি।

কবে এ প্রথা, অনুষ্ঠান বা আচারটা আরম্ভ হয় সেটা বলা কঠিন। অন্তত ষোলশ' বছর তো হবে।

প্রতি শুক্রবারের বিকালে দেড়/দুই হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এই দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে বিলাপ রোদন করছেন। অনেকক্ষণ ধরে যে দীর্ঘ মন্ত্রোচ্চারণ করেন সেটিতে বার বার যে ধুয়া আসে (আমার যত দূর স্মরণে আসছে তারই উপর নির্ভর করে বলছি, কারণ বহু চেষ্টা করেও এই সুন্দর 'কিনোৎ'—ইংরিজি 'এলিজি' মন্ত্রটি যোগাড় করতে পারিনি) তার নির্যাস 'আমাদের সর্বগৌরব-মহিমার যে মন্দির ধ্বংস হয়েছে আমরা তারই স্মরণে এই বিজনে রোদন করি'।

যত দূর মনে পড়ছে রাব্বি—পুরোহিত সে 'গৌরব-মহিমার' কিছুটা বর্ণনা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই উপরের ধুয়াটি বলে। ফের রাব্বি আরো খানিকটা বর্ণনা দেন, ফের উপাসক-মণ্ডলী ঐ ধুয়ার পুনরাবৃত্তি করে। বিলাপের সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রুধারা বয়।

প্রতি শুক্রবারের বিকালে ইহুদিরা এই প্রাচীরের দিকে মুখ করে এই 'কিনোৎ' বিলাপ করেন। অন্যান্য দিনও যে কোনো সময় দু'একজনকে কাঁদতে দেখা যায়। আমি যে মহিলাটিকে দেখেছিলুম ইনি তাঁদেরই একজন। আর ইহুদি পঞ্জিকা অনুসারে তাঁদের 'আব্' মাসের ৯ তারিখ মন্দির ধ্বংসের সাম্বাৎসরিক কিনোৎ।

প্রাচীন জেরুসলেমের যে অংশে এই প্রাচীরটি পড়েছে সেটি মন্দির ধ্বংসের বহু পূর্ব থেকে গত জুন মাস পর্যন্ত ছিল হয় রোমান না হয় খৃষ্টান নয় আরবদের অধীনে। গত জুন মাসে আরব-ইজরাএল যুদ্ধের সময় আরব শাসনকর্তা ও প্রজাকুল নগর ত্যাগ করে জরডন নদীর পূর্ব পারে চলে যায়।

বিজয়ী ইহুদি প্রধান সেনাপতি দায়ান ও পুরোহিত বংশজাত (লেভি) প্রধানমন্ত্রী এশকল্ দুই/আড়াই হাজার বছরের পরাধীনতার পর 'বিলাপ প্রাচীর'-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে হাজার হাজার ইহুদি। অতিশয় পরিতাপের বিষয়, যে মহোৎসব সমাধিত হল তার খবর এসেছে মাত্র কয়েক ছত্রে।

আমার মনে প্রশ্ন জাগেঃ এশকল্-দায়ান্ এরা কি সেই প্রাচীন দিনের

---

১ নির্মাণ আরম্ভ খৃঃ পূঃ ২০; নির্মাণ শেষ খৃষ্টাব্দ (খৃষ্টের পর) ৬২। কী ট্রাজেডি! যে মন্দির গড়তে লাগলো প্রায় ৮২ বৎসর, সেটা ভাঙতে (প্রধানত লুট করতে—কারণ ইহুদি মন্দিরে তাদের 'কোষাকুষি' হয় বিরাট আকারের ও নিরেট সোনায় তৈরি) ৮২ ঘণ্টাও লাগেনি! প্রফেট নোআ র (আরবী বাঙলায় নূহ) আরক্ বা নৌকা তুলনীয়।

কিনোৎ-বিলাপ করেছিলেন? করার কি প্রয়োজন? সুলেমান হেরডের মন্দির যেখানে ছিল সেখানে নূতন মন্দির গড়ে তুলে সর্ব গৌরব-মহিমা ফিরিয়ে আনলেই হয়—তাহলে অবশ্য শত শত শতাব্দীর প্রাচীন 'কিনোৎ' পরবটি মারা যায়। আজ যদি ভারতে সর্পকুল লোপ পায় তবে কি মনসা পূজা বন্ধ হয়ে যাবে?

কিন্তু যে জায়গায় প্রাচীন মন্দির ছিল সেখানে তেরশ' বছর ধরে যে মসজিদ!

হজরৎ মুহম্মদের পরলোকগমনের পর আরবদের দ্বিতীয় খলীফা হজরৎ ওমরের সময় ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বাইজেনটাইন খৃষ্টানদের হারিয়ে স্বয়ং ওমর জেরুসলেমে প্রবেশ করেই প্রশ্ন করলেন, নবী সুলেমানের মন্দির ছিল কোথায়? সেখানে তখন শহরের তাবৎ ময়লা-আবর্জনা ভর্তি ভগ্নস্তূপ। খলিফা স্বয়ং স্বহস্তে ময়লা আর পাথর সাফ করতে লাগলেন। দেখাদেখি তাঁর সেনাপতিরা ও সৈন্যদল সে কাজে যোগ দিল। অত্যল্প সময়েই কর্ম সমাধান হলে পর ওমর সেখানে একটি মসজিদ গড়ার হুকুম দিলেন। কারণ মুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী মক্কার কাবার পরই এ স্থানটি দ্বিতীয় পুণ্যভূমি। এরই নাম হরমশরীফ এবং এরই কাছে যেখানে মসজিদ উল্-আকসা[২] সেটিও অতিশয় পুণ্যভূমি কারণ হজরৎ মুহম্মদকে তাঁর জীবিতাবস্থায় বেহেশতে আল্লার কাছে যখন নিশাভাগে নিয়ে যাওয়া হয় (সশরীর না শুধু আত্মা এ নিয়ে মতভেদ আছে) তখন তাঁকে আরবদেশ থেকে প্রথম এই মসজিদ উল্-আকসা ভূমিতে নিয়ে আসা হয়েছিল।

৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ওমর যে সাদামাটা মসজিদ নির্মাণ করেন তার পরিবর্তে খলীফা আব্দুল মালিক আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দে যে মসজিদ সেখানে নির্মাণ করলেন সেটি সত্যই অতুলনীয়। বিশ্ববিখ্যাত স্থপতিদের মতে পৃথিবীর আটটি স্থাপত্যকলার নিদর্শন উল্লেখ করতে হলে এটিকে বাদ দেওয়া যায় না। তবে এটি ঠিক মসজিদ নয়, এটাকে 'পুণ্যসৌধ' বলা চলে—আরবীতে এর নাম কুব্বৎ উস্-সখ্রা (ডোম্ অব্ দ্ রক্)।

এ দুটি না ভেঙে তো সুলেমানের টেম্পল্ গড়া যায় না।

ইতিমধ্যে খবর এসেছে ইহুদিরা জেরুসলেমে প্রবেশ করেই মসজিদ উল্-আকসার উপর ইহুদি পতাকা তুলে পূর্ণ এক দিবস সেটা সেখানে রাখে। অনেকেই এই ঝাণ্ডা ওড়ানোটাকে ইহুদির আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন স্বত্বাধিকার দাবী করার পূর্বাভাস মনে করে শঙ্কিত হয়েছেন। খৃষ্টান উইলসন শঙ্কিত হননি, এবং খৃষ্টান জনসন তো ইহুদির পিছনে রয়েছেনই। যা শত্রু পরে পরে। লেড়েতে শাইলকে লড়াই।

কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিরা চালে করলে একটা ভুল। দায়ান এশকল্

---

২ বছর চল্লিশেক পূর্বে হায়দরাবাদের নিজাম প্রায় পাঁচ লক্ষ (পাকা অংকটি কেউ আমাকে বলতে পারেনি) মুদ্রা ব্যয় করে মসজিদটির আমূল সংস্কার করেন।

সম্প্রদায়ের জাতবৈরী আরেক ইহুদি সম্প্রদায়ের নাম স্যামারিটান। তাদেরও আড়াই হাজার বছরের পুরনো একটা ভাঙা মন্দির পড়ে আছে একটা টিলার উপর। ১৯৪৮ সালে প্যালেসটাইন বিভাগের সময় স্যামারিটানরা কিছুতেই দায়ান হিস্যায় পড়তে চায়নি। তারা জরডনের আরব হিস্যাতে যেতে চেয়েছিল এবং যায়। জুন মাসে আরব সেখান থেকে পালালে পর এ মন্দিরেও দায়ানরা 'দাবি'র ঝাণ্ডা ওড়াতে গেলে হাতাহাতির উপক্রম হয়—যদ্যপি সেস্থলে মাত্র তিন-চারশ' স্যামারিটান বাস করে (তাবত দুনিয়ায় এ সম্প্রদায়ের সাকুল্য সংখ্যাই মাত্র তিন থেকে পাঁচশ') তবু তারা সাহস করে এ 'গুণ্ডামি' রোকতে যায়।

তখন খৃষ্টজগৎ—মাইনাস জনসন—শঙ্কিত হল।

জেরুসলেমে যে রয়েছে প্রভু যীশুর সমাধি মন্দির—এবং গণ্ডায় গণ্ডায় গির্জে। ক্যাথলিক, গ্রীক অরথডকস্, আরমেনিয়ান, কপ্‌ট, হাবশী, সীরিয়ান, লুথেরিয়ান আরো কত জাত-বেজাতের (মুসলমানদের তো মাত্র দুটো—হরম শরীফ আর আকসা)। আজ ঝাণ্ডা ওড়ায়নি বটে কিন্তু মুসলমানের দুটো দখল করার পর ইহুদির হিম্মত বেড়ে যাওয়াতে যদি সে খৃষ্টানগুলোও—?

পোপ শঙ্কিত হন সর্বপ্রথম। তারপর উইলসেন। তিনি হুঙ্কারিলেন, 'বেরিয়ে যাও, প্রাচীন জেরুসলেম থেকে।' দায়ান উত্তরিলেন, 'ইয়ারকি পায়া হৈ? যাব না।'

স্নাব্‌ড্ উইলসন চুপ-ed !!

অল্পে তুষ্ট

॥ ১ ॥

আমার পরিচিত জনৈক সমাজসেবী ভদ্রসন্তান রাত করে বাড়ি ফিরছিলেন। শরট্‌ কট্‌ করার জন্য যে গলি ধরেছিলেন সেটা প্রায় বস্তি অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে এসেছে। হঠাৎ শুনতে পেলেন, পরিত্রাহি চিৎকার—যা এ অঞ্চলে রাত-বিরেতে আকছারই শোনা যায়। সমাজসেবীটি একটু কান পাততেই বুঝতে পারলেন, যুগ যুগ ধরে সমাজ স্বামীকুলকে যে হক্ক দিয়েছে এস্থলে সে-কুলেরই জনৈক বস্তি-সন্তান সেটি তার স্ত্রীর উপর কিঞ্চিৎ পশুবল সহ প্রয়োগ করছে। এস্থলে সুবুদ্ধিমান মাত্রই তিলার্ধ কাল নষ্ট করে না, কিন্তু আমাদের সমাজ-সেবীটি এ-কালের যারা 'সেবার' নামে মস্তানী করে তাদের দলে পড়েন না। দরমার ঝাঁপ ধাক্কা মেরে খুলে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'ব্যস, থামো। এসব কী বেলেল্লাপনা হচ্ছে!' আমাদের পাব্‌লিক স্পিরিটেড ইয়ংম্যানটি নাটকের এর পরের দৃশ্যে অবশ্যই আশা করেছিলেন সেই অবলা মুক্তি পেয়ে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে অঝোরে কৃতজ্ঞতাশ্রু ঝরাবে, এবং তিনিও তাঁর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অদৃশ্য বাতাসের একাংশ অবহেলে দ্বিখণ্ডিত করে, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ'

(ইংরিজিতে যাকে বলে 'নটেটোলনটেটোল') বলতে বলতে আত্মপ্রসাদাৎ ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। ও হরি। কোথায় কি? স্বামী-স্ত্রী দুজনাই প্রথমটায় একটুখানি থতমতিয়ে তারপর বিপুল বিক্রমে হামলা করলে তাঁর দিকে। তিনি প্রায় পালাবার পথ পান না। ইতিমধ্যে বস্তির আরো দু-পাঁচজন জড়ো হয়ে গিয়েছে। সমাজসেবী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন ওদেরও দরদ যুযুধান দম্পতির প্রতি।

এটা কিছু একটা উটকো ফ্যাচাং নয়। পরবর্তী যুগে আমি দেশবিদেশে—এস্তেক অতিশিক্ষিত মধ্য ও পশ্চিম ইয়োরোপেও এহেন কীর্তন একাধিকবার শুনেছি। দুজনার কাজিয়া মেটাতে গিয়েছ কি মরেছ। দুজনা একজোট হয়ে তোমাকে মারবে পাইকিরি কিল।

এ তো গেল সাদামাটা পশুবল প্রয়োগের বর্বরতা ঠেকাবার প্রচেষ্টা। কিন্তু যে স্থলে দুই পক্ষই সাতিশয় শিক্ষিত—বলতে কি, যেন দেশমাতৃকার উচ্চতম অনবদ্য শিক্ষিত সন্তান—এবং যা হচ্ছে সেটি মার্জিততম বাকযুদ্ধ, সেস্থলেও আপনি যদি ফৈসালা করে দিতে চান তবে ফল একই। উভয়পক্ষ একে অন্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত আপন আপন বাক্যবাণ তন্মুহূর্তেই সংবরণ করে আপনাকে করে তুলবেন এজমালি চাঁদমারির টারগেট।

এ তো হল সে-দুর্দৈবের কীর্তন যে-স্থলে আপনার নিজস্ব—আপন বিশ্বাস অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তৃতীয় মত আপনি পোষণ করেন না; আপনি সেফ্ উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক সুবিবেচনাসহ প্রণিধান করে সুলে-সুপারিশসহ একটা মধ্যপন্থা বাতলাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যেস্থলে আপনি তৃতীয় মত পোষণ করেন সেখানে—ঈশ্বর রক্ষতু!—আপনার অকালমৃত্যু অনিবার্য।

ভূমিকাটি আমার অনিচ্ছায় দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু প্রয়োজনাতীত বৃহল্লাঙুল নয়। কারণ ভবিষ্যতেও বহু-বহুবার বহু বাদানুবাদের সম্মুখে আমাকে ঠিক এইভাবেই সরকারী প্রাণ (আজকালের ফ্যামিলি প্ল্যানিঙের জমানায় ওটা আর পৈতৃক নয়, এ জন্মের পরও দুগ্ধাভাবে, অন্নাভাবে ওটা সরকারের হাতেই সমর্পিত) হাতে নিয়ে এগোতে হবে।

* * *

একদল গুণীজ্ঞানী বলছেন প্রত্যেক—আমি প্রত্যেক শব্দটির উপর বিশেষ জোর দিতে চাই—অধমের যা কিছু বক্তব্য সে ঐ প্রত্যেক (বা তাবৎ, কুল্লে) শব্দটি নিয়ে—ছাত্রটিকে শিখতে হবে নিদেন দুটি ভাষা। কেউ কেউ বলেন, সে শিখবে (ক) আপন মাতৃভাষা ও ইংরিজি, কেউ কেউ বলেন (খ) মাতৃভাষা এবং হিন্দী। এঁরা ইহলোকের তাবল্লোককে দোভাষী বানাতে চান একেবারে শব্দার্থে নয় (ইহ সংসারে কটা লোকের মাত্র একবারের তরেও প্রফেশনাল দোভাষীর প্রয়োজন হয়?), ভাবার্থে। তফাত এঁদের মধ্যে এইটুকু: একদল মাতৃভাষা ও তদুপরি ইংরিজি শেখাতে চান, অন্য দল ইংরিজির বদলে হিন্দী। (আর যাঁদের মাতৃভাষাই হিন্দী তাঁদের কি হবে? সেটা এখনো স্থির হয়নি। তাঁরাই স্থির করবেন। অবশ্যই। কই সে মরদ যার মাতৃভাষা হিন্দী নয় এবং

তৎসত্ত্বেও সে হিন্দীভাষীদের সামনে কোনো 'বাৎ প্রস্তাবও' করবে? হায়, আপসোস! কেন হিন্দীভাষী হয়ে জন্মালুম না?)

এ তো গেল দোভাষীর দল।

অন্য দল ত্রিভাষী। এঁরা বলেন, অত ঝগড়া ফ্যাসাদের কী প্রয়োজন? বিদ্যার্থী তিনটে ভাষাই শিখবে। (গ) মাতৃভাষা, হিন্দী এবং ইংরিজি অর্থাৎ মাতৃভাষা শিখতেই হবে, তারপর কেউ বলছেন সেকেন্ড ল্যানগুইজ হবে হিন্দী, কেউ বলছেন, না, ইংরিজী, আর এই ত্রিভাষীর দল মাতৃভাষা তো খাবেনই, তদুপরি ডুডুও খাবেন টামাকও খাবেন।

এই দোভাষী ও ত্রিভাষীতেই ঝগড়া।

এ ছাড়া আরো বহুবিধ আছেন। যেমন কেউ কেউ বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি, বৈদগ্ধ্য সভ্যতার প্রধান ভাণ্ডার সংস্কৃতে। সেই সংস্কৃতই যদি বিদ্যার্থী না শিখল তবে সে নিজেকে ভারতীয় বলে কোন্ মুখে? যে বেদ উপনিষদ ষড়দর্শন নিয়ে আমরা নিজে গর্ব অনুভব করি, বিশ্বজনের সামনে তুলে ধরি, সে-সবই তো সংস্কৃতে। এবং এই সংস্কৃতই একমাত্র বিদগ্ধ ভাষা যে-ভাষা একদা আসমুদ্রহিমাচল আর্য-অনার্য সকলকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল। আজ যদি আমরা সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় আমাদের কারিকুলামে সংস্কৃতকে স্থান না দি এবং ফলে তার মৃত্যু ঘটে তবে ঐতিহ্যবিহীন হটেন্‌টটে ও ভারতীয়তে একদিন আর কোনো পার্থক্য থাকবে না। যুক্তিগুলো যে খুবই সত্য এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সম্প্রদায় রণাঙ্গন থেকে ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। সংগ্রামে পরাজিত হওয়ার ফলে নয়। কারণ এঁদের বিরুদ্ধে কেউই সংগ্রাম ঘোষণা করে না—দেশের কর্তাব্যক্তিরা এঁদের সেফ্ অবহেলা করে, just by ignoring এদের hors de combat, রণাঙ্গন থেকে অপসারিত করেন। কারণ সংস্কৃত বাবদে এইসব কর্তাব্যক্তিদের বৃহত্তমাংশ ১০০% ignoramus। ...এরই পিঠ পিঠ মুসলমানরা বলেন, তাজমহল। কোনো মারকিন টুরিস্ট যখন তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো ভারতীয় হিন্দুকে ঐ ইমারতের প্রশংসা করে অভিনন্দন জানায় তখন সে তো মুখ বাঁকিয়ে বলে না, 'না মশাই এটা আমার দেশের মাটিতে আছে বটে কিন্তু আমার ঐতিহ্যগত সম্পদের অংশ নয়, এটা মোচলমানদের—ইউ আর বারকিং আপ দি রঙ্ ট্রী!'), মোগল চিত্রকলা, খেয়াল, ঠুংরি, ফারসীতে লিখিত ভূরি ভূরি ইতিহাসাদি অমূল্য গ্রন্থরাজি ভারতীয় সংস্কৃতির অংশবিশেষ—এদের সম্যক চর্চার জন্য ফারসী শেখানো উচিত, এবং ধর্মচর্চার জন্য যে আরবী ভাষা শিক্ষা ভিন্ন নান্য পন্থা বিদ্যতে সে তো স্বতঃসিদ্ধ। সংস্কৃতওলাদের মত এঁরাও বারোয়ারিতে কল্কে পান না—উপরে উল্লিখিত একই কারণে।...এর পরে আছেন জৈন ধর্মাবলম্বী। এঁদের ধর্মগ্রন্থ অর্ধমাগধীতে। পার্সীদের ধর্মগ্রন্থ প্রধানত আবেস্তার প্রাচীন পারসীকে। এদেশে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা নগণ্য কিন্তু তাঁদের শাস্ত্রীয় ভাষা পালিকে নিরঙ্কুশ উপেক্ষা করলে আমরা 'বৃহত্তর ভারতে'

মুখ দেখাতে পারবো না। আমার এ নগণ্য জীবনে যে দুটি বিদেশীর সঙ্গে আমি একই ডরমিটরিতে কিছুকাল বাস করি তাঁদের উভয়ই ছিলেন সিংহলের বৌদ্ধ শ্রমণ। শ্রমণ ধর্মপাল ও শরণাঙ্কর: এদেশে এসেছিলেন পালি ও সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য। এ ছাড়া শ্যামের রাজগুরুও বার্ধক্যে এদেশে এসেছিলেন তথাগতের আপন দেশে নির্বাণ লাভার্থে। হিন্দুর বার্ধক্যে বারাণসীর ন্যায়।...এবং আছেন খৃষ্টসম্প্রদায়, যদ্যপি বাইবেলের আদিমাংশ (পূর্ব মীমাংসা?) হীবরুতে ও নবীনাংশ (উত্তর মীমাংসা?) গ্রীকে, তথাপি খৃষ্টানদের সর্বজনমান্য বাইবেলের অনুবাদ 'ভুলগাতে' লাতিন ভাষায়। লাতিন ভিন্ন খৃষ্ট পাদরির শিক্ষাদীক্ষা অসম্পূর্ণ।

হালফিল বিজ্ঞানের জয়জয়কার! এ 'বিদ্যা' ষোল আনা রপ্ত করতে হলে নাকি জরমন ভাষা অবর্জনীয়।

অতি অবশ্য এখানে একটি কথা বলে রাখা উচিত। নিতান্ত কট্টর ভিন্ন কোনো মহামহোপাধ্যায়ই বিধান দেন না যে সর্ববিদ্যার্থীকে ঘাড়ে ধরে সংস্কৃত শেখাতে হবে, কট্টর ভিন্ন কোনো মোল্লা তাবল্লোকের কল্লা ধরে বিসমিল্লা শেখাতে চায় না। প্রাগুক্ত দোভাষী এবং ত্রিভাষীরা কিন্তু যেসব ভাষা শেখাতে চান, সেগুলো ঘাড়ে ধরে শেখাতে চান। অতএব এই ভাষার রেস্-এ সংস্কৃত ফারসী পালিওয়ালাদের উপস্থিত also ran বলে খারিজ করে দেওয়া যেতে পারে। আমি শুধু নির্ঘণ্ট নিরঙ্কুশ করার জন্য এদের উল্লেখ করলুম।

* * *

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত ত্রিগুণা সেন আসলে বৈজ্ঞানিক বটেন, কিন্তু হিউম্যানিটিজেও তাঁর আবাল্য অনুরাগ। তদুপরি তাঁর কমনসেন্স আছে। অতএব তিনি সার্থকনামা ত্রিগুণধারী (সেন-এর বহুবচন সেন্স বা sense)।

দোভাষী ত্রিভাষীদের সামনে আরেকটি জীবনমরণ সমস্যা: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম কি হবে? ইংরিজী, হিন্দী, আঞ্চলিক ভাষা—তিনটেরই সমর্থক আছেন।

এই সুবাদে আঞ্চলিক ভাষার সমর্থন করতে গিয়ে শ্রীসেন বলেন (হুবহু বাক্যগুলো আমার মনে নেই বলে শ্রীসেন তথা পাঠকের প্রতি যদি অবিচার করে ফেলি তবে কোনো সজ্জন যেন আমার মেরামতী করে দেন), পৃথিবীর কোন্ সভ্য স্বাধীন দেশে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়? শিক্ষামন্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে আমাদের নিবেদন:—

একশ' বছরও হয়নি কবি হেম বাঁড়ুয্যে লিখেছিলেন—

"চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান।"

সেই জাপানেও কি কখনো জাপানী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়েছে? বস্তুত পাঠক প্রত্যয় যাবেন না, মাত্র কিছুদিন হল ক্যান্সার রোগের এক স্পেশ্যালিস্ট্ আমাকে বলেন, ঐ রোগের গবেষণা জাপানে যা হয়েছে সেটা না জেনে সে সম্বন্ধে আপটুডেট হওয়া যায় না। এবং

ওর সব কিছুই হয় জাপানী ভাষাতে।···কিন্তু অত দূরে যাবার কি প্রয়োজন? আফগানিস্তানের জনসংখ্যা কত? দেশটা কি খুবই মডার্ন? না তো। আমি যখন সে-দেশে পেঁছিই (১৯২৭) তখন সেখানে সবে প্রথম কলেজের প্রথম বর্ষ আরম্ভ হব-হব করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অরুণোদয় হতে ঢের ঢের দেরি। অথচ পরের বছর যখন ঐ ফার্স্ট ইয়ার চালু হল তখন তার মাধ্যম হল ফারসী। কিন্তু বৃথা বাক্যব্যয়। পাঠক একটু অনুসন্ধান করলেই জানতে পারবেন ক্ষুদ্র ফিন্‌ল্যাণ্ডই বলুন আর বলিভিয়াই বলুন, শিক্ষার বাহন সর্বত্রই মাতৃভাষা।

* * *

এইবারে আমরা পেঁছিলুম রণাঙ্গনের কেন্দ্রভূমিতে।

এই যারা দোভাষী ত্রিভাষী—হয় ইংরেজী নয় হিন্দী কিংবা উভয়ই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছেন তাঁদের শুধোই—শিক্ষামন্ত্রীর মন্ত্র এবং যন্ত্রের সঙ্গে টায় টায় গলা মিলিয়ে 'পৃথিবীর কোন্ সভ্য স্বাধীন দেশের ক'জন উচ্চ-শিক্ষিত লোক মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য একটি ভাষা—উত্তমরূপে না হোক মধ্যম বা অধম রূপেই—জানে?'

আমি জনপদবাসী বা নগরের অর্ধশিক্ষিতদের কথা তুলছিনে। যারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গিয়ে রীতিমত বি-এ পাস করেছে, তাদেরই ক'জন মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য আরেকটি ভাষা পড়তে পারে, শুনলে বুঝতে পারে লিখতে পারে এবং মোটা-মুটি সাদামাটা কথাবার্তা বলতে পারে? বলা বাহুল্য, যারা কোনো বিদেশে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছে তাদের কথা হচ্ছে না। সেস্থলে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত লোকও বিদেশী ভাষা অনেকখানি রপ্ত করে ফেলে আপন আপন মেধা অনুযায়ী।

এ-দেশের কথাও হচ্ছে না। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি মাত্র সেদিন (যদ্যপি এই কুড়ি বৎসরেই আমরা কী তীব্র গতিতেই না ইংরিজির খোলস বর্জন করছি—এ বর্জনের জন্য কোনো মেহনৎ-কেরামতি করতে হয় না, আমাদের চৌকশ গোঁপখেজুরে আলস্যই এর পরিপূর্ণ ক্রেডিট পায়।[১] এবং এই দেশেই প্রায় সাতশ' বছর ফারসী ছিল স্টেট ল্যাঙ্গুইজ—সেইটে একদম পালিশ করে তুলতে আমাদের একশ' বছরও লাগেনি।

ফরাসী দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির কত পারসেণ্ট ইংরিজী বই পড়তে পারে? বলতে পারে? এক পারসেণ্টও না। মারকিন উচ্চশিক্ষিত লোক—স্কুল-কলেজে আট বছর ফরাসী শিখেছে—ক' পারসেণ্ট ফরাসী পড়তে বলতে পারে? ঠিক

১ 'গোঁপখেজুরে'র গল্পটি অতি প্রাচীন ক্ল্যাসিক পর্যায়ের ঃ খেজুর গাছ-তলায় একটা লোক শুয়েছিল। একটা খেজুর কপালে পড়ে গড়াতে গড়াতে তার গোঁপে এসে ঠেকল। কিন্তু লোকটা এমনই হাড়-আলসে যে জিভ দিয়ে সেটা টেনে নিয়ে মুখে না পুরে অপেক্ষা করতে লাগল। দিনশেষে পদধ্বনি শুনে বিড়বিড় করে বললে, 'দাদা, এদিকে একটু ঘুরে যাবার সময় যদি দয়া করে তোমার পা দিয়ে ঐ খেজুরটা আমার মুখের ভিতর ঠেলে দাও! থ্যাংকয়ু!'

বি-এ পাসের পর ? তার দশ বছর পর ?

অর্থাৎ স্বাধীন দেশের শিক্ষিত লোককেও দোভাষী করা যায় না। ওটা একটা ফ্যাশান—ইস্কুল-কলেজে সেকেন্ড ল্যাংগুইজ পড়ানো।

পেটের ধান্ধায় অনেকে দোভাষী হয়—স্কুলে না গিয়েও। মারওয়াড়ি ব্যবসায়ী তামাম আসাম চষে খায়। ও ! মারওয়াড়ের গ্রামে গ্রামে বুঝি সুবো-শাম ইস্কুলে ইস্কুলে আসামী ভাষার দিগগজ পণ্ডিত বানানো হয় !

তাই বলি, দোভাষী ত্রিভাষী—এদেশের শিক্ষিত লোকও হবে না। থাকবে একভাষী। এবারে দোভাষী ত্রিভাষীর দল আপসের চুলোচুলি ভুলে গিয়ে এক-জোট হয়ে আমাকে—আমি, একভাষীকে - মারবেন পাইকিরি কিল। এখন বলুন, আমার ভূমিকাটি কি অতি দীর্ঘ হয়েছিল ?

॥ ২ ॥

ব্যক্তি-বিশেষের বেলা পুরুষকারই যে রকম শেষ কথা নয়, একটা জাতি বা দেশের বেলাও তাই। আমরা যতই ভেবেচিন্তে পারলিমেন্টে তর্কাতর্কি করে, কাগজে কাগজে পাবলিসিটি দিয়ে আটঘাঁট বেঁধে একটা প্রোগ্রাম বা প্ল্যান চালু করি না কেন, শেষ পর্যন্ত তার ফল যে কি উতরাবে সে-সম্বন্ধে আগের থেকে দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া যায় না। একটা দেশের ধর্ম, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলো এমনই বিরাট বিরাট ব্যাপার যে এগুলোকে মানুষ আদৌ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা সে নিয়ে আমার মনে গভীর সন্দেহের উদয় হয় ; মনে হয় কি যেন এক অদৃশ্য নিয়তি মানব সমাজকে শাসন করে চলেছে, তার উপর আমাদের কর্তৃত্ব যদি বা থাকে সে অতিশয় যৎসামান্য। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এসব বিষয় নিয়ে আমাদের কি তবে চিন্তা করবার কিছুই নেই ? অন্ধ নিয়তিই সব ? তার নাম অদৃষ্ট, কর্মফল, কিস্মৎ—যে নামেই তাকে ডাকুন।

হজরৎ মুহম্মদ একদিন বেদুইনদের সামনে পুরুষকার ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার পর এক বেদুইন তাঁকে শুধালে, 'তবে কি, হজরৎ, উটগুলোকে আমরা দড়ি দিয়ে না বেঁধে আল্লার ভরসায় (কিস্মতের উপর) ছেড়ে দেব ?' হজরৎ বললেন, 'না, দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে তারপর আল্লার উপর ভরসা রাখবে।' অর্থাৎ আমরা আটঘাঁট বেঁধে যতই প্ল্যানিং করি না কেন, সকালবেলা বেদুইনের মতই হয়তো দেখবো, উট হাওয়া, প্ল্যান ভণ্ডুল। কিন্তু তবু উট বাঁধতে হয়, প্ল্যানিং করতে হয়।

বৌদ্ধধর্মও নাকি বলেন, মানুষের জীবন নদীস্রোতে নিচের দিকে চলমান গাছের গুঁড়ির মত ; ধাক্কাধাক্কি করে সেটাকে খানিকটে ডাইনে বাঁয়ে সরানো যায় কিন্তু স্রোতের উল্টোদিকে চালানো যায় না।

এবং কার্ল্ মারক্স্ও নাকি বলেছেন, ইতিহাসের নিয়তি নানা সামাজিক প্যাটার্ন্ পরিবর্তিত করতে করতে সর্বশেষে প্রলেতারিয়া-রাজ আনবেই

আনবে। মানুষ সজ্ঞানে আপন চেষ্টা দ্বারা তার গতি দ্রুততর করে দিতে পারে মাত্র।

অতএব তর্কবিতর্ক করি, চেষ্টা দিই :—কিন্তু জানি, শিক্ষার্থী আজ দোভাষীই হোক, আর ত্রিভাষীই বলুক—আখেরে সে একটি ভাষাই শিখবে, তাই দিয়ে জ্ঞানার্জন করবে, কাজকর্ম চালাবে।

পাঠককে ফের বলছি, এখানে আমি বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলছি। অর্থাৎ জোর করে দেশের তাবৎ ইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীকে দুটো বা তিনটে ভাষা শেখাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। তারা নিছক পরীক্ষা পাস করার জন্য ভাষা শিখবে কিন্তু পরবর্তী জীবনে দ্বিতীয় বা/এবং তৃতীয় ভাষার চাবি দিয়ে ঐ সব ভাষার জ্ঞানভাণ্ডার খুলে ওই জ্ঞান জীবনে সঞ্চারিত করে চিন্তাধারাকে বহুমুখী করবে না—অথচ বিদেশী ভাষা শেখার প্রধান উদ্দেশ্য তো ওইটেই।

এবারে একটা উদাহরণ নিই।

নরমানরা ইংলণ্ড জয় করে সেখানে চালালো ফরাসী ভাষা। শুধু যে রাজদরবারেই ভাষা ফরাসী হয়ে গেল তাই নয়, শিক্ষাদীক্ষার বাহন, সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের মাধ্যম, নাট্যশালা সঙ্গীতের ভাষা—সব কিছুই তখন ফরাসী এবং ফরাসীর মাধ্যমে তার জননী লাতিন। পাকা তিনশটি বছর চললো ফরাসী ভাষার একচ্ছত্রাধিপত্য। ইংরিজীতেও যে কোনো প্রকারের চিন্তা বা অনুভূতি প্রকাশ করা যায় সে-কথা দেশের ভদ্রজন সম্পূর্ণ ভুলে গেল। ফরাসী ভাষা নাকি আল্লাতালা স্বয়ং এমনই মধুর পরমপ্রিয় করে নির্মাণ করেছেন—ইত্যাদি ইত্যাদি (এদেশেও আমরা সংস্কৃতকে দেবভাষা খেতাব দিয়েছি এবং সন্ত তুকারাম তাই বক্রোক্তি করেছিলেন, "সংস্কৃত যদি দেবভাষা হয়, মারাঠী কি তবে চোরের ভাষা ?")।··পুরো তিনশ'টি বছর পর ইংলণ্ডের রাজার মাতৃভাষা আবার হল ইংরেজী কিন্তু হলে কি হয় ফরাসী যদিও ক্রমে ক্রমে হটে যেতে লাগলো তবু দেখা যাচ্ছে এই সেদিন—১৭ শতাব্দী অবধি আইন-আদালতের ভাষা ছিল ফরাসী।[২]

২ আইন-ব্যবসায়ীদের মত রক্ষণশীল প্রাণী ত্রিলোকে দুর্লভ। ইংরিজী অবহেলিত বা বিতারিত হলে এই বেহেশ্‌তী ভারতভূমি যে কোন্ দোজখে পরিণত হবে তারই কল্পনায় অধুনা শ্রীযুত ছাগলা [ওটা ছাগলাই, স্যর, চাগলা নয়। পর পর পুত্রসন্তান মারা গেলে যে রকম আমরা 'এককড়ি' 'ফকির' 'নফর' নাম রাখি গুজরাতীরা তেমনি 'ছাগলা' (ছাগল), মাঁকড় (পিঁপড়ে, ক্রিকেটার), ঝিঁড়া (জিন্না, ছোট) রাখে] করুণ আর্তনাদ করে বলেছেন : এই একশ' বছর ধরে আইন ব্যবসা যে (পর্বতপ্রমাণ) আইনের কেতাবপত্র ইংরিজীতে রচনা করেছেন সেটা লোপ পাবে, তার ব্যবহার থেকে ভারতবাসী বঞ্চিত হবে। এর উপর দীর্ঘ মন্তব্য না করে শুধু বলবো, 'এদেশ থেকে ইংরিজীকে নিরঙ্কুশ বিতাড়িত করার জন্য এই একটি মোক্ষম যুক্তি পাওয়া গেল বটে!' এবং ছাগলা সম্প্রদায়কে সবিনয় প্রশ্ন : 'তবে কি প্রলয়াবধি এদেশে

ইংরিজী একদিন পদ পেল বটে, তাই বলে কি ফরাসী 'কর্তার ভূত' কাঁধ থেকে অত সহজে নামে? ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত M. Ed রা বলতে পারবেন কবে বিলেত থেকে ফরাসী কমপাল্‌সরি সবজেক্‌টরূপে লোপ পেল। কিন্তু তারপরও, আজ অবধি, ঐ ফরাসী অপ্‌শনাল হিসেবে পড়াবার জন্য বিলেত প্রতি বৎসর কত খরচা করে?

এবং আজও ইংরেজ ফরাসীকে নিয়ে যতই মস্করা করুক না কেন, জেবে দুটো কড়ি জমামাত্রই হলিডে করার জন্য 'পরাণ ভয়ে হরিণে'র মত ছুট লাগায় প্যারিস পানে[৩]—মনে আশা সেই সব কুকীর্তি করবে, যেগুলো আপন দেশে করা যায় না—সিম্‌প্‌লি নট ডান্‌। ইংরেজী সাহিত্য যে ফরাসী সাহিত্যের কাছে কতখানি ঋণী তার জরিপ করা আমার কর্ম নয়। শব্দবিদ না হয়েও বেপরোয়া আন্দাজে বলি, ইংরিজীর শতকরা নব্বইটি চিন্ময় শব্দ (অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট ভকাবুলারি) হয় ফরাসী নয় ওরই মারফৎ লাতিন গ্রীক থেকে নেওয়া।

আরো কত শত বাবদে আজো ইংরিজী ভাষা, সাহিত্য, রান্নাবান্না (মেনুটা এখনো ৮০% ফরাসিস; বীফ, মাটন্‌, পর্‌ক্‌, ভীল, ভেন্‌জন্‌=গরু, ছাগল, শুয়োর, বাছুর, হরিণের মাংস—সব কটা শব্দ ফরাসী থেকে এসেছে), আদব-কায়দা (R. S. V. P থেকে P. P. C.), মদ্যাদি (কন্যাক্‌ থেকে শ্যামপেন) ফরাসীর কাছে ঋণী—বস্তুত বিলেতে, আজো সভ্যতা ভদ্রতার কোন্‌ না বস্তু ফরাসী প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল বা আছে?

* * *

একদা কতিপয় শিক্ষাবিদ ইংরেজের মনে প্রশ্ন জাগলো, এই যে আমরা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য শেখানোর জন্য আমাদের দেশে প্রায় হাজার বছর ধরে এত টাকা ঢেলেছি, দেখি তো, তার ফলটা কি হয়েছে? জনৈক ফরাসী ভদ্রলোককে নাবানো হল লণ্ডনের রাস্তায়। যারই বেশভূষা আচার-আচরণ দেখে মনে হল লোকটি মার্জিত উচ্চশিক্ষিত তাকেই ফরাসী ভদ্রলোক ফরাসীতে শুধলো, 'আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, বলতে পারেন, কোন্‌দিকে গেলে সব

আইনের বাহন ইংরিজীই থাকবে?' কারণ যত দিন যাবে, পর্বত যে 'পর্বততর' হতে থাকবে! মায়া যে 'মায়াতর মায়াতম' হতে থাকবে! অবশ্য আমি ইংরিজী বিতাড়নের জন্য হন্যে হয়ে উঠিনি, একটি বিশেষ স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায়ের মত।

৩ এস্থলে বক্ষ্যমান রচনাটি যদি আমাকে কপালের গর্দিশবশত ইংরিজীতে লিখতে হত তবে 'পরাণভয়ে হরিণের ছোটা'টা হুবহু ফরাসী ইডিয়মে লিখতুম—Ventre a terre—অর্থাৎ with belly to ground; এমনি সামনের দিকে বুঁকে প্রাণপণ ছুটছে যে মনে হয় মানুষটার পেটটা বুঝি মাটি ছুঁয়ে ফেলেছে! (ফরাসি শব্দতাত্ত্বিকদের জন্য 'ভাঁর' ভেনট্রিলোকুইস্‌ট্‌, পেট থেকে যে কথা বের করে; 'তের' টেরেস্ট্রিয়াল=পার্থিব তুলনীয়)

চেয়ে কাছের ট্যুব স্টেশনে পেঁছিব ?' কথিত আছে, ৯৩ না ৯৭ নম্বরের ভদ্রলোক প্রশ্নটা বুঝতে পারলেন বটে কিন্তু ফরাসীতে উত্তর দিতে পারলেন না। ১০৩ না ১০৭ নম্বরের জনা বুঝি কোনোগতিকে অতি ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে উত্তরটা দিলেন।

এরপর আরো নানা উদাহরণ, নানা যুক্তি দেখিয়ে প্রাগুক্ত গবেষকগণ অতিশয় ন্যায্য প্রশ্ন শুধিয়েছেন, তাহলে ঐ 'পোড়া'র ফরাসী শেখাবার জন্য এদেশে অত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালার কি প্রয়োজন ?

* * *

এ বিষয়টি আরো সবিস্তর আরো উদাহরণ দিয়ে গুছিয়ে বলতে হয়। আমার শক্তি অতিশয় সীমাবদ্ধ। তদুপরি যখন জানি, যা হবার তা হবেই, তখন কেমন যেন উৎসাহের অভাবে কলমের কালি শুকিয়ে যায়। তবু লিখছি, এলোপাতাড়ি হাবিজাবি বিস্তর বেহুদা এক্সপেরিমেণ্ট করার পর মার খেয়ে খেয়ে যখন মাত্র একটি ভাষাই বাধ্যতামূলক করা যায় এ-তত্ত্বটি আবিষ্কার করবো, যা অন্যান্য স্বাধীন দেশে করে ফেলেছে, তখন কেউ যেন না বলে, এ-যুগের, অর্থাৎ আমাদের বর্তমান যুগের লোকের বিন্দুপরিমাণ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা শক্তি ছিল না।

ইংরিজী তো এদেশে প্রায় একশ' বছর ধরে কমপালসারি ছিল। ইংরিজী শিখলে আর্থিক সামাজিক উন্নতি হবে বলেই লোকে ইংরিজী শিখেছে। জ্ঞানার্জন করে চিত্তপ্রসারের জন্য ইংরিজী শিখেছে এ-কথা বললেও আমি বিশ্বাস করবো না। এখন বলুন কটা লোক অবসর সময় ইংরিজী বই পড়ে, ইংরিজী বই কেনে ? এ তো সাধারণ জনের কথা, কিন্তু প্রত্যয় যাবেন না, আমার পরিচিত একটি ছোকরা ইংরিজীর লেকচারার সর্বক্ষণ বাঙলা বাঙলা করছে, রবীন্দ্রসাহিত্যে তার সুন্দর দখল, কৌতুহল প্রশংসনীয়। ওদিকে ইংরিজীর বেলা সেখানে পড়াশুনো করে আরো চৌকশ হবার কোনো চাড় নেই জানে যেটুকু ইংরিজী রপ্ত আছে সেইটে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে সে একদিন রীডার ও যথারীতি প্রফেসরও হবে।

এই সেমি-কমপালসরি সংস্কৃত, ফারসী, আরবী (বা পালি লাতিন) নিন। সায়েনসে সীট পায়নি বলে, বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, প্রায় অনিচ্ছায় বি-এ পাসের সময় সংস্কৃত ছিল। হয়তো বা অনার্সও ছিল। তাদের কজনকে আপনি অবসর সময় সংস্কৃত (বা ফারসী) পড়তে দেখেছেন, তার শেলফে নূতন কেনা সংস্কৃত বই দেখেছেন ? ফারসী তো অতি সরল ভাষা—কজন ফারসী অনার্সওলা গ্রাজুয়েট ফারসী 'আউট-বুক' পড়ে ?

অবশ্য যাঁরা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় দুই বা তিনটি ভাষা শেখেন—বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, তাঁদের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। অধ্যাপক সত্যেন বোস স্বেচ্ছায় ফরাসী জরমন শিখেছেন। এখনো ওই দুই ভাষায় বই পড়েন।

॥ ৩ ॥

অগুনতি দফে প্রশ্ন শুনতে হয়েছে, 'ইংরিজীতেই চলবে তো ? অন্য কোনো ভাষা না জানলেও চলবে—না ? কনটিনেনটে তো সবাই ইংরিজী বোঝে,—না ?'

হুঁ, বোঝে। খুব বোঝে ! তবে শুনুন। গল্পটি অবশ্য প্যারিস সংক্রান্ত নয়—যদিও খুদ প্যারিসেরই কোনো একটা মুদির দোকানে তেল নুন কেনার চেষ্টা করে দেখুন না ইংরিজীর মারফৎ—তবে এটি পৃথিবীর যে-কোনো জায়গা সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সেটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ না করেও বলা যায়।

প্রভাঁসের একটি দোকানের সামনে বেশ মোটা মোটা হরফে লেখা ঃ 'ENGLISH SPOKEN'। এটার উদ্দেশ্য মারকিন ট্যুরিস্টকে আকর্ষণ করা। ইংরেজকে নয়। কারণ ফরাসী জাত বিস্তর মার খেয়ে খেয়ে ভালো করেই জানে, ইংরেজ কিপটেমিতে প্রায় তাকেও হার মানায় এবং জাতটার আগাপাস্তলা বেনেদের হাড্ডি দিয়ে তৈরি বলে দোকানের প্রত্যেকটি জিনিসের পাইকিরি ভাও, খুচরো দর, কমিশন, সেল ট্যাক্স দফে দফে জানে। তা সে-কথা থাক গে।···এস্থলে ঢুকেছে এক মারকিন। খাজা মারকিন ড্রল (আড়) সমেত একাধিকবার মারকিন জবানে বলে গেল তার প্রয়োজন অথচ কাউনটারের পিছনে ফরাসী দোকানউলী শুধু মিটমিটিয়ে মৌরী হাসি চিবোয়—মাল কাড়-বার কোনো নিশানাই নেই। মারকিন বার বার একই কথা বলতে বলতে হঠাৎ বুঝতে পারলো, মাদাম তার কথার এক বর্ণও বুঝতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে তখন সে সেই সাইনবর্ড-টার দিকে আঙুল তুলে বললে, 'তবে ওটা ওখানে ঝুলিয়েছ কি করতে ? ইংরিজী যখন বোঝো না এক বর্ণও ?' এবারে যেন মাদাম ব্যাপারটা বুঝেছে—নিশ্চয়ই এ ফারুস্ আকছারই হয়—একগাল হেসে তার ইংরিজীভাষা ভাণ্ডারের শেষ শব্দটি খরচা করে বললে, 'উই, উই, ইয়েস ইয়েস, "এঙলিশ স্পোকেন !" সারতেনলি। আওয়ার কস্তোমারস্ স্পীক—উই নৎ স্পীক'—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, "ইংরিজী বলা হয়" বই কি ! আমাদের খদ্দেররা বলেন। আমরা বলি না।'

এটি মনে রাখবেন। আপনার অন্য কোনো কাজে না লাগলেও এটি দিয়ে ব্যাকরণের প্যাসিভ ভইস এবং তস্য প্রসাদাৎ কি কি সুখ-সুবিধে হয় সেটা বাচ্চাদের শেখাতে পারবেন। মাদাম তো আর নোটিশে বলেনি, 'উই স্পীক ইংলিশ', বলেছে 'ইংলিশ স্পোকেন'—এবং ইহসংসারে কে কোথায় ইংরিজী বলে কি না বলে, সেটা কুইনজ ইংলিশ না সাউথ ক্যারোলাইনার নিগার ইংলিশ সে খতিয়ান দেবার জিম্মেদারি তো বেচারী প্রভাঁসিনী দোকানউলীর নয় !

খোদ প্যারিসের মুদির কথা বলছিলুম। আপনি হয়তো বিরক্ত হয়ে বলবেন, 'তুমিও য্যামন ! আমি কি প্যারিস যাচ্ছি ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলের জন্য !' এস্থলে আমাকে একটু কথা কাটতে হল। বলতে কি, আমার মনে

হয়, এই সব বস্তু আপনি যদি প্যারিসে কিনে এদেশে চালান দিতে পারেন—অবশ্য অস্মদ্দেশীয় সদাশয় সরকার যদি তার উপর বেদরদ ট্যাক্‌শো না চাপান—তবে আপনার প্যারিস ভ্রমণের খরচটাই উঠে যাবে। আর ইতালির ব্রিন্‌দিসি, বারী অঞ্চলে চালের কিলো নিশ্চয়ই আড়াই/তিন টাকা নয়! সর্বোপরি অলিভ তেল! লাল হয়ে যাবেন, মোয়াই, লাল হয়ে যাবেন। ফ্রান্‌সের মার্সেই অঞ্চলের পাঁচসিকের তেল হেলায়—কালো বাজারে—নিদেন পঞ্চবিংশতি তংকা! তা সে যাক্‌ গে! ইংরেজের সঙ্গে দু-শ' বছর ঘর করে আমি—সৈয়দের ব্যাটা—আমিও বেনে বনে গিয়েছি—প্যারিস পেঁছে কোথায় না সন্ধান নেবো উবিগাঁ কোতি'র ভুরভুরে খুশবাই—তা না, ত্যালের কেলো, চেলের ভাও! লাও!

প্যারিসের—প্যারিসের কেন—পৃথিবীর পয়লা নম্বরী সর্ব হোটেলের ওয়েটার, 'রুমবয়', কাউন্টারের কেরানী এরা সবাই অল্প-বিস্তর ইংরিজী বলতে পারে। কিন্তু আপনি সে-সব হোটেলে উঠবেন না—গ্যাঁটে আপনার অত রেস্তো নেই, থাকলে আমার লেখা পড়তেন না। আর যদি বলেন, না, আপনার সে রেস্তো আছে, তাহলে আর ভাবনা কি? আপনি কোন্‌ দুঃখে প্যারিস বার্‌লিনে কে কতখানি ইংরেজী বোঝে না বোঝে তাই নিয়ে মাথা ঘামাবেন? রেখে দিন হাজার দুই আড়াইয়ের মাইনের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি—সে নিদেন আধা ডজন কন্‌টিনেনটাল ভাষা ঝাড়তে পারে, আপনাকে আর দেখতে হবে না। স্বপ্নেই যখন খাচ্ছেন তখন পোলাওই খান, ভাত খাচ্ছেন কেন, আর সে পোলাওয়ে ঘি ঢালতেই বা কঞ্জুসী কচ্ছেন কেন? বরদার মহারাজাকে দিনের পর দিন অনায়াসে মিশরে চলাফেরা করতে দেখেছি। কবীন্দ্র রবীন্দ্র যখন প্রাগ বা বুডাপেশটে বক্তৃতা দিতেন তখন সেখানকার য়ুনিভারসিটির সব চেয়ে সেরা ইংরাজীবাগীশ অধ্যাপক হতেন তাঁর দোভাষী। এঁদের কথা আলাদা। আপনি যদি সে পর্যায়ের হন তবে আমার লেখা পড়ছেন কোন্‌ বদ্‌কিসমতের গেরোতে?

পক্ষান্তরে দেখুন, জলপাইগুড়ি থেকে বেরিয়ে অন্ধ খঞ্জ শ্রীধামে পেঁছয় না, কেদার-বদরীর পুণ্যসঞ্চয় করে না! ভারতীয় কত কালা বোবা কপর্দকহীন প্রতি বৎসর মক্কায় গিয়ে হজ করে! রাখে আল্লা, মারে কে!

চলে যাবে, প্যারিসে ইংরিজী জানা না থাকলেও চলে যাবে, জানা থাকলে অল্পস্বল্প সুবিধে হতে পারে। লনডনে যদি শতেকে একজন লোক ফরাসী বলে, তবে দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে প্যারিসের রাস্তায় হাজারে একজন ইংরিজী বলতো কিনা সন্দেহ। তাই আঁদ্রে মোরোয়া যিনি এই হালে গত হলেন, বা ল্যাগুঈ কাজাম্যাঁ ফ্রান্স দেশের আজব চিড়িয়া। প্যারিসবাসী তাজ্জব মেনে শুধোবে 'ওরা ইংরিজী শিখেছিল! কি করতে? মরতে?'

জরমনিতে অবশ্য আপনার ইংরিজীজ্ঞান একটু বেশী কাজে লাগবে। যদ্যপি ওই দেশ ইংরেজের প্রতিবেশী নয়। তার অনেকগুলো কারণ আছে। তার একটা কারণ আমাদের মূল বক্তব্যের সঙ্গে বিজড়িত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জরমনির আপন ভূমির উপর কোনো সংগ্রাম হয়নি, অর্থাৎ কোনো বিদেশী সৈন্য সেখানে পদার্পণ করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মারকিনিংরেজ লড়াই করতে করতে, কদম কদম এগোতে এগোতে জরমনির এক বৃহদংশ দখল করে সেখানে থানা গাড়ে এবং কয়েক বৎসর সেখানে বাস করে। গোড়ার দিকের মারকিনিংরেজ চালিত মিলিটারি শাসনকর্তাদের ভাষা তখন যে অতি সামান্যও বলতে পেরেছে সে-ই রেশন সহজে পেয়েছে, ফালতো রুটিটা আণ্ডাটাও তার কপালে নেচেছে। আমার এক জরমন সতীর্থ ধরা পড়ে মারকিন দল জরমন সীমান্তে প্রবেশ করা মাত্রই। ইংরেজী বলাতে তার ভালো অভ্যাস ছিল বলে (তার জন্য আমি স্বয়ং কিছুটা দায়ী। আমাদের পরিচয়ের গোড়ার দিকে আমি জরমন জানতুম না বলে সে তার টুটিফুটি ইংরেজী চালিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে আমার জরমন খানিকটে সড়গড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে পুরনো অভ্যাস ছাড়েনি) মারকিনরা তাকে 'পত্রপাঠ' দোভাষীর—শব্দার্থে—নোকরি দিয়ে দেয়। ফলে তার বাচ্চাদের দুধের অভাব হয়নি, বৃদ্ধা রুগ্না শাশুড়ীর ওষুধপত্রের অভাব হয়নি। আর সে ভসভস করে অষ্টপ্রহর হাভানা সিগার ফুঁকেছে যা ইতিপূর্বে তার জীবনে কখনো জোটেনি। মার্কিন সৈন্য চলে যাওয়ার পর মনোদুঃখে সে ধূমপান সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে। আমি তার জন্য গেল বারে বিড়ি নিয়ে গিয়েছিলুম। তার পুনরপি সেই মনস্তাপ। তবে আমি মাঝে-মধ্যে এখনো তাকে দু'পাঁচ বাণ্ডিল পাঠাই। ভয়ে বেশী পাঠাতে পারিনে—জরমন কসটম্‌স আমাদের চেয়ে কম যান না।

১৯৪৪ থেকে জরমনির যা দুর্দিন গেছে বিশ্বের অর্বাচীন ইতিহাসে সেটা উল্লেখযোগ্য। মারকিনিংরেজ সেখানে থানা গাড়ার পর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাকে না রেশনের সন্ধানে ছুটতে হয়েছে ওদের পিছনে? সবাই পড়িমরি হয়ে তখন শিখেছে ইংরিজী। কবে কোন ঠাকুন্দা একবার বেখেয়ালে একখানা 'গাইডবুক টু ইংলিশ' কিনেছিলেন, এ আমলের ঠাকুন্দা তারই গা থেকে সন্তর্পণে ধুলি ঝেড়ে এক-পরকলাওলা চশমা নাকে চড়িয়ে লেগে গেলেন ইংরিজী অধ্যয়নে—ছাপাখানা আবার কবে বসবে, চশমার দোকান কবে খুলবে কে জানে?

এর পর আর কি আশ্চর্য যে প্রথম ইস্কুল ফের খোলা মাত্রই আণ্ডাবাচ্চারা ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করলো, তার তুলনায় আমাদের ঊনবিংশ সালের ইংরিজী শেখার প্রচেষ্টা ধুলির ধুলি।

একমাত্র পরাধীনতাই মানুষকে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা শেখায়। চোখের জলে নাকের জলে শেখায়।

এই পরাধীনতার পিঠ পিঠ আসে আর্থিক পরাধীনতা। আজ জগৎজোড়া মারকিনি ডলারের গরমাই। ইংরেজের তম্বী কমেছে, কিন্তু তিনিও আছেন। উভয়ের ভাষা মোটামুটি একই—ইংরিজী।

তাই আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি নে ইংরিজী না শিখে গুষ্টিসুদ্ধ দোভাষী না হয়ে আমাদের চলবে কি করে?

এ-কথা খুবই সত্য, ইংরিজী নিরঙ্কুশ বর্জন করা অনুচিত।

কিন্তু দুনিয়াসুদ্ধ লোককে ঘাড়ে ধরে দোভাষী বানিয়ে সে-সমস্যার সমাধান নয়।

ভঙ্গ বনাম কুলীন

যে-ভাষার প্রশংসায় এক শ্রেণীর মহাজন অধুনা পঞ্চমুখ সেই ভাষায় একটি প্রবাদ আছে: 'হে গভীর-সংকট-সঙ্কুল-অরণ্যের-পথভ্রান্ত-পথিক, অরণ্য ভেদ করে জনপদে না পেঁছিবার পূর্বে হর্ষধ্বনি করো না। অধম আপ্তবাক্যটি বিস্মরণ করে হর্ষোল্লাস করে বসেছি, এমন সময় দেখি, আমি গভীরতম অরণ্যে। সেই শ্রেণীর সজ্জনগণ এখন আরো প্রাণপণ লড়াই দিচ্ছেন, ইংরিজী যেন সর্বাবস্থায় কলেজাদিতে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বিরাজমান থাকে। বোধ হয়, অধুনা শিক্ষামন্ত্রী যে প্রাদেশিক ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে দেখবেন বলে মনস্থির করে বসেছেন, এ সংবাদ এঁদের বিচলিত করেছে।

এই শ্রেণীর একাংশ কোনো তর্কাতর্কি না করে তারস্বরে ইংরিজী ভাষা-সাহিত্য ও তার প্রসাদগুণ কীর্তন করেন। সে কীর্তনের ঢংটি বড়ই মজাদার। সর্বপ্রথম তাঁরা বলেন, যাঁরা বাংলা বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে চান তাঁরা অজ্ঞ; তাঁরা ভাষাতত্ত্বের মূল নীতিই জানেন না। যেহেতু এঁদের প্রবন্ধাদি ও ইংরিজী কাগজে ছাপা চিঠিতে এঁদের নাম থাকে তাই প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে, এঁরা বুঝি সুনীতি চাটুয্যের গুরুসম্প্রদায়। কারণ এনারা যখন বলেন, আমরা লিনগুইস্টিক্স জানি না, তখন আমরা ধরে নিই, আমরা জানি আর নাই জানি, তেনারা অতি অবশ্যই জানেন। এবং লিনগুইস্টিক্স তো আর মাত্র একটি বা দুটি ভাষা শিখেই আয়ত্ত করা যায় না—অতএব এঁরা নিশ্চয়ই এন্তের, বিশেষ করে ইয়োরোপীয় ভাষা, বিলক্ষণ রপ্ত করার পর আমাদের 'অজ্ঞ' বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছেন। কিন্তু কই, এঁদের নাম তো ভাষাবিদ্ পণ্ডিতদের নাম করার সময় কেউ বলে না। এঁরা তা' হলে নিশ্চয়ই ইংরেজ কবির আদেশানুযায়ীতে

অসংখ্য রতনরাজি বিমল উজ্জ্বল
খনির তিমির গর্ভে রয়েছে গভীরে।
বিজনে ফুটিয়া কত কুসুমের দল
বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে॥

'বিফলে' নয় 'বিফলে' নয়—আমরা সন্ধান পেয়ে গিয়েছি। এবং চুপিচুপি বলছি, তাঁরা যে-প্রকারের ঢক্কানিনাদ করছেন তার থেকে সন্দ হয়, তাঁরাও নিঃসন্দেহ ছিলেন, আবিষ্কৃত হবেনই।

আইস সুশীল পাঠক, এবারে আমরা সেই সব 'জেম্'দের জলুস দেখে হতবাক হই (ইংরিজীতে অবশ্য 'জেম্' বক্রোক্তিতে ব্যবহার হয়; যেমন কেউ যখন বলে, 'এই প্রেশাস "জেম্"টি তুমি পেলে কোথায়?' তখন তার অর্থ

'এই আকাট পণ্টকটিকে তুমি আবিষ্কার করলে কোত্থেকে ?' আমি কিন্তু, দোহাই ধর্মের, সেভাবে বলছি নে), এঁদের সৌরভ শুঁকে কৃতকৃতার্থ হই ।

কেউ কেউ বলেন, বহু শতাব্দীর ভিতর দিয়ে ইংরিজি ভাষার বৃদ্ধি (গ্রোথ) অধ্যয়ন করলে রোমাঞ্চ হয় (এ থ্রিলিং স্টাডি) ! অবশ্যই হয় ! আমরা শুধোব, কোন্ ভাষার ক্রমবৃদ্ধির ইতিহাস পড়লে রোমাঞ্চ হয় না ? তবে ইংরিজীর বেলা একটু বেশী হয় । কেন বেশী হয় ? এই সম্প্রদায় বলেন, ইংরিজী তার শব্দসম্পদ আহরণ করেছে অন্যান্য বহু ভাষা থেকে—যেমন লাতিন, গ্রীক, ফরাসী, হীব্রু, আরবী, হাঙ্গেরিয়ান, চীনা—এস্তেক হিন্দী-বাংলা থেকে । তবেই নাকি সম্ভব হয়েছে, এঁদের মতানুসারে—শেক্সপীয়র, মিলটন, ওয়ারড্স্ওয়ারথ্, টেনিসন ইত্যাদি ইত্যাদি ।

বিস্তর ভাষা থেকে এস্তের শব্দ নিয়েছে বলে ইংরিজীতে অত-শত উত্তম কবি—এ সিদ্ধান্তটি পরে আলোচনা করা যাবে ।

এই যে থ্রিলিং স্টাডি সেটা সম্ভব হয়েছে ইংরিজী অন্যান্য ভাষা থেকে বিস্তর শব্দ নিয়েছ বলে । সাধু প্রস্তাব !···এস্থলে আমরা তা'হলে এ তথ্যের আরেকটু পিছনে যাই—যথা, ইংরিজী অত বিদেশী শব্দ নিল কোথায়, কেন, কি প্রকারে ? আমি কথা দিচ্ছি, এটা আরো থ্রিলিং হবে ।

(১) কোনো দেশ পরাধীন হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষাও পরাধীন হয়ে যায় । নরমান বিজয়ের পর ইংরিজী যে প্রায় তিনশ' বছর অবহেলিত অপাঙক্তেয় ছিল সে কথা পূর্বেই বলেছি । এস্থলে বিজয়ী জাত যদি শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতায় বিজিত জাতের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ হয় তবে বিজিত ভাষা ক্রমে ক্রমে বিদেশী ভাষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যায় । তাই আজো ইংরেজ সব চেয়ে বেশী ঋণী ফরাসীর কাছে । এমন কি, যে সব গ্রীক লাতিন শব্দ নিয়েছে তার চোদ্দ আনা ফরাসীর মারফৎ ।

হুবহু এই ঘটেছিল ইরানে, সে দেশে আরব বিজয়ের ফলে । তাদের শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যম হুবহু তিনশ' বছর ছিল আরবী । সে ভাষার প্রভাব ফারসীর উপর এতই প্রচণ্ড যে, আজ আরবী শব্দ বর্জন করলে ফারসী এক কদমও ('কদম' শব্দটাও আরবী) চলতে পারবে না । হুবহু তেমনি উর্দুর উপর (বা প্রাকৃত হরিয়ানার উপরও বলতে পারেন) ফারসীর প্রভাব পড়েছিল ও ফারসীর মারফৎ আরবীর ।

পক্ষান্তরে ফ্রান্স বা জরমনির উপর কোন বিদেশী বেশী কাল রাজত্ব করেনি বলে ফরাসী-জরমনে বিদেশী শব্দ—ইংরিজী যে রকম বে-এস্তেয়ার হয়ে গিয়েছে তার তুলনায় মুষ্টিমেয় ।

(২) এর পর যদি সেই বিজিত জাত—এস্থলে ইংরেজ—বিধির লেখনে আপন দেশ ছেড়ে বাণিজ্য করতে বেরয়, সেই বাণিজ্য রক্ষা করতে গিয়ে রাজ্য জয় করতে আরম্ভ করে, এবং সর্বশেষে রাজত্ব করার ছলে ডাকাতি করে—চরকা পুড়োয়, আফিঙ গেলাবার জন্য সঙীন চালায়, শত্রু ঠেকাবার জন্য কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে, ড্রাই-আরথ পলিসি এস্তেয়ার করে, নিরস্ত্র বাগ-আবদ্ধ

অসহায় নর-নারীকে যারা পাশবিক হুহুংকারবলে গুলি করে মারে, তারা দেশে ফিরে স্বয়ং সম্রাটের আশীর্বাদাভিনন্দনসহ সুপপ্লেট সাইজের মেডেল পায়—তবে, তখনই, সেই 'বাণিজ্য' সেই 'রাজত্ব' সেই ডাকাতি—এক কথায় সেই রক্তশোষণ, সেই এক্সপ্লয়টেশনের চৌকশ সুবিধার জন্য সেই সব মহাপ্রভুরা বহু ভাষা শেখেন এবং তারই ফলে তাদের আপন ভাষাতে বেনোজলের মত হুড়হুড় করে বিদেশী শব্দ ঢোকে।

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার জিনিস, যে-বিজিত জাত ইতিপূর্বেই বিজয়ী জাতের কাছ থেকে অকাতরে শব্দ নিয়ে নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারাই পরবর্তীকালে অন্য জাতকে শোষণ করার সময় আরো অকাতরে শব্দ নিতে পারে। এদের তুলনায় ফরাসী-জরমন অনভিজ্ঞ বাল্যখিল্য। তদুপরি এরা চেয়েছিল প্রধানত রাজত্ব করতে ; 'বাণিজ্য' করতে নয়। এরা 'নেশন অব্ শপ্‌কীপার্‌জ' বা 'শপ্‌-লিফ্‌টার্‌জ' নয়। 'বণিকের মানদণ্ড' যখন 'পোহালে শবরী দেখা দেয় রাজদণ্ডরূপে' তখন সে 'রাজদণ্ডে'র সর্বাঙ্গে বেনে-দোকানের কালি-ঝুলির চিত্র-বিচিত্র ছোপ আর সপসপে ভেজাল তেলের দুর্গন্ধ।

শুনেছি, কোনো কোনো আন্তর্জাতিক গণিকা বাইশটি ভাষায় অনর্গল কথা কইতে পারে। তাদের সেই ভাষাজ্ঞান নমস্য কিন্তু পদ্ধতিটা গ্রহণ না করাই ভালো। ইংরেজের শব্দভাণ্ডার হয়তো বা নমস্য—আমি এস্থলে তর্ক করবো না, কিন্তু তার পদ্ধতিটা ঘৃণ্য। পাঠক এটা দয়া করে ভুলবেন না। যদ্যপি এস্থলে এটা ঈষৎ অবান্তর তবু মনে রাখবেন, প্রথম গোলাম হতে হবে, পরে ডাকাত হবেন, তবেই শব্দ ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। এবারে চরে খান্ গে—যার যা খুশী করুন। এবং স্বীকার করুন, এ স্ট্রাডি থিলিংতর নয় কি না ?

কিন্তু দোহাই ধর্মের, পাঠক ভাববেন না, গোলামির কড়ি তথা লুটের মাল দিয়ে ভরতি ইংরিজী ভাষা ব্যবহার করতে আমি অনিচ্ছুক। ডাকাতির মোহরও মোহর, পুণ্যশীলের মোহরও মোহর। ফোকটে পেয়ে গেলে ব্যবহার করবো না কেন ? মধুভাণ্ডের রস তো আগাপাস্তলা চোরাই মাল—সেটা জেনেও তো কবিগুরু সিলেটের কমলালেবুর জন্য ছোঁক ছোঁক করতেন। এটা তো তবু নির্দোষ উদাহরণ। শাহ-জাহানের হারেম ছিল ফেটে-যাওয়ার-মত ভরতি। তথাপি তিনি মাঝে-মধ্যে বাজার থেকে রমণী আনতেন। অনুযোগ করাতে বলতেন, 'হালওয়া মিষ্টি, তা সে যে কোন দোকান থেকেই আসুক।' 'হালওয়া নীক অস্‌ত্‌,—আজ্ হর্ দুকান্ বাশ্‌দ'—না কি যেন বলে ফারসীতে।

কিন্তু প্রশ্ন, মিশ্রিত ভাষা হলেই বুঝি তিনি অতুলনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ একচ্ছত্রাধিপতি ? ফরাসী ভাষা লাতিনসম্ভূতা, এবং সে কিছু গ্রীক শব্দ নিয়েছে। ইটিকে প্রায় অবিমিশ্র ভাষা বলা চলে। তবে কেন মিশ্রিত ভাষার পদগৌরবদম্ভমদমত্ত 'সায়েব-লোগ' হন্যে হবে অবিমিশ্রা ফরাসী ভাষার পিছনে পড়িমরি করে ? আসলে ভঙ্গজ চৌষট্টি-আঁসলা সর্বত্রই কুলীনের জন্য ছোঁক ছোঁক করে।

মিশ্র বলেই নাকি ইংরিজী শেক্সপীয়র, মিলটন পেয়ে ধন্য হয়েছে।

তা' হলে হায় কালিদাস ! তোমার কি গতি হবে, বাছা ? তোমার শকুন্তলা,

রঘুবংশ, মেঘদূতের পেটে বোমা মারলেও যে তাদের জবান থেকে বিদেশী লবজো বেরুবে না !

হায় হোমর, ইস্‌কিলস, আরিসতোফানেশ, ইউরিপিদিশ !

(কিন্তু আশ্চর্য, ইংরেজ তো এখনো প্রতি বৎসর এঁদের কাব্য লক্ষ লক্ষ ছাপায়—নয়া নয়া অনুবাদ করে !)

প্রাচীন যুগের আধা-মিশ্র আরবী ভাষায় কবিকুল, ওল্‌ড টেস্‌টামেন্‌টের সল্‌, দায়ুদ সলমনের 'সঙ অব্‌ সঙ্‌জ'—তোমরা তো বানের জলে ভেসে গেলে। দান্‌তের স্মরণে দীর্ঘনিশ্বাস দীর্ঘতর হল। সান্ত্বনা, চীন-জাপানের কবিদের সঙ্গে পরিচয় নেই। তাঁরা অন্‌-ওয়েপ্‌ট, অন্‌-অনর্‌ড, অন্‌সাঙ হয়ে রইলেন।

পাপমুখে কি করে আর বলি, এক পাল্লায় মিশ্রিত ভাষার কবি, অন্য পাল্লায় অবিমিশ্র ভাষার কবিকুল তুললে কোনটা ওজনে ভারি হবে সে নিয়ে আমার মনে সন্দ আছে। অবশ্য প্রতিপক্ষ বলতে পারেন, ইংরিজী কাব্যে যে ভেরাইটি আছে অন্য কাব্যে নেই। উত্তরে বলি, ফরাসী গদ্যে যে ভেরাইটি আছে, ইংরিজী গদ্যে তা নেই। এবং অনেকে বলতে পারেন, 'বত্রিশ-ভাজা'ই দুনিয়ার সর্বোত্তম খাদ্য নাও হতে পারে। 'সিংহের এক বাচ্চাই ব্যস !'

বী বী সী সম্প্রতি এক্‌সবারের মত পুনরাবৃত্তি করলেন, 'ইংরিজীই এখন পৃথিবীর সব চেয়ে চালু ভাষা।' অবশ্যই। কিন্তু কোন্‌ পদ্ধতিতে সেটি চালু হল—যার বয়ান এইমাত্র দেওয়া হল – সেটি বলতে ভুলে গেলেন। হয়তো বা সে-স্থলে সেটি অবান্তর ছিল। তারপর সগর্বে বললেন, 'হালের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন –থুড়ি, সেমিনারে—দশটি প্রবন্ধ পড়া হয় ; তার ন'টি ছিল ইংরেজীতে।'

আমি বলি, 'অধুনা ডাক্তারদের একটি সেমিনারে দশটি প্রবন্ধ পড়া হয়। তার ন'টি ছিল ক্যানসার সম্বন্ধে', তবে নিশ্চয়ই ক্যানসারের গর্ব অনুভব করা উচিত।

পদ্ধতিটা কি সম্পূর্ণ অবান্তর ?

ইংরেজ তার মিশ্রিত ভাষার প্রশংসা করে। তাই শুনে শুনে এদেশের অনেকেই ইংরেজের গলার সঙ্গে বেসুরো গলা মেলান। কিন্তু তর্কস্থলে একবার যদি ধরে নিই, ইংরেজের ভাষা যদি ফরাসীর মত অপেক্ষাকৃত ঢের ঢের অবিমিশ্র হত, তা' হলে কে কি করতো ? নিশ্চয়ই উচ্চতর কণ্ঠে বলতো, 'ভো ভো ত্রিভুবন ! শৃণ্বন্তু বিশ্বে···ইত্যাদি ইত্যাদি · এই যে আমাদের ভাষা সে কী নির্মল কী নির্ভেজাল ! সে কোনো ভাষার কাছে ঋণী নয়, সে স্বয়ংপ্রকাশ। ওহো হো হো, সে কী পূত, পবিত্র—পর্বতনির্ঝরিণীর ন্যায় অপাপবিদ্ধ। আইস, ইহাতে অবগাহন করিবা !'

এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ? সে তার আপন রক্ত অমিশ্র রাখতে চায়, ইস্তক তার ঘোড়া, তার কুকুরটাকে পর্যন্ত দো-আঁসলা হতে দেয় না। এদেশের হুদো হুদো পকেট-ছুঁচোর-কেত্তনওলা মী লাট্‌রা আপন আপন রক্তের বিশুদ্ধতা (অবশ্য কিঞ্চিৎ নরমান বেআইনী তেজাল আছে বইকি !) ভাঙিয়ে

মারকিন মুল্লুকে পয়সাউলী শাদী করছেন। প্রত্যয় যাবেন না, এই হালে বী বী সী-তেই এক ইংরেজ চারচিলের বিদেশী মাতার প্রতি ইঙ্গিত করে (যদ্যপি মাতা অধিকাংশ মারকিনের মত গোড়াতে ইংরেজই বটেন) বলেন, 'হী উয়োজ নেভার কুআইট ওয়ান অব আস।' শুনেছি চারচিল পার্লামেন্টে তাঁর জীবনে মাত্র একবার হুট্ হয়েছিলেন, তাঁর বক্তৃতা চিৎকারে অসমাপ্ত থেকে যায়—তিনি যখন ড্যুক অব্ উইন্জারের মারকিন রমণী বিবাহ-প্রস্তাব সমর্থন করতে চান।

সব বাবদে ইংরেজ অবিমিশ্র থাকতে চায়—শুধু ভাষার বাবদে ব্যত্যয়!

আসলে ভাষাটা বর্ণসংকর হয়ে গিয়েছে যে! এখন এরই প্রশংসায় আসমান ফাটাও!

আমরাও হুক্কা হুয়া করি। দু-একটা নরস্মেন, গোটা-দুই ফরাসীও করেছে। কেউ কিছু বললে, ওদের দোহাই দেব।

হিটলার পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদি পোড়ালে নরডিক্ রক্ত অমিশ্র রাখার জন্য।

ইংরিজী ভাষা নির্মিত হল কত পরাধীন জাতের রক্তশোষণের পিঠ পিঠ।

কিন্তু ইহসংসারের সর্বাপেক্ষা মিশ্রিত, বর্ণসংকর ভাষা কোন্‌টি—ইংরিজী যার একশ' যোজনের পাল্লায় আসতে পারে না? বেদে-দের, জীপসিদের ভাষা। নর্থ-পোল থেকে সাউথ-পোল, পৃথিবীর নগণ্যতম ভাষার অবদানও এ-ভাষাতে আছে। বস্তুত, মূলত ইটি কোন্ দেশের ভাষা, আর্য সেমিতি না মঙ্গোলীয় জাতের, সেই তর্কেরই সমাধান হয়নি।

বিবেচনা করি, এ ভাষাতে আরো ডাঙর ডাঙর শেক্সপীয়র-মিলটন গণ্ডায় গণ্ডায়—'অসংখ্য রতন, ডেজার্ট-ফ্লাউয়ারের ন্যায়'—ঘাপটি মেরে আপসে আপসে আব্জাব্ করছেন!

একাধিক গুণী বলেন, বেদেদের ভাষা মূলে ভারতীয়। বৎস! আর কি চাই! কেল্লা ফতেহ। আইস ভ্রাতঃ! সবে মিলি বেদেদের ভাষা শিখি॥

অর্থমর্থম্

বিশ্বের অন্যতম অসাধারণ লেখক, প্রত্নতাত্ত্বিক, যোদ্ধা টমাস এড্ওয়ার্ড লরন্স্ (Lawrence) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরব জগতে যে সুখ্যাতি অর্জন করেন তার কিংবদন্তী আজও সে অঞ্চলে সুপ্রচলিত। সে-যুদ্ধের সময় তুর্কী রাষ্ট্রের পরাধীন আরব ভূমি তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মনোভাব দেখালে পর তাঁর উপর ভার পড়ে আরবদের গেরিল্লা ও সাবোতাজ্ কর্মে পাকাপোক্ত করে তোলার। ...একদা তুর্কী থেকে বেরিয়ে একখানা হজযাত্রী ট্রেন মদীনা যাবে। ওটাকে বিস্ফোরক দিয়ে কি করে ওড়াতে হয় তারই তালিম দিচ্ছেন লরন্স্ আরবদের।

আসলে নিরীহ যাত্রীবাহী গাড়ি চুরমার করতে তাঁর মন মানছিল না কিন্তু 'নবগীতা'য় নাকি 'সান্ধ্যসংস্কৃতে' আছে 'রণে চ প্রেমে চ দাক্ষিণ্য নৈব নৈব চ।' এস্তের তোড়জোড় করে লরন্স্ তো রেল লাইনের তলায় বিস্ফোরক পোঁতার কায়দাকেতা আরবদের শেখালেন বিশেষজ্ঞের গাম্ভীর্য ও তাচ্ছিল্য সহকারে। তারপর সবাই বিস্ফোরকের আওতার বাইরে এসে আশ্রয় নিলেন মরুভূমির একটা বালির ঢিপির পিছনে। দেখা গেল, দূরে থেকে আসছে খেলনার গাড়ির মত হেলে দুলে মান্ধাতার আমলের ধাপামার্কা যাত্রীগাড়ী। সকলের চোখ গাড়িটার উপর ডাকটিকিটের মত সাঁটা। এই এল—এই এল—এই এসে গেল—বিস্ফোরকের বিসুভিয়াসটার উপর—ঐব্‌ষা—কোথায় কি! গাড়িখানা দিব্য ঝ্যাক ঝ্যাক করে কাশতে কাশতে ফাঁড়াটা মোলায়েমসে পেরিয়ে গেল। ...আরবরা 'বিশেষজ্ঞে'র দিকে আড়নয়নে তাকিয়ে মুচকি হেসেছিল কিনা বলতে পারব না। লরন্স্ বলেছেন, 'দ আরটিসট ইন মি ওয়োজ ফ্যুরিয়স, দ ম্যান ইন মি ওয়োজ হ্যাপি।' ইংরিজীটা আমার হুবহু মনে নেই, কিন্তু এটা পরিষ্কার এখনো যেন কানে বাজছে, ভাষাটি তাঁর ছিল চমৎকার আর বলার ধরনটি সরেসেরও সরেস।...যেখানে লরন্স্ হুনুরির মত ফাঁদ পাতছেন সেখানে তিনি আর্‌টিসট্ 'পার-একসেলাঁস', সেখানে বেবাক বন্দোবস্ত বরবাদ-ভণ্ডুল হলে ভিতরকার আর্‌টিসট্ সত্তা তো চটে যাবেই। কিন্তু সেই আর্‌টিস-টের পাশেই যে দরদী মাটির মানুষটি রয়েছে সে তো কতকগুলো নিরীহ বাল-বৃদ্ধকে খুন করতে চায়নি। সে তখন বগল বাজিয়ে নৃত্য করছে।

ঘটনাটি যে এতখানি ফলিয়ে বললুম তার কারণ, এ ব্যাপারটা একটুখানি ভোল বদলে আমাদের জীবনে নিত্য নিত্য ঘটে। যেমন মনে করুন, আপনি উদ্ভিদ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, তদুপরি শখের বাগান করেছেন বহু বহু বৎসর ধরে। আপনার প্রতিবেশী একটা আস্ত জানোয়ার—পাড়াটা অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আপনি একদিন দেখেন, পণ্টকটার প্রাণে শখ জেগেছে, কোত্থেকে একটি অতি সুন্দর কামিনীর চারা যোগাড় করে সেটা পুঁততে যাচ্ছে এমনভাবে যে, সজ্ঞানে চেষ্টা করলেও এর চেয়ে বেশী ভুল করা যায় না! জায়গাটা বাছাই করেছে ভুল, গর্ত যা করেছে এবং সেটাতে জল আর কাঁচা গোবর যা ঢেলেছে তাতে দিল্লীর মিঞা কুৎব্‌মিনার একবার পা হড়কে পড়ে গেলে কাগজে বেরুবে মিঞা কুৎব্ জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। পূর্বেই বলেছি—না বলিনি?—ফাঁসুড়েটার আশু পঞ্চত্ব কামনা করে আপনি কালীঘাটে শির্নি মানত করেছেন।...কিন্তু তখন আপনি আর থাকতে পারবেন না। আপনার ভিতরে যে হুনুরি, যে আর্‌টিস্‌ট ঘুমিয়ে আছে সে মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠে চিৎকার করে বলবে, 'ওরে, ও আহাম্মুখ, কামিনী এ ভাবে পোঁতে?'—তারপর ইন্‌স্পাইট অব ইওর সেল্‌ফ্ অর্থাৎ আপনার ভিতরকার হুনুরি আপনার ভিতরকার দুশমন মানুষটাকে পরোয়া না করে তাকে বাৎলে দেবে চারা পোঁতার কায়দাকেতা!!!

ভূমিকাটা মাত্রাধিক দীর্ঘ হয়ে গেল; তা হবেই। কথায় বলে

বাইরে যাদের লম্বা কোঁচা
ঘরেতে চড়ে না হাঁড়ি।
খেতে মাখতে তেল জোটে না
কেরোসিনে বাগায় তেড়ি॥

কালোবাজারীকে আমি আমার দুশমন বলে বিবেচনা করি। কালোবাজারী মাত্রই ক্যাপিটালিস্ট্; অবশ্য সর্ব ক্যাপিটালিস্ট্ই কালোবাজারী নয়। কম্যুনিস্ট্রা আবার সর্ব ক্যাপিটালিস্ট্কেই দুশমন সমঝেন। অর্থাৎ কম্যুনিস্ট্রা আমার দুশমনের দুশমন। ফারসীতেও বলে,

'দোস্ৎনীস্ত (নাস্তি), দুশমন-ই দুশমন অস্ৎ (অস্তি)'—দোস্ত নয়, কিন্তু আমার দুশমনের দুশমন!···

পূর্বেই বয়ান দিয়েছি, মানুষের ভিতরকার আর্টিস্ট্ দুশমনকেও সাহায্য করে, আর আমি দুশমনের দুশমনকে করবো না? কারণ আমার ভিতরেও একটা আর্টিস্ট্ রয়েছে। আত্মশ্লাঘা? আদৌ না। কোন্ মানুষের রক্তে আর্টিস্টের ছোঁয়াচ বিলকুল লাগেনি বলতে পারেন? এমন কি আমরা যাকে অভদ্র ভাষায় মিথ্যুক বলি সেও তো বেচারা সুযোগ থেকে বঞ্চিত—ইংরিজীতে যেমন দড়কচ্চা-মারা গাছের বেলা বলে 'এটার গ্রোৎ স্টান্টিড্'—ঔপন্যাসিক, কবি, এক কথায় আর্টিস্ট্। নোট যে লোক জাল করে সেও সুযোগ-থেকে-বঞ্চিত রবিবর্মা।

অতএব আমি যখন কম্যুনিস্ট্ ভায়াদের সদুপদেশ দিই তখন সেটা দম্ভ-জনিত আত্মশ্লাঘা বশত নয়। অবশ্য তাঁরা সেটা নেবেন কিনা, সেটা নিতান্তই তাঁদের বিবেচ্য। এবং আমি মনের কোণে এ-আশাও পোষণ করি যে তথাকথিত ধর্মভীরুজনও এদিকে খেয়াল করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। অর্থনীতিবিদ শুমপেটার বলেছেন ঃ—মারক্স্ যখন বিশ্বশ্রমিক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখন অনুমান করতে পারেননি যে, পৃথিবীর যে-কোনো স্থলে প্রথম ইন্কিলাবের ফলস্বরূপ প্রথম প্রলেতারিয়া-রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই অন্যান্য দেশের ক্যাপিটালিস্ট্রা সেটা দেখে তার থেকে লেস্ন্ ড্র করে নিজেদের সেই অনুযায়ী এড্জাস্ট্ করে নেবে, মানিয়ে নেবে।[১] অর্থাৎ এযাবৎ যে যে বেধড়ক শোষণ নীতি চালিয়েছিল সেটাকে মডিফাই করে প্রলেতারিয়াকে কিছু পরিমাণে ব্যবসাতে হক দিয়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার, পেনশন, বেকারীর সময় ডোল,

১ আমার বাড়ির সামনে দিয়ে গত সপ্তাহে বিড়িওলাদের মিছিল গেল—বিড়ির পুঁজিপতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। তারা ইনকিলা।।।ব দোহাই পেড়ে বলছিল 'ইনক্লাব জিন্দা।বাদ।' শিক্ষিত লোককেও আমি 'ইনক্লাব' উচ্চারণ করতে শুনেছি। আসল উচ্চারণ ইন্কিলা।।।ব্—'লা'টা যতদূর চান দীর্ঘ করবেন। তারপর জিন্দাটা হ্রস্বে হ্রস্বে সারবেন। তারপর 'বাদ'টা বাাাদ্ যতদূর খুশী দীর্ঘ। অর্থাৎ ইন্। কি লা।।।ব্॥ জিন্। দা। বা।।।।দ্॥

চিকিৎসার ব্যবস্থা, নানাবিধ ইনসিওরেনস দিয়ে এমনই তার স্বার্থ নিজের স্বার্থে জড়িয়ে ফেলবে যে "একদিন সে দেখবে হি হ্যাজ মোর টু লুজ দ্যান মিয়ারলি ফেটারজ" অর্থাৎ ইন্‌কিলাব এনে সে অর্থনৈতিক পায়ের রেডি হাতের কড়ার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শেয়ার ইনসিওরেন্‌সের সুবিধাও হারাবে। নবীন প্রলেতারিয়া রাষ্ট্র বিনা মেহনতে ফোকটে পয়সা কামানোটা বিলকুল বরদাস্ত করে না। ক্যাপিটালিস্‌ট্‌দের এই এড্‌জাস্‌ট্‌ করে নেওয়াটাকে শুমপেটার তুলনা করেছেন রোগের বীজাণুর সঙ্গে ; তারা যে রকম প্রাণঘাতী ওষুধের ইনজেকশন খেয়ে খেয়ে কালক্রমে ওষুধের সঙ্গে নিজেদের এড্‌জাস্‌ট্‌ করে নেয় তারপর সহজে নির্মূল হতে চায় না।

প্রশ্ন উঠবে, আমি কি তবে কম্যুনিস্‌ট্‌ ভায়াদের লেলিয়ে দিচ্ছি ধর্মের পিছনে, আর ওদিকে ধর্মানুরাগীজনকে বলছি, 'সাধু সাবধান !' ?

পাঠক যদি অনুমতি দেন, তবে এ প্রশ্নের উত্তরটি আমি উপস্থিত মুলতবী রাখবো। কারণ শুধু এরই জন্য আমাকে পুরো এক কিস্তি 'পঞ্চতন্ত্র' লিখতে হবে। উপস্থিত যেটা লিখছি তাতে এর স্থান সংকুলান হবে না।

* * *

কম্যুনিস্‌ট্‌রা একটা মোক্ষম তত্ত্ব-কথা বলেন যেটা সকলেরই বিচার করে দেখা উচিত। বস্তুত এ অধম এ-বাবদে গত ত্রিশ বছর ধরে চিন্তা করেছে, দলিল-দস্তাবেজ সন্ধান করেছে, ফের চিন্তা করেছে, এখনো করছে, উপকৃত হয়েছে ও হচ্ছে।

তাঁরা বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাসে যে-সব প্রগতিশীল আন্দোলন—ইন্‌কিলাব—যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখতে পাই তার পিছনে থাকে অর্থনৈতিক কারণ—ইকনমিক্‌ কন্‌ডিশন্‌।'[২]

সকলেই স্বীকার করবেন, পৃথিবীতে সাতটি বড় বড় আন্দোলন—পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। তার ফলে সাতটি প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়, এবং তার পাঁচটি এখনো পৃথিবীতে নানা আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সে-সাতটি সচরাচর 'ধর্ম' নামে পরিচিত। ধর্মের নাম শুনে পাঠক অসহিষ্ণু হবেন না। 'আগে কহি'।

তার তিনটির জন্ম এ-দেশে—হিন্দু (সনাতন), বৌদ্ধ, জৈন। এ তিনটি আর্যধর্ম। শেষের জৈনধর্ম এখন পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে আর প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। বৌদ্ধধর্মের রঙ্গভূমি বহু যুগ ধরে ভারতের বাইরে।

আর তিনটি আরব-প্যালেস্‌টাইন নিয়ে যে সেমিতি (সেমেটিক) ভূমি সেখানে : ইহুদি, খৃষ্টান ও 'মুসলমান ধর্ম' (ইসলাম)। এ-তিনটি সেমিতি ধর্ম। ইহুদিধর্মের বিশ্বাসীজন প্রায় দু' হাজার বছর নিষ্ক্রিয় থাকার পর

---

২ সর্ব ইনকিলাবের পিছনে যে অর্থনৈতিক কারণ থাকে সেটাই বিপ্লবের একমাত্র কারণ কিনা, কিংবা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিনা, সে আলোচনা এস্থলে থাক।

অধুনা সগৌরবে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, '—বিশ্বলোক ভাবিছে বিস্ময়ে,/ যাহার পতাকা/অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে/কোথা ছিল ঢাকা/'।

সপ্তমটির জন্মস্থল ভারত এবং সেমিতি ভূখণ্ডের মাঝখানে। এটিও খাঁটি আর্যধর্ম। প্রাচীন ইরানে এর জন্ম ও জরথুস্ত্রী বা জরথুস্ত্রের ধর্ম নামে পরিচিত। লোকমুখে এরা 'অগ্নি-উপাসক' আখ্যায় পরিচিত। ভারতবর্ষে এখন এই পারসীদের—একমাত্র না হলেও—প্রধান নিবাসস্থল। ইহুদিদের সাত শত বৎসর পূর্বে এঁরা রঙ্গভূমি থেকে বিদায় নেন। কিন্তু আজ যদি এঁরাও ইহুদিদের মত দুই সেন—মারকিন জনসেন আর ইংরেজ উইলসেনকে হাত করে প্রাচীন-ইরানে অধুনা আফগানিস্তানে অবতীর্ণ হয়ে বল্খ্ (সংস্কৃতে হিল) বদখ্শান দখল করে 'আরিয়ানা' (আর্য) রাষ্ট্র প্রবর্তন করেন তবে অন্তত আমরা আশ্চর্য হব না। বল্খ্ অঞ্চল রুশ সীমান্তের এ-পারে—মাঝখানে মাত্র আমুদরিয়া (নদী)—এবং এশিয়ার বুকের মধ্যিখানে। এখানে মারকিন-ইংরেজের একটি কলোনী বা ঘাঁটির বড়ই প্রয়োজন!···লাওৎসে, কন্ফুৎসর নীতিবাদ 'ধর্ম' নামে পরিচিত হয় না।

যে অর্থনৈতিক বাতাবরণের দরুন নবীন ধর্ম সৃষ্টি হয় তার অনুসন্ধান করতে গেলে ইসলাম নিয়ে আরম্ভ করাই প্রশস্ততম, কারণ এটি সর্বাপেক্ষা নবীন এবং ইসলামের পরে আর কোনো বিশ্বধর্ম জন্মগ্রহণ করেনি। তদুপরি আরবরা গোড়ার থেকেই জাত-ঐতিহাসিক। তারা হজরৎ সম্বন্ধে যতখানি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে গেছে তার তুলনায় খৃষ্ট বা বুদ্ধের জীবনী অনেক কাঁচা হাতে মহাপুরুষদের তিরোধানের প্রচুর সময়ের ব্যবধানে লেখা হয়েছে। ফলে তাঁদের ছবিগুলো আইডিআলাইজড—আর্টিসট্ কল্পনার উপর নির্ভর করেছেন বিস্তর।[৩]

৩ আমি এস্থলে বুদ্ধ যীশুর একমাত্র চিন্ময় রূপের মধ্যেই (অর্থাৎ আমরা যে কল্পনার বা আইডিয়ালাইজড বর্ণনার বুদ্ধ যীশুর ধারণা করি) নিজেকে সীমাবদ্ধ করছি। ওয়েল্স্ মৃন্ময় দিকটা নিয়ে মন্তব্য করেছেন—

'Jesus was a penniless teacher, who wandered about the dusty sun-bit conntry of Judea, living upon casual gifts of food; yet he is always represented (অর্থাৎ ইয়োরোপীয় চিত্রে ভাস্কর্যে) as clean, combed and sleek in spotless raiment, erect and with something motionless about him as though he was gliding through the air'. এর পর ওয়েল্স্ দেখাচ্ছেন, এই মৃন্ময় ছবির উপরও চিন্ময় ছবির প্রভাব ফেলেছে—

'This alone has made him unreal and incredible to many people who cannot distinguish the core of the story from the ornamental and unwise additions of the unintelligently devout.'

হজরৎ যখন মক্কায় একেশ্বরবাদ প্রচার করলেন তখন মক্কাবাসী সাড়ে তিনশ' দেবতা স্বীকার করতো। আরেকটি বাড়লে আপত্তিটা কি? আর নামাজ রোজাতেই বা কি? পুজোপাট তারাও করে, আর উপোসটাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যুত্তম প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু যে-ই তিনি প্রচার করলেন, ধনীর উপর ট্যাকশো বসিয়ে সে-ধন তিনি গরীবদের, 'হ্যাভনট'দের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন তখনই লাগলো গণ্ডগোল। ওদিকে 'হ্যাভনট'রা জুটলো তাঁর চতুর্দিকে—টাকাকড়ি নয়া করে ভাগাভাগি হলে তারাই হবে লাভবান! ধনী আদর্শবাদী জুটলেন অত্যল্পই, মক্কাবাসীরা তখন স্থির করলো, একে খুন না করে নিষ্কৃতি নেই।

খৃষ্টের বেলাও তাই।

তিনিও তাঁর প্রচারকার্য আরম্ভ করেছিলেন সমাজের দরিদ্রতম স্তরের গরীব জেলেদের নিয়ে। অধ্যাত্ম জগৎ তথা নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সব উপদেশ তিনি দিলেন সেগুলো আজও পূর্ণ জীবন্ত কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলছেন কেউ তোমার জামাটি অন্যায়ভাবে কেড়ে নিলে তাকে স্বেচ্ছায় জোব্বাটিও দিয়ে দিয়ো। এক পুণ্যশীল ধনীকে বলছেন, তোমরা সব-কিছু বেচে ফেলে গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।

জেরুসলেমের ইহুদি পুঁজিপতির দল তবু এসব গ্রাহ্য করেনি। ইতিমধ্যে সুলেমানমন্দিরের ভগ্নস্তূপের উপর রাজা হেরড দ গ্রেট নির্মাণ করেছেন এক বিরাট নবীন ঐশ্বর্যমণ্ডিত য়াহভে-মন্দির। কিন্তু মন্দির হোক আর সিনাগগই হোক জাত-ইহুদি ওটাকে দুদিন যেতে না যেতেই ব্যবসায়ের কেন্দ্রভূমি করে তুলেছে। সেখানে চলেছে গরুবলদের কেনাবেচা এবং তার চেয়েও মারাত্মক—সুদখোর ইহুদি মহাজনরা সেখানে চালিয়েছে টাকার লেনদেন, সরুরাফের (ক্ষুদে ক্ষুদে বাঙ্কারের) বাট্টা নিয়ে টাকাকড়ির বদলাবদলি। বস্তুত এই সব পুঁজিপতিরাই তখন পুণ্যভূমির অধিকাংশ তাদের টাকার জোরে কব্জায় এনে ফেলেছে।

ইহুদিভূমির প্রত্যন্ত-প্রদেশ থেকে সহস্র-সহস্র শিষ্যশিষ্যা, বিশ্বাসী গ্রামবাসী অনুগতজনকে নিয়ে প্রভু যীশু সগৌরবে প্রবেশ করলেন জেরুসলেমে। সেখানে গেলেন সেই সর্বজনমান্য মন্দিরে। ব্যবসায়ীদের কারবার দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা বলা কঠিন, তবে তাঁর আচরণ থেকে কিছুটা অনুমান করা যায়।

মহাজন, ক্রেতা-বিক্রেতাদের তিনি ঝেঁটিয়ে বের করে দিলেন মন্দিরের বাইরে। চতুর্থ সুসমাচার-লেখক সেণ্ট জন্ বলছেন (St. John) তিনি সুতোর দড়ি পাকিয়ে চাবুক বানিয়ে তাদের চাবকাতে চাবকাতে সেখান থেকে তাড়ালেন। টাকার থলেগুলো উজাড় করে ঢেলে দিলেন মাটিতে, ব্যাঙ্কারদের টেবিল করে দিলেন চিৎপাত। বললেন, 'শাস্ত্রে আছে: আমার ভবনের নাম

বুদ্ধের সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। এ বাবদে হজরৎ অতিশয় সাবধান ছিলেন।

হবে "উপাসনা ভবন"; আর তোরা এটাকে করে তুলেছিস "চোরের আড্ডা" (ডেন্ অব থীভ্জ্)।'

সেই সময়েই স্থির করলে পুঁজিপতি ও তাদের ইয়ার যাজকসম্প্রদায়—যীশুকে বিনষ্ট করতে হবে, ক্রুশবিদ্ধ করে মারতে হবে।

* * *

ধনদৌলত-টাকাকড়ি।

অর্থমনর্থম্ বলেন গুণীজন। কিন্তু এও সত্য,—অর্থের সন্ধানে বেরুলে অর্থ (টাকাকড়ি) নাও পেতে পারেন, কিন্তু অর্থ পেয়ে যাবেন অর্থাৎ অর্থটা—মানেটা—বুঝে যাবেন। তাই অর্থমর্থমও বটে॥

আবার আবার সেই কামান গর্জন!

খুন করার পরই খুনীর প্রধান সমস্যা মড়াটা নিশ্চিহ্ন করবে কি প্রকারে? সমস্যাটা মান্ধাতার চেয়েও প্রাচীন। আমাদের প্রথম পিতা আদমের বড় ছেলে কাইন তাঁর ছোট ভাই আবেলকে খুন করেন। তাঁর সামনেও তখন ঐ একই সমস্যা, মৃতদেহটা নিয়ে করবেন কি? সাধারণ সাদামাটা বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি সেটাকে পুঁতে ফেললেন মাটির ভিতর। কিন্তু মাটিকে আমরা মা-টিও বলি; তিনি সইবেন কেন এক পুত্রের প্রতি অন্য পুত্রের এ রকম নৃশংসতা। তাই পরমেশ্বর কাইনকে বললেন, 'এ তুমি করেছ কি? মাটির (মা ধরণীর) তলা থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত যে আমাপানে চিৎকার করছে।' অর্থাৎ মাটিতে পুঁতেও নিস্তার নেই। তাই পৃথিবীর একাধিক ভাষাতে এটা যেন প্রবাদ হয়ে গিয়েছে। সন্দেহ-বশত গোর খুঁড়ে লাস বের করে পোস্ট-মরটমের ফলে যখন ধরা পড়ে লোকটার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল তখন ঐসব ভাষাতে বলা হয়, মৃতের রক্ত বা মা ধরণী মাটির তলা থেকে চিৎকার করছিল প্রতিশোধের জন্য।[১], [২]

---

১ মূল গল্পের ধারা অনেক ক্ষেত্রে ফুটনোটের আধিক্যবশত বাধা পায়। অধম কিন্তু ফুটনোট শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে দেয়—অর্থাৎ কোনো পাঠক যদি ফুটনোট আদৌ না পড়েন তবে তিনি মূল গল্পের (টেক্স্টের) কোনো প্রকারের সারবস্তু থেকে বঞ্চিত হবেন না। ফুটনোটে থাকবার কথা মূল গল্পের—বক্তব্যের—সঙ্গে সম্পর্কিত নানাপ্রকারের আশ-কথা পাশ-কথা, যেগুলো অত্যধিক কোতূহলী পাঠক পড়েন যাতে করে কিঞ্চিত ফালতো জ্ঞান সঞ্চয় হয় কিংবা/এবং যাঁরা বইখানা পয়সা দিয়ে কিনেছেন বলে বিজ্ঞাপনতক্ বাদ দেন না। অন্যদের জন্য মিষ্টান্নই যথেষ্ট—অর্থাৎ আটপৌরে পাঠক টেক্স্ট্ পড়েই সন্তুষ্ট। ফুটনোটে এমন কিছু দেওয়া যেটা না পড়লে মূল কাহিনী বুঝতে অসুবিধা হয়—লেখকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।

২ ভ্রাতৃহত্যার চিহ্নস্বরূপ সদাপ্রভু কাইনের কপালে একটি লাঞ্ছনা এঁকে দেন। লেখকের 'প্রেম' অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

খুন-খারাবীর ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন লাস গায়েব করার জন্য যুগ যুগ ধরে খুনী কত না আজব-তাজ্জব কায়দাকেতা বের করেছে। অবশ্য খুনী যদি ডাক্তার হয় (না পাঠক, ডাক্তার-বদ্যি-হেকিম 'চিকিৎসা'র অছিলায় যে 'খুন' করে তার কথা হচ্ছে না) তবে তার একটা মস্ত বড় সুবিধা আছে। বছর বিশেক পূর্বে বিলাতবাসী এক 'কালা-আদমী' সার্জন তার মেম বউকে খুন করে; বাথটাবে লাস ফেলে সেটাকে ডাক্তারি কায়দায় টুকরো টুকরো করে কেটে ড্রইংরুমের চিমনিতে ঢুকিয়ে দিয়ে সমুচিত লাসটা পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু 'পাক প্রণালীতে' করলো একটা বেখেয়ালির ভুল। তখন ভর গ্রীষ্মকাল —ড্রইংরুমে আগুন জ্বালাবার কথা নয়। দু'একজন প্রতিবেশী ঐ ঘরের চিমনি দিয়ে যে ধুঁয়ো উঠছে সেটা লক্ষ্য করলো। ডাক্তারের বউ যে হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়, সে যে মাঝে মাঝে ডাইনে-বাঁয়ে 'সাইড-জাম্প' দিত, স্বামী-স্ত্রীতে যে ইদানীং আকছারই বেহদ্দ ঝগড়া-ফসাদ হত এসব তত্ত্ব পাড়াপড়শীর অজানা ছিল না। পুলিস সন্দেহের বশে সার্চ করে চিমনিতে ছোট্ট ছোট্ট হাড় পেল, চানের টাব্‌টা যদিও অতিশয় সযত্নে ধোওয়া-পোঁছা করা হয়েছিল তবু সূক্ষ্ম পরীক্ষা করে মানুষের রক্তের অভ্রান্ত চিহ্ন পাওয়া গেল। ...মোদ্দা ডাক্তারকে ইহলোক ত্যাগ করার সময় মা ধরণীর সঙ্গে সমান্তরাল (হরাইজন্‌টাল) না হয়ে লম্বমান (পারপেণ্ডিকুলার) হয়েই যেতে হয়েছিল।

অবশ্য ডাক্তারের ফাঁসি হওয়ার পর তার আপন লাস নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না—কারোরই। যে সরকারী কর্মচারী—অশ্লীল ভাষায় যাকে বলে 'হ্যাঙম্যান'—ডাক্তারের গলায় প্রয়োজনাতীত দীর্ঘ প্রয়োজনাধিক দৃঢ় একটি নেক্‌টাই সযত্নে পরিয়ে ডাক্তারের পায়ের তলার টুলটি হঠাৎ লাথি মেরে ফেলে দেয় সে এই 'অপকর্ম'-টি করেছিল জজসাহেবের আদেশে, সামনে ঐ ডাক্তারেরই পরিচিত আরেক ডাক্তারকে এবং জেলারসাহেবকে সাক্ষী রেখে। শুনেছি, এদেশের সরকারী ফাঁসুড়ে আসামীর গলায় দড়ি লাগাবার সময় তাকে মৃদুকণ্ঠে বলে, 'ভাই, আমার কোনো অপরাধ নিয়ো না; যা করছি সরকারের হুকুমে করছি।' ইউরোপীয় ফাঁসুড়েদের এ-রকম ন্যায়ধর্ম-জাত কোনো সূক্ষ্মানুভূতি নেই। সেখানে ফাঁসুড়ে তার মজুরির উপর ফাঁসির দড়াটা বকশিশ পায় এবং সে সেটা ছোট ছোট টুকরো করে পাড়াপ্রতিবেশীর কাছে আক্রাদরে বেচে—ফাঁসির দড়ি নাকি বড্ড পয়মন্ত।

কিন্তু সরকার, রাজা বা ডিক্‌টেটর যেখানে বেআইনী খুন করে সেখানে এদের সামনেও সেই সমস্যাই দেখা দেয়। যখন পাইকিরি হিসেবে খুন করা হয় তখন দেখা দেয় আরো দুটি সমস্যা ঃ

(১) যাদের খুন করা হবে তাদের মনে সন্দেহ না জাগিয়ে কি প্রকারে তাদের একজোট করা যায়?

(২) খুন করার জন্য অল্প খরচে অল্প সময়ে কি প্রকারে বিস্তর লোকের ভবলীলা সাঙ্গ করা যায়?

জরমন মাত্রই স্ট্যাটিস্টিকসের ভক্ত। একশটি মেয়েছেলের মধ্যে যদি

নব্বুইটি কুমারী হয়, এবং দশটি গর্ভবতী হয় তবে তারা টরেটক্কা হিসেব করে বলে এই একশটি মেয়ের প্রত্যেকটি নব্বুই পারসেন্ট্ অক্ষতযোনি কুমারী এবং দশ পারসেন্ট্ গর্ভবতী।

হিটলার এই ন্যায়শাস্ত্র অবলম্বন করে বললেন, 'নব্বুই পারসেন্ট্ তো ইহুদি—বাদবাকি দশ পারসেন্ট্ জিপ্সি, পাগল (বসে বসে শুধু খায়, লড়াইয়ের ব্যাপারে কোনো সাহায্যই করে না) ইত্যাদি। ঐ হল!—জিপ্সিও নব্বুই পারসেন্ট্ ইহুদি।' হিসেবে মিলে গেল।

দেখা গেল, হিটলারের তাঁবেতে ১৯৪১-৪২ সালে যে-সব রাষ্ট্র এসেছে এবং আসছে তাতে আছে প্রায় আশি লক্ষ ইহুদি—এখানে আমি জিপ্সি, পাগল, হিটলারবৈরী ফরাসী-জরমন-রুশ ইত্যাদিকে বাদ দিচ্ছি। হিটলার ডাকলেন হিমলারকে। ইনি পুলিস, সেকুরিটি, ইনটেলিজেন্স, হিটলারের আপন খাস সেনাদল (এরা দেশের সরকারী সৈন্য-বিভাগের অংশ নয়) কালো কুর্তীপরা এস এস এবং আরো বহু সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিকারী 'ফুয়রার'। হিটলার এঁকেই হুকুম দিলেন 'চালাও, কৎল্-ই-আম্।' অর্থাৎ পাইকারি কচুকাটা! নাদির তীমুর যখন দিল্লীতে এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তখন 'কৎল-ই-আম'ই করেছিলেন। 'আম' = সাধারণ (দিওয়ান-ই-আম তুলনীয়) আর 'কৎল' = কতল। অবশ্য নাদির-তীমুর কৎল্-ই-আম্ করেছেন প্রকাশ্যে, হিটলার-হিমলার করলেন অতিশয় সঙ্গোপনে।[৩] বস্তুত হিমলার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন সেটা যেমন অভিনব এবং কুটিল, তেমনি ক্রূর এবং মোক্ষম। তদুপরি বাইরের থেকে তাবৎ ব্যাপারটা যেন করুণাময়ের স্বহস্তে নির্মিত নিষ্পাপ কবুতরটি; ভিতরে ছিল শয়তানের সাঙাৎ কালকুটেভরা বেইমান, অশেষ পাপের পাপী পঞ্চম পাতকী তার চেয়ে বেশী পাপী বিশ্বাসঘাতকী, কালনাগিনী। এ এক অভিনব সমন্বয়ঃ বাইরে কবুতর, অন্তরে বিষধর।

পূর্বেই বলেছি, প্রথম সমস্যাঃ তাবৎ ইহুদি একত্র করা যায় কোন্ পদ্ধতিতে? এই মর্মে একটি গোপন সভা আহ্বান করলেন হিমলারের ঠিক নীচের পদের কর্তা হাইডেরিষ বার্লিনের উপকণ্ঠে তাঁর শৌখিন ভিলা ভানজে-

৩ হিটলারের খাস 'ভালে' ছিলেন লিঙে। তিনি এতই বিশ্বাসী ভৃত্য ছিলেন যে হিটলার-প্রিয়া (পর-স্ত্রী) এফা ব্রাউনের বিছানা পর্যন্ত করে দিতেন। যুদ্ধশেষে দশ বৎসর রুশদেশে বন্দীজীবন কাটিয়ে জরমনি ফিরে হিটলার সম্বন্ধে একখানি চটি বই লেখেন। 'হিটলারের প্রেম' ও 'হিটলারের শেষ দশ দিবস' (পুস্তকাকারে প্রকাশিত) প্রবন্ধে এঁর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। লিঙেকে যখন পরবর্তীকালে শুধনো হয়, ইহুদি নিধন সম্বন্ধে বহু জরমন কিছুই জানতো না কেন, তিনি বলেন, হিটলার-হিমলার বহুবার সম্পূর্ণ একলা একলা গোপন সলাপরামর্শ করতেন। সে সময়ে সেখানে লিঙের চা-কফি নিয়ে যাওয়াও মানা ছিল।

তে। এ-সভায় আইষমানকেও ডাকা হয়, যদিও পদগৌরবে তিনি এমন কিছু কিষ্টবিষ্টু ছিলেন না। কিন্তু হাইডেরিষ ছিলেন সত্যিকার 'আদম-শনাস' মানুষের জৌরি—তিনি জানতেন আইষমান তালেবর ছোকরা, যতই ঝুটঝামেলার ঝকমারি ব্যাপার হক না কেন সেটার বিলিব্যবস্থা করে সব কিছু ফিটফাট করে নিতে সে পয়লা নম্বরী! সেই সুদূর স্তালিনগ্রাদ থেকে ফ্রান্সের পূর্ব উপকূল, ওদিকে নরওয়ে থেকে উত্তর আফরিকা অবধি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ইহুদিগোষ্ঠী। আইষমানের উপর ভার পড়লো আড়কাঠি হয়ে এদের কয়েকটি কেন্দ্রে জড়ো করা।

আইষমান সম্বন্ধে বাঙলাতেও বই বেরিয়েছে; কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ কিছু বলতে হবে না। শুধু একটি কথা এখানে বলে রাখি; বাঙলা বইয়ে আছে আইষমান পাঁচ লক্ষ ইহুদির মৃত্যুর জন্য দায়ী। এটা বোধ হয় স্লিপ। পাঁচ লক্ষ নয়, হবে পাঁচ মিলিয়ান অর্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ।

শব্দার্থে ছলে বলে এবং কৌশলে আইষমান যে-ভাবে ইহুদিদের জড়ো করে ছিলেন সেটা এত সুচারুরূপে আর কেউ সম্পন্ন করতে পারতো না এ-কথা তাবৎ নাৎসি, অ-নাৎসি সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, ইহুদিদের প্রতি হিটলারের এই যে আক্রোশ এর তো তুলনা পাওয়া ভার। এর কারণটা কি?

এর উত্তর দিতে হলে তিনভলুমী কেতাব লিখতে হয়। খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের কিছুকাল পর থেকেই আরম্ভ হয় খৃষ্টান কর্তৃক ইহুদি নিপীড়ন (এবং এরাই সর্ব প্রথম নয়—সেই খৃষ্টজন্মের হাজার তিন বছর আগে থেকে পালা করে মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, রোমান সবাই এদের উপর অত্যাচার করেছে)। মধ্যযুগে স্পেনে একবার এক লক্ষ ইহুদিকে খেদিয়ে আফরিকায় ঠেলে দেওয়া হয়, এবং হাজার হাজার ইহুদিকে স্রেফ ধর্মের নামে খুন করা হয়।

কিন্তু হিটলার তো খৃষ্টান কেন কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করতেন না। পারলে তিনি এ সংসারে কোন ধর্মেরই অস্তিত্ব রাখতেন না।

হিটলার ইহুদিদের বিরুদ্ধে মাঝে-মিশেলে যুক্তিতর্কের অবতারণা করতেন কিন্তু সেগুলো আকছারই পরস্পরবিরোধী। একদিকে বলতেন, ইওরো-আমেরিকার অধিকাংশ ক্যাপিটাল ইহুদিদের হাতে—যত বেকার সমস্যা, যত রক্তাক্ত বিপ্লব, যত যুদ্ধ ইওরোপে হচ্ছে তার পিছনে রয়েছে ইহুদি পুঁজিপতি। আবার একই নিশ্বাসে বলতেন, যে রুশ-কম্যুনিজম ইওরোপের সভ্যতা সংস্কৃতি ধনদৌলত সমূলে বিনাশ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তার আগাপাস্তলা ইহুদি প্ররোচনায়। অর্থাৎ ইহুদি একাধারে কম্যুনিস্ট এবং ক্যাপিটালিস্ট। এবং যাঁরা তাঁর একমাত্র 'বই 'মাইন কাম্প্‌ফ্‌' (মাই স্ট্রাগল'—এর ঠিক ঠিক অনুবাদ নয়—'আমার জীবন সংগ্রাম' বললে অনুবাদটা মূল জরমনের আরো কাছাকাছি আসে। মোদ্দা 'আমি আমার জীবন আদর্শ বাস্তবে পরিণত করার জন্য সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি সর্ব দুশমনের সঙ্গে যে লড়াইয়ের পর লড়াই যুঝেছি তার ইতিহাস') পড়েছেন তাঁরা জানেন

তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত দলিলপত্র পেশ করে কখনো সপ্রমাণ করেননি, করবার চেষ্টা দেননি। এর কারণটি অতিশয় সরল।

ইহুদি যে এ পৃথিবীর সর্ব দুঃখের কারণ এটা হিটলারের কাছে স্বতঃসিদ্ধ টেনেট অব ফেৎ (অন্যতম 'মৌলিক বিশ্বাস')। খৃষ্টান মুসলমান যে রকম যুক্তিতর্কের অনুসন্ধান না করে সর্ব সত্তা দিয়ে বিশ্বাস করে ইহসংসারের সর্ব পাপ সর্ব দুঃখ সর্ব অমঙ্গলের জন্য শয়তানটাই দায়ী, হিন্দু যেমন বিশ্বাস করে মানবজাতির সর্ব যন্ত্রণার জন্য তার পূর্বজন্মকৃত কর্মই দায়ী, ঠিক তেমনি হিটলার তাঁর সর্ব অস্তিত্ব দিয়ে বিশ্বাস করতেন বিশ্বভুবন জোড়া সর্ব অশিবের জন্য ইহুদি জাতটা দায়ী—অন্ধ খঞ্জ বৃদ্ধ অবলা শিশু ইহুদি, সব সব, সবাই দায়ী। তাঁর অন্তরঙ্গ জনকে তিনি অসংখ্যবার বলেছেন ইহুদিকুল ছারপোকা ইঁদুরের মত প্রাণী (ভারমিন)। ছারপোকা ধ্বংস করার সময় তো কোনো করুণা মৈত্রীর কথা ওঠে না, ইঁদুরের বেলাও কোনটা ধেড়ে কোনটা নেংটি সে প্রশ্নও অবান্তর।

এ-কথা সত্য আমরা ছারপোকা নির্বংশ করার সময় কোনো রাছবিচার করি নে; এবং যে কোনো প্রকারের প্রাণী হত্যা করলেই যে এদেশের কোনো কোনো সম্প্রদায় আমাদের 'খুনী' বলে মনে করেন সে তত্ত্বও আমাদের অজানা নয়। তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায়, সত্যিই কি মানুষে ছারপোকাতে কোনো পার্থক্য নেই? ওদিকে আবার বহু খৃষ্টান সাধুসজ্জন ইহুদি ছারপোকাতে পার্থক্য করতেন বটে কিন্তু সেটা সামান্যই। আমি কাইন এবং আবেলের যে-বাইবেল কাহিনী দিয়ে এ নিবন্ধ আরম্ভ করেছি সেটিকে রূপকার্থে নিয়ে ঐসব সাধুসজ্জন কাইনকে ধরেন ইহুদিদের সিনাগগ (ধর্ম প্রতিষ্ঠান) রূপে এবং আবেলকে খৃষ্ট চার্চরূপে—অর্থাৎ ইহুদি তার আপন ধর্মবিশ্বাস দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে যেখানে খৃষ্টানকে খৃষ্টধর্মকে পায় সেখানেই তাকে নিধন করে। ইহুদি ভ্রাতৃহন্তা, সে বিশ্বঘ্ন।...পাঠক স্বপ্নেও ভাববেন না, আমি হিটলারের ইহুদি নিধন সমর্থন করছি। আমি এ প্রবন্ধ লিখছি অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে এবং এস্থলে আমি শুধু তাঁর বিশ্বাসের পটভূমিটির প্রতি ইঙ্গিত করছি; তাঁর মত আরো বহু 'বিশ্বাসী' যে পূর্ববর্তী যুগেও ছিলেন তারই প্রতি ইঙ্গিত করছি।

তা সে যাই হোক, এইসব ইহুদিদের এক জায়গায় জড়ো করতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি—ছারপোকাতে ইহুদিতে ঐখানেই তফাৎ, ছারপোকা এক জায়গায় জড়ো করতে পারলে তো আধেক মুশকিল আসান! গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ইহুদি মুরুব্বীদের বলা হত, তাবৎ ইহুদি পরিবার যেন এক বিশেষ জায়গায় জড়ো হয়। তাদের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কলনি পত্তন করা ববে। তারপর ট্রেনে মোটরে করে কানসানট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তাদের দিয়েই একটা লম্বা নালা খোঁড়ানো হত। তারপর আদেশ হত, নালার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াও। একদল এস্ এস্ ('ব্ল্যাক শার্ট'—হিটলারের খাস সেনাবাহিনী) পিছন থেকে গুলি করতো। অধিকাংশ ইহুদি গুলির ধাক্কায় সামনের নালাতে পড়ে যেত। বাকিদের লাথি মেরে মেরে ঠেলে ঠেলে নালাতে ফেলা হত।

সবাই যে সঙ্গে সঙ্গে মরে যেত তা নয়—সব সময় তাগ অব্যর্থ হয় না। এদের কেউ কেউ নালা থেকে হাত তুলে বোঝাবার চেষ্টা করতো তারা মরেনি—উদ্ধারলাভের জন্য চিৎকারও শোনা যেত। ওদিকে দৃকপাত না করে তাদের উপর নালার মাটি ফের নালাতে ফেলা হত এবং সর্বশেষে তার উপর স্টীমরোলার চালিয়ে দিয়ে মাটিটা সমতল করা হত।

নালা খোঁড়া, তার উপর ফের মাটি ফেলা এ-সব কাজের জন্য ইহুদিই যোগাড় করার জন্য কোনো বেগ পেতে হয়নি। একদল ইহুদিকে এই নিধন কর্মটি দাঁড় করিয়ে দেখানোর পর বলা হত তারা যদি গুলি করা ছাড়া অন্য সর্ব কার্যে সহায়তা করে তবে তারা নিষ্কৃতি পাবে।·· বলাই বাহুল্য এরা নিষ্কৃতি পায়নি। আখেরে ওরা ঐ একই পদ্ধতিতে প্রাণ হারায়—সাক্ষীকে ছেড়ে দেওয়া কোনো স্থলেই নিরাপদ নয়।

এইসব নিহতজনের অধিকাংশই বুড়োবুড়ী, ছেলেমেয়ে, কোলের শিশু এবং রুগ্ন অসমর্থ যুবক-যুবতী। সমর্থদের বন্দীদশায় একাধিক বড় বড় কারখানায় বেগার খাটার জন্য নিয়ে যাওয়া হত। আখেরে, অর্থাৎ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে, যুদ্ধশেষের কিছুদিন পূর্বে এ:দেরও মেরে ফেলা হয়। যুদ্ধপূর্বে জরমনিতে ছিল ৫,৫০,০০ ইহুদি, যুদ্ধশেষে রইল ৩০,০০০। পোলান্ডের সংখ্যা বীভৎসতর; যুদ্ধপূর্বে সেখানে ছিল তেত্রিশ লক্ষ, যুদ্ধশেষে মাত্র ত্রিশ হাজার। এবং আশ্চর্য এই, ত্রিশ হাজারের চোদ্দআনা পরিমাণ লোক আপন দেশ ছেড়ে পুণ্যভূমি ইহুদি স্বর্গ ইজরাএলে যেতে রাজী হয়নি। অনেকেই বলে, 'জরমনি আমার পিতৃভূমি (ফাটেরলান্ট্), এদেশ ছেড়ে আমি যাব কেন? যে পিতৃভূমিতে সে তার অধিকাংশ আত্মজন হারালো তার প্রতি এই প্রেম প্রশংসনীয় না কাণ্ডজ্ঞানহীন একগুঁয়েমির চূড়ান্ত—জানেন শুধু সৃষ্টিকর্তা!

আমি বর্ণনাটা সংক্ষেপে সারলুম, কারণ ইহুদি নিধনের এটা অবতরণিকা মাত্র—'চলি চলি পা পা' মাত্র। যেমন যেমন এস এস-দের নিধনকর্মে অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল হননকর্ম তেমন তেমন সূক্ষ্মতর, বিদগ্ধতর ও ব্যাপকতর হতে লাগল।

ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পের অধিকর্তা, যাঁরা গুলি মারার আদেশ দিতেন তাঁদের কয়েকজন যুদ্ধশেষে ধরা পড়েন। তাঁদের একজন ওলেনডর্ফ্। মিত্রশক্তি কর্তৃক জরমনির ন্যুরন্বের্গ শহরে সাক্ষ্যদানকালীন ওলেনডর্ফ্ আসামীপক্ষের উকিল আমেনের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমি এই পদ্ধতির সমর্থন করিনি।'

উকিল আমেন: 'কেন?'

ওলেনডর্ফ্: 'এ পদ্ধতিতে নিহত ইহুদি এবং যারা গুলি ছুঁড়তো উভয় পক্ষেরই মাত্রাহীন অসহ মানসিক যন্ত্রণা বোধ হত। ইহুদিদের প্রতি কসাই ওলেনডর্ফের এই 'দরদ' অভিনব, বিচিত্র। এই কুম্ভীরাশ্রুর একমাত্র কারণ তিনি তখন নিজেকে ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা দিচ্ছেন।

কিন্তু এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য, যে-সব এস এস সৈন্য গুলি ছুঁড়তো তাদের অনেকেই এই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার ফলে হঠাৎ সাতিশয় মন-মরা হয়ে যেত, মদ্য-মৈথুন ত্যাগ করতো, অবসর সময়ে সঙ্গীসাথী বর্জন করে এককোণে বসে বসে শুধু চিন্তা করতো। হিটলারের আদেশে তাদের গুলি ছুঁড়তে হবে—এ-কথা তাদের স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তাঁর আদেশ লঙ্ঘনের কোনো প্রশ্নই উঠে না—বছরের পর বছর তারা ট্রেন্‌ড্‌ হয়েছে 'বশ্যতা'মন্ত্রে—অবিডিয়েন্‌স্‌ এবাভ অল—ফ্যুরারের আদেশে কোনো ভুল থাকতে পারে না, আপ্তবাক্যের ন্যায় তাঁর আদেশ অভ্রান্ত, ধ্রুব সত্য।

কিন্তু ঐ ভয়ংকর অভিজ্ঞতাটাও তো নির্মম সত্য!

হাল বয়ান করে হিমলার-যমকে জানানো হল। ইস্পাতের তৈরি সাক্ষাৎ যমদূত-পারা ক্বচিৎ এস এস-এর নার্ভাস ব্রেক-ডাউনের খবর পেয়ে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন কিনা সে খবর জানা নেই। তবে একটা 'কেলেঙ্কারি'র খবর অনেকেই জানতো: ইহুদি নিধন যজ্ঞের গোড়ার দিকে হিমলারের একবার কৌতূহল হয়, 'ম্যাস-মারডার'—'পাইকারি কচু-কাটা' দেখার! একশ জন ইহুদি নারী-পুরুষকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি চালানো হল। সে দৃশ্য দেখে স্বয়ং শ্রীমান হিমলার ভিরমি যাচ্ছিলেন। সঙ্গীরা তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখলো। স্বয়ং যম যদি মৃত্যু দেখে চোখে-মুখে পাঙাস মারেন তবে বাল্যখিল্য যমদূতেরা 'কোঙ্গাবে' মা?[১] এবং আশ্চর্য! স্বয়ং হিটলারও চোখের সামনে রক্তপাত সহ্য করতে পারতেন না। এবং প্রাণীহত্যা আদৌ বরদাস্ত করতে পারতেন না বলে তিনি ছিলেন কড়া নিরামিষভোজী। মাংসাসীদের বলতেন 'শবাহারী'।

হিমলারের আদেশে দুখানা বিরাট মোটর ট্রাক তৈরি করা হল। দেখতে এমনি সাধারণ ট্রাকের মত, তবে চতুর্দিক থেকে টাইট ঢাকা এবং বন্ধ। শুধু বাইরের থেকে একটা পাইপ ভিতরে চলে গেছে। মোটর চালানোমাত্র বিষাক্ত গ্যাস ভিতরে যেতে থাকে, এবং দশ-পনেরো মিনিটের ভিতর অবধারিত মৃত্যু। ততক্ষণ অবধি ভিতর থেকে চাপা চীৎকার আর দরজার উপর ধাক্কা আর ঘুষির শব্দ শোনা যেত। প্রাচীন পাপী ওলেনডর্‌ফ্‌কে আদালতে শুধানো হল, 'ওদের তোমরা ট্রাকে তুলতে কি করে?'

---

৪ এই একশ' জনের ভিতর এক যুবতীকে দেখে হিমলার রীতিমত বিস্মিত হন। চেহারা, চুল, নাক আদৌ ইহুদির মত নয়। যে নরডিক্‌ (বিশুদ্ধতম আর্যরক্তের জরমন) জাত হিটলার হিমলার আদর্শ বলে ধরতেন তাদেরই মত ব্লনড চুল, নীল চোখ, ব্রিজহীন সোজা নাক ইত্যাদি। হিমলারের ডাকে সে এগিয়ে এলে হিমলার তাকে বললেন, 'তুমি ইহুদি নও।' গর্বিত উত্তর: 'না, আমি ইহুদি।' 'তুমি বলো, তুমি ইহুদি নও, আমি তোমাকে নিষ্কৃতি দেব।' গর্বিততর কণ্ঠে, 'না, আমি ইহুদি।' তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে ফিরে গিয়ে আপন জায়গায় দাঁড়ালো।

ওলেনডরফ্ঃ 'ওদের বলা হত তোমাদের অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

কিন্তু এ পন্থাতেও এস এস-দের কেউ কেউ সেই প্রাচীন চিত্তাবসাদে ভুগতে লাগলো। ট্রাক থেকে বের করার সময় দেখা যেত মৃতদেহের মুখ বীভৎস রূপে বিকৃত। গাড়িময় রক্ত মলমূত্র। একে অন্যের শরীরে জামাকাপড়ে পর্যন্ত—। একে অন্যকে এমনই জড়িয়ে ধরে আছে যে লোহার আঁকশি আর ফাঁস দিয়ে ছাড়াতে শরীর ঘেমে উঠতো, মুখ চকের মত ফ্যাকাসে হয়ে যেত, মগজে ভূতের নৃত্য আর চিন্তাধারায় বিভীষিকা।

অকল্পনীয় এই খুনে গাড়ি দুটোর অভাবনীয় মৌলিক আবিষ্কারক ডক্টর বেকারকে জানানো হল। আসলে ইনি এস এস-দের চিকিৎসক (এবং স্বয়ং এস্ এস্)। ইনি কিন্তু আমাদের সেই স্ত্রীহন্তা ডাক্তারের মত নন। তিনি 'এক-মেবা' করেই প্রসন্ন। ইনি 'ভূমার' সন্ধানে আবিষ্কারক হয়ে গিয়েছিলেন!

ঈষৎ বিরক্তির সুরে তিনি লিখলেন, 'আমি যে "ব্যবহার পদ্ধতি" লিখে দিয়েছিলুম (ঠিক যেভাবে তিনি ওষুধের প্রেসক্রপশনে 'সেবন পদ্ধতি' ডাই-রেকশন ফর ইউজ' লিখে থাকেন!) সেভাবে কাজ করা হয়নি। অপ্রিয় কর্ম তড়িঘড়ি শেষ করার জন্য গ্যাসযন্ত্র পরিচালক গ্যাস ছাড়ার হ্যাণ্ডিলটা একধাক্কায় সর্বশেষ ধাপে নিয়ে যায়; ফলে ইহুদিরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। হ্যাণ্ডিল ধীরে ধীরে চালালে এরা আস্তে আস্তে আপন অলক্ষ্যে মৃদুমধুর নিদ্রায় প্রথম ঘুমিয়ে পড়ে, শেষনিদ্রা আস্তে আস্তে এবং এতে করে আরো কম সময়ে এদের মৃত্যু হয়। দরজায় ঘুষি, মলমূত্র ত্যাগ, বিকৃত মুখভঙ্গি, একে অন্যে মোক্ষম জড়াজড়ি—এসব কোনো উৎপাতই হয় না'।

অত্যুত্তম প্রস্তাব। কিন্তু তাহলেও তো বিরাট সমস্যার সমাধান কণা পরিমাণও হয় না। কারণ ফি ট্রাকে মাত্র পনেরো থেকে পঁচিশ জন প্রাণী লাদাই করা যায়। ওদিকে হিটলার হিমলার যে বিরাট সংখ্যার দিকে ঊর্ধ্বনেত্রে তাকিয়ে আছেন, এসব গাড়ি গণ্ডায় গণ্ডায় বানিয়েও তো সেখানে পেঁছিনো যাবে না। ঐ সময়েই রাশার কিয়েফ শহরের কাছে প্রায় চৌত্রিশ হাজার প্রাণীকে—এদের অধিকাংশই ইহুদি—মাত্র দু'দিনের ভিতর খতম করার হুকুম এল, এবং জরমন কর্মতৎপরতা সে কর্ম সম্পূর্ণ করলোও বটে। গ্যাসভান দিয়ে এত লোক এত অল্পসময়ে নিশ্চিহ্ন করা যেত না।

হিটলার হিমলারের আদেশ জরমনির ভিতরে বাইরে—বিশেষ করে পোলানডে অনেকগুলো কনসানট্রেশন ক্যাম্প্ (ক ক) নির্মাণ করা হয়। সর্ব-বৃহৎ ছিল আউশ্ ভিৎস্-এ। তার বড়কর্তা ছিলেন শ্রীযুক্ত হএস্।[৫] হিমলার তাঁকে ডেকে বললেন, 'ফ্যুরার (হিটলার) হুকুম দিয়েছেন, ইহুদিদের খতম করতে হবে, প্রথমত—খুব তাড়াতাড়ি, দ্বিতীয়ত—গোপনতম গোপনে।' কি পরিমাণ

---

৫ ইনি হিটলারের ডেপুটি রুডল্ফ্ হেস (Hess) নন, যিনি সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে ইংলণ্ডে যান। এঁর নাম Hoess।

ইহুদিকে খতম করতে হবে তার মোটামুটি হিসেব হিমলার দিলেন। ইয়োরোপে তখন এক কোটি ইহুদি; অবশ্য বহু জায়গা হিটলারের তাঁবেতে নয় বলে অসংখ্য ইহুদিকে পাকড়াও করা যাবে না।

ইতিমধ্যে ছোটখাটো দু-চারটি ক ক-তে ইহুদি নিধন সমস্যার খানিকটে সমাধান হয়ে গিয়েছে। মাঝারি রকমের একটা নিরন্ধ্র হলঘরে ইহুদিদের চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো হয়। দরজা বন্ধ করে ছেড়ে দেওয়া হয় মনক্সাইড গ্যাস। আধঘণ্টার ভিতর এদের মৃত্যু হয়। কিন্তু এসব জায়গায় ছ মাসে আশী হাজারের বেশী প্রাণী নিশ্চিহ্ন করা যায় না। তা হলে তো হল না।

হয়েস্ খাঁটি জরমনদের মত পাকা লোক। কাজ আরম্ভ করার পূর্বে সব কটা ক ক দেখে নিলেন। (যুদ্ধশেষে হয়েস এক চাষা-বাড়িতে আশ্রয় নেন; সেখানে ধরা পড়েন। ন্যুরনবেরগ শহরে গ্যোরিঙ, হেস্, রিবেনট্রপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে যখন মিত্রশক্তি মোকদ্দমা চালাচ্ছেন তখন হয়েস্ সাক্ষীরূপে যা বলেন তার নির্গলিতার্থ—)

'আমি ক ক-গুলো পরিদর্শন করে আদপেই সন্তুষ্ট হতে পারলুম না। প্রথমত মনক্সাইড গ্যাস যথেষ্ট তেজদার গ্যাস নয়, দ্বিতীয় চাবুক মেরে মেরে গ্যাস-ঘরে ঢোকাতে হলে বিস্তর লোকের প্রয়োজন, তৃতীয় সেই প্রাচীন সমস্যা লাসগুলোর সর্বোত্তম ব্যবস্থা কি হতে পারে?

কারণ ইতিমধ্যে দেখা গেল, গ্যাস-ভর্তি লাস পুঁতলে তারই ঠেলায় গোরের উপরের মাটি ফুলে ওঠে—কয়েকদিন অপেক্ষা করে তবে স্টীম-রলার চালানো যায়। তদুপরি লক্ষ লক্ষ লাসের 'বেশাতি'। অতখানি জায়গা কোথায়? আউশ-ভিৎস জায়গাটি ছিল নিকটতম গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে, নির্জনে এবং কাছেপিঠে লোক চলাচলের কোন সদর রাস্তাও তার গা ঘেঁষে যায়নি। তবু কেউ সেদিক দিয়ে যাবার সময় সেই বিরাট প্রতিষ্ঠানের দেউড়ির উপরের দিকে তাকালে দেখতে পেত লেখা রয়েছে 'স্নান প্রতিষ্ঠান', গেট দিয়ে দেখতে পেত, প্রতিষ্ঠানের প্রবেশ পথের দু'পাশে কাতারে কাতারে শৌখিন মরসুমী ফুলের কেয়ারি। দূর থেকে 'নৃত্যসম্বলিত' হাল্কা গানের কনসারট সঙ্গীত ভেসে আসছে। কে বলবে সেখানে পৃথিবীর অভূতপূর্ব বিরাটতম নরনিধনালয়!

মেন রেল লাইন থেকে একটা সাইড লাইন করিয়ে নিলেন হের হয়েস্ তাঁর ক ক পর্যন্ত। যেদিনে যে সংখ্যার নরনারী শেষ করা সম্ভব সেই সংখ্যার ইহুদি গরুভেড়ার মালগাড়ির ট্রাকে করে নিয়ে আসা হয়েছে পোলাণ্ড থেকে, হাঙগেরি থেকে সুদূর রুশ থেকে। এদের খেতে দেওয়া হয়নি, ট্রাকে পানীয় জলের শৌচের ব্যবস্থা নাই। ট্রাক খোলা হলে দেখা যেত শতকরা আট থেকে দশজনা—বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে—মরে আড়ষ্ট হয়ে আছে। শীতকালে শুধু জমে গিয়েই এর সংখ্যা দেড়া হয়ে যেত।

এদের নামানো হত রেলকর্মচারীদের বিদেয় দেওয়ার পর।

ইহুদিদের বলা হয়েছে, এখানে এদের বিশেষ ওষুধ মাখানো জলে স্নান করিয়ে গা থেকে উকুন সরানো হবে (ডিলাউজিং)। তারাও দেউড়িতে দেখতে

পেত লেখা রয়েছে 'স্নান প্রতিষ্ঠান'। ফুলের কেয়ারি, ঘনসবুজ লন্, আর আবহাওয়া উত্তম হলে সেই লনের উপর বসেছে সুবেশী তরুণীদলের কনসারট। চটুল নৃত্য-সঙ্গীত শুনতে শুনতে তারা এগুতো রেসেপসনিস্ট্-এর কাছে। ইতিমধ্যে দুজন এস এস ডাক্তার ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কারা কর্মক্ষম আর কারা যাবে গ্যাস চেম্বারে। শতকরা পঁচিশ জনের মত কর্মক্ষম যুবক-যুবতীকে আলাদা করে নিয়ে যাওয়া হত অন্য দিকে। যুবতী মা-দের কেউ কেউ আপন শিশু হতে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না বলে আপন স্কারটের ভিতর লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো, কিন্তু হয়েস বলেছেন, এস এস-দের তারা ফাঁকি দিতে পারতো না। এদিকে যারা গ্যাস চেম্বারে যাবে তাদের বলা হয়েছে তাদের টাকাকড়ি, গয়না ঘড়ি, মণিজওহর—মূল্যবান যাবতীয় বস্তু আলাদা করে রাখতে যাতে করে স্নানের শেষে যে যার মূল্যবান জিনিস ঠিক ঠিক ফিরে পায়। দেশ থেকে এদের নিয়ে আসার সময় তাদের বলা হয়েছে,—তারা ভিন দেশে নূতন, কলনি [দণ্ডকারণ্য ?] গড়ে তুলবে ; আপন দেশে ফেরবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই—হীরাজওহর টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে যেতে)। ওদিকে কনসারটে পলকা নৃত্যসঙ্গীত বেজেই যাচ্ছে, বেজেই যাচ্ছে। 'তামাশা'টা পরিপূর্ণ করার জন্য কোনো কোনো দিন এদের ভিতর আবার স্থানীয় নৈসর্গিক দৃশ্যের পিকচার পোস্ট কার্ড্ দেওয়া হত—আত্মীয়স্বজনকে পাঠাবার জন্য। তাতে ছাপা রয়েছে 'আমরা মোকামে পেঁচেছি এবং চাকরি পেয়েছি ; এখানে খুব ভালো আছি ; তোমাদের প্রতীক্ষা করছি।' ইতিমধ্যে কয়েকজন অফিসার হন্তদন্ত হয়ে বলতেন, 'একটু তাড়াতাড়ি করুন ; নইলে পরের ব্যাচকে খামখা বসে থাকতে হবে যে!' তারপর সবাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ঢুকতো সেই গ্যাস চেম্বারে।

হয়েস্ বলেছেন, 'ব্যাপারটা যে কি কখনই কেউই বুঝতে পারতো না তা নয়। তখন ধুন্ধুমার, প্রায় বিদ্রোহের মত লেগে যেত। তখন অন্যান্য ছোটখাটো ক ক-তে যে-রকম বেধড়ক চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো হয় তাই করা হত।

একটা হল্-এ প্রায় দু'হাজারের মত লোক ঠাসা যেত।

এত লোককে একসঙ্গে শাওয়ার-বাথে ঢোকানো হল—তাই দেখে অন্তত তখন, অনেকেরই মনে বিভীষণ সন্দেহ জাগতো। কিন্তু ততক্ষণে 'টু লেট।' ফ্রিজিডেরের দরজার মত নিরন্ধ্র বিরাট দু' পাট দরজা তখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেয়ালের কাছে যারা দাঁড়িয়েছে তারা শাওয়ারের চাবি খুলে দেখে জল আসছে না।...এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আসতে লাগল অন্য জিনিস ... দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর লন-এ উপস্থিত একজনের দিকে ইসারা দেওয়া হত। সঙ্গে সঙ্গে সেই এস এস সেখানে একটা পাইপ খুলে ছেড়ে দিত এক টুকরো নিরেট ক্রিসটেলাইজড 'সাইক্লন বী' গ্যাস।৬ এই বস্তুটি অক্সিজেনের

৬ কোন্ প্রকারের গ্যাস, কেমিকেল ইত্যাদি সম্বন্ধে এ-লেখকের বিন্দুমাত্র

সংস্পর্শে আসামাত্রই মারাত্মকতম গ্যাসে পরিবর্তিত হয়ে পাইপের ভিতর দিয়ে উন্মুক্ত শাওয়ারের ছিদ্র দিয়ে বেরুতে থাকতো। এক নিশ্বাস নেওয়া মাত্রই মানুষ ক্লরফরম্ নেওয়ার মত সংজ্ঞা হারায়। যাদের নাকে তখন গ্যাস ঢোকেনি তারা তখন চিৎকার আর ধাক্কাধাক্কি করতো বন্ধ দরজার দিকে এগোবার জন্য আর যারা দরজার কাছে, তারা আপ্রাণ ঘুষি মারতো বন্ধ দরজার উপর। সেই মৃত্যুভয়ে ভীত প্রাণাতঙ্কে উন্মত্ত জনতা দরজার দিকে ঠেলে ঠেলে সেখানে মনুষ্য-পিরামিডের আকার ধারণ করতো।

মোক্ষম পুরু কাঁচের ছোট্ট একটি গবাক্ষের ভিতর দিয়ে 'করুণাসাগর' এস্ এস্-রা (তিন থেকে পনরো মিনিটের মধ্যেই সব শেষ—আবহাওয়া ও মৃত্যোৎসর্গিত প্রাণীর উপর নির্ভর করতো সময়ের তারতম্য।) যখন দেখতো অচৈতন্য শরীরগুলো আর থেকে থেকে হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে না, তখন ইলেকট্রিক পাম্প দিয়ে ভিতরকার গ্যাস শুষে নেওয়া হত। বিরাট দরজা খোলা হত।

গ্যাস মাস্ক্ (ছিদ্রহীন মুখোশ), রবারের হাঁটু-ছোঁয়া বুট পরে হাতে হোস পাইপ নিয়ে ঢুকতো একদল ইহুদি—পূর্বেই বলেছি এদের লোভ দেখানো হয়েছে, প্রয়োজনীয় কাজ করে দিলে এদের মুক্তি দেওয়া হবে।

দরজা খোলামাত্র লাশের পিরামিড, এমন কি যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরেছে তারাও, মাটিতে পড়ে যেত না। একে অন্যকে তখনো তারা জাবড়ে আঁকড়ে ধরে আছে। নাকমুখ দিয়ে বেরোনো রক্ত, ঋতুস্রাবের রক্ত, মলমূত্র সব লাশ ছেয়ে আছে, মেঝেতেও তাই। ইহুদিদের প্রথম কাজ হত হোস দিয়ে সব কিছু সাফসুৎরো করা। তারপর আঁকশি আর ফাঁস দিয়ে মৃতদেহগুলো পৃথক পৃথক করা। এরপর লাশগুলোর হাত থেকে আংটি সরানো হত, ডেনটিস্টরা এসে সাঁড়াশি দিয়ে মুখ খুলে সোনার, সোনা বাঁধানো দাঁত—দরকার হলে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে—বের করে নিত। মেয়েদের মাথার চুল দু-চারবার কাঁচি চালিয়ে কেটে নিয়ে বস্তায় পোরা হত—পরে কৌচসোফা এই দিয়ে তুলতুলে করা হবে এবং যুদ্ধের অন্যান্য কাজে লাগবে। সর্বশেষ ইহুদি 'জমাদাররা' স্ত্রী পুরুষ উভয়ের গোপনস্থলে 'পরীক্ষা' করে দেখে নিত হীরকজাতীয় মহা মূল্যবান কোন বস্তু লুকনো আছে কিনা।

ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমায় বলা হয় যে কোনো কোনো ক ক-তে লাসের চর্বি

ধারণা নেই। জরমন এন্সাইক্লপীডিয়া বলেন Zyklon (ৎসাইক্লন) এক প্রকারের অতি মারাত্মক বিষাক্ততম প্রাসিক (হাইড্রো সায়েনিক) এসিড। হয়েন্-এর উৎসাহে এক বৈজ্ঞানিক 'ৎসাইক্লন বা' Zyklon B আবিষ্কার করেন। এরই অন্য নাম Zyanwasserstoffkristalle; অর্থাৎ Zyankali Cyanide of Potassium, Wasserstoff = hydrogen॥ মূল ৎসাইক্লন ব্যবহার করা হত খাদ্যশস্যবিনাশকারী কীট পতঙ্গ ইঁদুর মারার জন্য। নামটা ব্যবসায়ে ব্যবহৃত।

ছাড়ানো হত সাবান ইত্যাদি তৈরী করার জন্য, এবং কোনো এক বিশেষ ক ক-র প্রধান কর্মচারীর শৌখিন পত্নী মানুষের চামড়া দিয়ে ল্যাম্প-শেড্ তৈরী করাতেন। কিন্তু এগুলো সপ্রমাণ হয়নি। অধমের নিবেদন, অনাহারে অত্যাচারে রোগব্যাধি তথা অসহ মানসিক ক্লেশে ইহুদিদের দেহে তখন যেটুকু চর্বি অবশিষ্ট ছিল, তা দিয়ে একটি কবরেজী বড়িও হয় না।

মণিমাণিক্য অলংকারাদি জরমন স্টেট ব্যাংকে পাঠানো হত। এ পদ্ধতিতে স্টেট ব্যাংক কি পরিমাণ মাল পেয়েছিলেন তার হিসাব যুদ্ধশেষে নির্ধারিত করা যায়নি। তবে ব্যাংক বেশীর ভাগ বিক্রি করে দেওয়ার পরও যা পাওয়া গিয়েছিল তাই দিয়ে যুদ্ধশেষে মারকিনরা তিনটে বিরাট বিরাট ভলট কাঁঠাল-বোঝাই করেছিল। এবং একখানা চিঠি থেকে কি পরিমাণ মাল যোগাড় করা হয়েছিল তার কিছুটা হদিস মেলে। স্টেট ব্যাংক সরকারী লগ্নী প্রতিষ্ঠানকে সে চিঠিতে লেখেন, 'এই দুসরা কিস্তিতে আমরা যা পাঠাচ্ছি তার মধ্যে আছে, ১৫৪ সোনার পকেট-ঘড়ি, ১৬০১ সোনার ইয়ারিং, ১৩২ ডায়মন্ড আংটি, ৭৮৪ রুপোর পকেট ঘড়ি, ১৬০ বিশুদ্ধ ও মিশ্রিত সোনার দাঁত, ইত্যাদি ইত্যাদি—অতি দীর্ঘ সে ফিরিস্তি। চিঠি লেখা হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ। এবং ইহুদি নিধন চালু ছিল 'ফুল্ (গ্যাস) স্টিমে' ১৯৪৪-এর শেষ পর্যন্ত—এবং তারপর মন্দগতিতে। মারকিনরা এখনো তাই ঠিক ঠিক 'মোট-জমা' প্রকাশ করতে পারেননি।

কিন্তু এসব জিনিস থাক। যে-জিনিসটা জনৈক মারকিন অফিসারকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল (এবং আমাকেও করেছে) সেটা নিবেদন করার পূর্বে বলি, এই অফিসারটি রীতিমত হারড্ বয়েল্ড ঝাণ্ডু—বিস্তর লড়াই লড়েছেন, বীভৎস সব বহু বহু দৃশ্য দেখেছেন, গণ্ডায় গণ্ডায় গুপ্তচরকে তাঁর সামনে তাঁরই আদেশে গুলি করে মারা হয়েছে (যুদ্ধের সময় গুপ্তচর নিধন আন্তর্জাতিক আইনে বাধে না); সে-সবের ঠাণ্ডা-মাথা হিমশীতল বর্ণনা পড়ে মনে হয়, ওসব ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের নেকটাইটি পর্যন্ত এক মিলিমিটার এদিক-ওদিক হয়নি কিন্তু তার 'ওয়াটারলু' এল যুদ্ধের পর, আউশভিৎস দেখতে গিয়ে, টুরিস্টরূপে (এখনো ওটি সে-অবস্থাতেই রাখা আছে—পাঠক নেকস্ট্ ট্রিপে সেটা দেখে নেবেন। আমি হিম্মৎ করতে পারিনি)। মারকিন অফিসার গ্যাস চেম্বার পোড়াবার জায়গা, বন্ধ চুল্লি খোলা চুল্লি সব—সব দেখলেন। সর্বশেষে গাইড নিয়ে গেল একটা গুদোম ঘরে যেখানে নিহত ইহুদিদের অপেক্ষাকৃত কম দামী জামা-পাপড়, জুতো-মোজা সারে সারে সাজানো ছিল।

তারই এক অংশে তিনি দেখতে পেলেন চল্লিশ হাজার জোড়া জুতো। ক্ষুদে ক্ষুদে। নিতান্ত কাঁচা-কচি শিশুদের।

এবারে আমরা যে-প্রসঙ্গ নিয়ে এ নিবন্ধ আরম্ভ করেছি সেখানে ফিরে যাই।

মারকিন মনস্তত্ত্ববিদ ডঃ গিলবারট আউশ্‌ভিৎস ক্যাম্পের কর্তা হয়েস্‌কে আশ্চর্য হয়ে শুধোন, 'এত অসংখ্য লোককে তোমরা মারতে কি করে?' হয়েস্

বাধা দিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, 'আপনি তাবৎ জিনিসটাকে ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। মারাটা তো সহজ। মিনিট পনেরো লাগে কি না লাগে, দু' হাজার লোককে মেরে ফেলতে (হয়েস্ বোধ করি জানতেন না যুদ্ধের শেষের দিকে এক জরমন ডাক্তার 'চমৎকার' একটি ইনজেকশন বের করেন, এবং মোদ্দা কথা তার দাম ফীনলের চেয়েও কম ;—ঘাড়ের কাছে সে ইনজেকশন আনাড়িতেও দিতে পারে, শিকার খতম হয় মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর)। কিন্তু আসল সমস্যা লাশগুলো নিশ্চিহ্ন করা যায় কি করে। বিরাট বিরাট চুল্লি তৈরী করে এবং সেগুলো চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখেও আমরা ঐ সময়ের ভিতর দশ হাজারের বেশী লাশ নিশ্চিহ্ন করতে পারতুম না। মনে রাখতে হবে চুল্লি থেকে মাঝে মাঝে হাড় আর ছাই বের করতে হত। হাড়গুলো মেশিনে গুঁড়ো করে ছাইসুদ্ধ পাশের নদীতে ফেলে দেওয়া হত (শুনেছি তো হাড়ের গুঁড়ো আর ছাই উত্তম সার—তবে জরমনরা এটা বরবাদ করতো। কেন ?—যেস্থলে চুল পর্যন্ত কাজে লাগানো হচ্ছে—লেখক)। মোটামুটি বলতে গেলে আমরা আউশভিৎসে ২৭ মাসে ২৪৩০০০০ (প্রায় সাড়ে চব্বিশ লক্ষ) লোক মেরেছি।'

আইষম্যান গর্ব করে বলেছিলেন, সব কটা ক ক-তে মিলে সবসুদ্ধ পঞ্চাশ লক্ষ প্রাণী খতম করা হয়। হয়েস্ স্বীকার করেছেন, শত চেষ্টা সত্ত্বেও লাশ নিশ্চিহ্ন করার কাজটা গোপন রাখা যায়নি। অর্থাৎ গ্যাস চেম্বারে নিধন কর্মটি গোপন রাখা যায়, কিন্তু মাটিতেই পোঁতো আর পুড়িয়েই ফেল—সেটা কিন্তু গোপন রাখা যায় না। লাশ-পোড়ানোর তীব্র উৎকট গন্ধ, আর চিমনির চোঙ্গা থেকে যে ধুঁয়ো বেরুচ্ছে তার ছাই ছড়িয়ে পড়তো কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত চতুর্দিকের গ্রামে। তারা বুঝে যেত ঐ নিরীহ "স্নান-প্রতিষ্ঠান" কোন্ 'বিশ্ব-প্রেমের খয়রাতী রাজকার্যে' লিপ্ত আছেন এবং শুধু সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করতো বাতাস যেন তাদের আপন বসত গ্রামের দিকে না যায়! এটা কিছু নূতন নয়। যুদ্ধের গোড়াতেই এই নিধনযজ্ঞ হিটলার আরম্ভ করেন জরমনির পাগলা-গারদগুলো দিয়ে—পাগলদের ভিতর অবশ্য কিছু ইহুদিও ছিল, কিন্তু অধিকাংশই খাঁটি জরমন। নামকে ওয়াস্তে একটা কমিশন বসলো—এত অল্প-সংখ্যক পাগল রেহাই পেল, যদি আদৌ কেউ পেয়ে থাকে, যে সেটার কোনো উল্লেখ পর্যন্ত নেই—এবং পাগলদের কতকগুলো কেন্দ্রে জড়ো করে গ্যাস মার-ফৎ মেরে পুড়িয়ে দেওয়া হল। এটা স্রেফ খুন। জরমন আইনে নিকটতম তিনজন আত্মীয়ের অনুমতি ভিন্ন পাগলকে এক প্রতিষ্ঠানথেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে সরানো পর্যন্ত যায় না—নিধন করার (যাকেভদ্রভাষায় বলা হয় 'মার্সি কিলিং' = 'অনন্ত যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেবার জন্য দয়াবশত কাউকে হত্যা করা' কিংবা 'অনারোগ্য ক্যানসারের অসহ যন্ত্রণায় রোগী যখন বিষ খেতে চায় তাকে বিষ এনে দেওয়া।' ডাক্তারি আইনে একে বলা হয়—Euthanasia, গ্রীক সমাস) তো কোন কথাই ওঠে না! পাগলদের মেরে পুড়িয়ে ফেলার প্রধান কেন্দ্র ছিল হাডামার নামক গ্রামে। তারই পাশের লিম্বুরগ্ শহর। সেখানকার বিশপ জরমনির আইন-মন্ত্রীকে একখানা চিঠিতে জানান, "ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা

পর্যন্ত সেই বন্ধ বাসগুলো চেনে, যার ভিতরে করে পাগলদের হাডামারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এর কোনো একটাকে দেখলেই ছেলেরা বলে ওঠে—ঐ যাচ্ছে 'খুনের বাক্স' = 'মার্ডার বক্স'। তাচ্ছিল্যভরে কথায় একে অন্যকে বলে, 'ক্ষেপলি নাকি ?—যাবি নাকি হাডামারের বেকিং বক্সে (যাতে কেক বানানো হয় ; এস্থলে লাশ পোড়াবার চুল্লি) ?' হাডামারের চিমনি ছাড়ে ধুঁয়ো আর সেখানকার অধিবাসীরা are tortured with the ever-present thought of depending on the direction of the wind. তবু এ কথা সত্য এ-সব খুন-খারাবী লাশ পোড়ানোর খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। যারা জানতো, তারা জানতো। অন্য কাউকে বলতে গিয়ে কেউ গেস্তাপোর ('গোপন পুলিস'—এদের প্রধানতম কর্ম ছিল রাজনৈতিক, অনেকটা রুশের 'ওগপু'র মত—এদের কাহিনী ক ক-র চেয়েও বীভৎসতর) হাতে ধরা পড়লে প্রথম তার কল্পনাতীত নানা অত্যাচার এবং এতেও যদি সে না মরে তবে সর্বশেষে তাকে কোনো একটা ক ক-তে সমর্পণ এবং সেখানে গ্যাস-চেম্বারে মৃত্যু। কাজেই হাডামার বা ক ক-গুলোতে কি হচ্ছে সে-সম্বন্ধে মুখ খুলে কেউ রা-টি কাড়তো না। তাই ঐ আমলে একটা চুটকিলা রসিকতা সৃষ্ট হয়—

'তুই নাকি, ভাই, ডেনটিস্ট্রি পড়া ছেড়ে দিয়েছিস ?'

'বাধ্য হয়ে ছাড়তে হল। কেউ যে মুখ খুলতে রাজী হয় না।'

লিমবুরগ্-এর বিশপের চিঠি পেয়ে আইনমন্ত্রী হিটলারের আপন আইন উপদেষ্টার কাছে এ-বাবদে অনুসন্ধান করলেন। আইন-উপদেষ্টা হিটলারের সেই চিঠি দেখালেন। আইনমন্ত্রী বললেন, 'এটা তো তাঁর নির্দেশ। এটা তো আইন নয়। আপনারা তা হলে এটাকে আইনের রূপ দিন, সেটাকে তারপর দেশে প্রবর্তিত করুন।'...তা হলে তো চিত্তির ! কারণ, জরমন পারলিমেণ্ট আইন করার সর্বক্ষমতা সর্ব অধিকার হিটলারকে দিয়েছিল বটে, কিন্তু আইন মাত্রই সরকারী গেজেটে প্রকাশ করতে হয়। তারপর এক বছর কেটে গেল, আইনমন্ত্রী কোন উত্তর পেলেন না। ইতিমধ্যে দেশের সব পাগল খতম। সমস্যাটার সুচারু সমাধান হয়ে গেল আপ্সে আপ্। কোনো কোনো দেশে যে রকম দুর্ভিক্ষের সমস্যা আপ্সে আপ্ সমাধান হয়ে যায় কয়েক লক্ষ লোক না খেয়ে মরে যাওয়ার পর।

লাখ তিরিশ বা পঞ্চাশেক ইহুদিকে যে ওপারে পাঠানো হল তার জন্যও কোনো 'আইন' বিধিবদ্ধভাবে তৈরী করা হয়নি। কিন্তু সে মামেলা নিয়ে কখনো কোনো লেখালেখি হয়নি,—ফরিয়াদ করবে কে ?—হলেও সেটা লোক-চক্ষু গোচর হয়নি। পবিত্র পিতা পোপের কাছে কোনো নিধনই অজানা ছিল না। তিনি থেকে থেকে বিশ্বজন তথা সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে হিটলারের কাছে 'এপীল' করতেন 'ক্রিস্টিয়ান চ্যারিটি' দেখবার জন্য। এর বেশী তিনি কিছু করে উঠতে পারেননি।[৭]

৭ যুদ্ধের পর হিটলারের প্রতি পোপের আচরণ নিয়ে তুমুল বাগ্বিতণ্ডা

হিটলার ক ক-তে কত লক্ষ ইহুদি, রুশ, বেদে ইত্যাদিকে নিহত করেন সেই সংখ্যা নিয়ে যখন ন্যুরনবের্গ মোকদ্দমায় তুমুল তর্কাতর্কি হচ্ছে তখন আসামীদের একজন ছিলেন ফ্রানক্। (এঁরই আদেশে অসংখ্য ইহুদিকে আইষমানের হাতে সমর্পণ করা হয় এবং বিচারে ফাঁসি হয়। ঐ বিচারে উনিই একমাত্র আসামী যিনি নিজেকে 'দোষী বলে স্বীকার করেন) সেই তর্কাতর্কির ভিতর আসামীদের কাঠগড়ার পিছনে যে মারকিন সান্ত্রী দাঁড়িয়েছিল সে শুনতে পেল (যে-সব মার্কিন জোয়ান উত্তম জরমন জানতো তাদেরই এ-কাজে নিয়োজিত করা হত এবং এরা ভাবখানা করতো যেন জরমন বিলকুল বোঝে না—ফলে আসামীরা নিজেদের ভিতর এমন সব কথা বলে ফেলত যেগুলো সান্ত্রীরা ফরিয়াদি পক্ষের মারকিন উকীলকে জানিয়ে দিত। আমার মনে হয় এটা অত্যন্ত বেআইনী ব্যাপার। কিন্তু মারকিন 'আইনকানুন' যেন 'শিবঠাকুরের আপন-দেশে/আইন কানুন সব নেশে।') ফ্রানক্ ফিসফিস করে তাঁর সহ-আসামী হিটলারের অন্যতম মন্ত্রী রোজনবের্গকে বলছেন, 'এরা—অর্থাৎ মারকিনিংরেজসহ মিত্রশক্তি—চেষ্টা করছে, আউশ্‌ভিৎসে দৈনিক যে দু হাজার ইহুদি মারা হত তার কুল্লে গুনাহ্ কাল্‌টেনব্রুনারের উপর চাপাবার।[৮] কিন্তু ঐ যে মার্কিনিংরেজের বোমাবর্ষণের ফলে ঘণ্টা দুয়েকের ভিতর হামবুর্গ বন্দরে ত্রিশ হাজার লোক মারা গেল তার কি? এদের বেশীর ভাগই তো ছিল শিশু এবং অবলা। তার পর ঐ যে জাপানে এটম্ বম্ ফেলে আশী হাজার লোক মারা হল তার কি? এই বুঝি ন্যায়, এই বুঝি ইনসাফ্?

হয়—তামাম ইওরোপ আমেরিকা জুড়ে। পোপবেরীরা তাঁকে যে পরিমাণে দোষী সাব্যস্ত করেছেন সেটা সাধারণ রাজনৈতিকের পক্ষে মারাত্মক হত। এঁরা স্মরণ করিয়ে দেন, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হিটলার জরমন রাষ্ট্রের চ্যান্‌সেলর (সর্বাধিকারী) হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পোপ জরমনিতে আপন রোমান ক্যাথলিক চার্চ্ ও তস্য বিশ্বাসীগণকে নাৎসি নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হিটলারের সঙ্গে একটি চুক্তি (কন্‌করডাট্) করেন। এতে করেই বিশ্বজন সমাজ মাঝে হিটলারের জল চল হয়ে যায়। তারপর আর সে 'পাগলা জগাই'-কে আর ঠেকায় কে? এই তাবৎ মামেলা নিয়ে মধ্য ইওরোপে ফিলিম এবং নাট্যও দেখানো হয়। ক্যাথলিক সমাজ স্বভাবতই অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। কলকাতাবাসীদের মনে থাকতে পারে, বহু বৎসর পূর্বে অংশতম পোপ-বিরোধী 'মারটিন লুথার' নামক একটি ফিলিম দেখবার সময় তথাকার ক্যাথলিকগণ ফিলিমটির বিরুদ্ধে রচিত ছাপা হ্যান্‌ড্-বিল বিতরণ করেন, এবং সেটাকে বয়্‌কট্ করার জন্য অনুরোধ জানান।

৮ নাৎসি রাজত্বে ক্ষমতার ধাপগুলো ছিলঃ হিটলার—হিমলার—কাল্‌টেন্-ব্রুনার—আইষম্যান্। হিটলার হিমলার আত্মহত্যা করেন—আইষমান তখন ফেরার। ফলে সব চাপ গিয়ে পড়ে কাল্‌টেন্ ব্রুনারের উপর। এরও ফাঁসি হয়। নিষ্ঠুরতায় এর সমকক্ষ লোক পাওয়া কঠিন।

রোজেনবের্গ হেসে উত্তর দিলেন, আমরা যুদ্ধে হেরেছি যে !৯

ইতিপূর্বে যে মনস্তত্ত্ববিদ মারকিন ডাক্তার গিলবারটের উল্লেখ করেছি, তিনি এই কথোপকথনের উপর ফোড়ন দিয়ে বলেছেন, 'এ হল গে টিপিক্যাল নাৎসি যুক্তিপদ্ধতি।'

বট্যে? তা সে যাক্ গে—আমরা এস্থলে আউশ্‌ভিৎস হিরোশিমার তুলনামূলক আলোচনা করবো না।১০ শুধু একটি সামান্য খবর পাঠককে দিই।

হিরোশিমায় এটম বম ফাটানো হয় ৬ই অগস্ট ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে। এর পক্ষাধিক কাল পূর্বে মহাভারতের সঞ্জয়ের ন্যায় জাপান জয়াশা ত্যাগ করে যুদ্ধে নিরপেক্ষ দেশ সুইডেনের মারফৎ যুদ্ধবিরতি কামনা করে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায় (এর মাসতিনেক পূর্বে হিটলারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হিমলার তাঁর প্রভু হিটলারকে না জানিয়ে ঐ সুইডেনের মারফৎই মিত্রশক্তির নিকট সন্ধি-প্রস্তাব পাঠান, কিন্তু দুই মহাপ্রভুর কেউই খৃষ্টের উপদেশ মানতেন না বলে বাম হস্তটি অর্থাৎ হিটলার খবরটা জানতে পান এবং আত্মহত্যার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে হিমলারকে পদচ্যুত করেন) কিন্তু মারকিন তখন হন্যে হয়ে উঠেছে, নবাবিষ্কৃত এটম বম্ একটা ঘন-বসতিওলা শহরে ছাড়লে তার প্রতিক্রিয়া কি হয় সেটা জানবার জন্য। জাপানদত্ত সন্ধিপ্রস্তাব গ্রহণ করলে তো আর বোমাটার এক্সপেরিমেণ্ট চালানো যায় না—অতএব, চালাও যুদ্ধ আরো কয়েকদিন, বোমা ফাটিয়ে দেখা যাক ক'হাজার লোক স্রেফ পুড়ে মরে, শহর কতটা ধ্বংস হয়। বলা নিতান্তই বাহুল্য হিটলারের ক ক-তে গ্যাসে মৃত্যু ছিল সম্পূর্ণ যন্ত্রণাহীন, এটম বমে জাপানীরা জ্বলন্ত জামাকাপড় নিয়ে ছুটোছুটি করে মরেছে বহু সহস্র, এবং অসংখ্য জন মরেছে বোমার ফলে নানাবিধ অজানা অচেনা রোগের যন্ত্রণায় বৎসরের পর বৎসর জীবন্মৃত হয়ে।...এবং কর্তারা একটা বোমা ফেলেই প্রসন্ন দক্ষিণং মুখং ধারণ করেননি। আমরাও জানি, এক সংখ্যাটাই বড্ডই অপয়া--নিদেন দুটো বাতাসা খেতে হয়।

---

৯ রোজেনবের্গকে নাৎসী দলের 'চিন্ময় নেতা' = 'স্পিরিচুয়াল ফ্যুরার' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর প্রখ্যাততম গ্রন্থ 'বিংশ শতাব্দীর মিথ্' গ্রন্থে তিনি উঠে পড়ে লাগেন, আর্যরাই যে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট জাতি সেইটে প্রমাণ করার জন্য।

১০ হিরোশিমার এটম বম্ বর্ষণ বাবদে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী জাপানী চিকিৎসকের একটি বয়ান আমার হাতে এসে পেঁচেছে—inspite of the sharks, popularly and mistakenly known in Calcutta as Foreign Book-seller।

সুযোগ পেলে সেটি পাঠকের হস্তে সমর্পণ করবো। ডাক্তারটি বোমা পতনের ফলে আহত হয়ে কয়েক বৎসরের ভিতরই অসহ যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যান।

স্পর্শকাতর পাঠক এতক্ষণে হয়তো কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হয়ে ভাবছেন, আমি এ-সব পুরনো কাসুন্দী ঘাটছি কেন। তবে কি আমি মডার্ন লেখকদের পাল্লায় পড়ে বীভৎস রসের অবতারণা করে শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়তে চাই? 'ঈশ্বর রক্ষতু!' আমার সে-রকম কোনো উচ্চাশা নেই। বরঞ্চ বলবো, মডার্নদের এই যে নূতন টেকনিক—আগেভাগে সব কিছু বলে দিয়ে, কোনো প্রকারের সারপ্রাইজ এলিমেণ্ট না রেখে পানসে মারা 'ধুসর' মারকা প্লট্ বিবর্জিত গল্প লেখা (এদের বক্তব্য; বাস্তব জীবনে সারপ্রাইজ নেই—আছে একঘেয়েমির ধুসরিমা, পান্তাভাতের পানসেমি, মরা ইঁদুরের পাঙাশ-মারা পেট)—এটা আমি রপ্তো করতে পারবো না। আমার যেটা মূল বক্তব্য সেটাতে আসি সর্বশেষে।

এই মাস, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮, আজকের ঠিক ২০ বৎসর পূর্বে শ্রীযুত চেম্বারলেন ও ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ে, দুজনাতে, গণতন্ত্রের প্রতিভূ হিসেবে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হিটলারের করকমলে সমর্পণ করেন।

গুণ্ডামি আরম্ভ হয় সেই সময় থেকে। ক ক তার শেষ।

আজ আবার এরা—গণতন্ত্র দেশের লক্ষ্মীছাড়া সব পলিটিশানরা—চেক-শ্লভাকদের তাড়াচ্ছে।

অথচ, পাঠক, দেখো, চেক-শ্লভাকদের সাহায্য করার রত্তিভর ক্ষ্যামতা ওদের নেই।

তাই তারা জর্মনির দুই লক্ষ সৈন্যকে তিন লক্ষ, না পাঁচ লক্ষে ওঠবার অনুমতি দিয়েছেন।

একদা যে রকম গণতন্ত্রের মুনিব চেম্বারলেন-দালাদিয়ে চেক-শ্লভাকদের হিটলারের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, আজ ঠিক তেমনি তাদের বংশধররা, চেক-শ্লভাকদের তাড়িয়ে দিয়ে, রুশদের হাতে ছেড়ে দেবেন।

আবার শুরু হবে ক ক।

গ্যাস চেম্বার!

শা-লা!

প্রেম

কি কায়দায় আলাপ হয়েছিল সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ছোকরা আইন পড়ে।

"একদিন বললে চ, একটা ইনট্রেসটিং মোকদ্দমা হচ্ছে।" এদেশের নিয়ম, আইন পরীক্ষা দেবার পূর্বে ছ'বার না দশবার—আমার সঠিক মনে নেই—আদালতে হাজিরা দিতে হয়, বোধ হয় সরকারী উকিলের অ্যাসিসট্যাণ্টরূপে দু'চারবার কাগজপত্রও দুরস্ত করে দিতে হয়।

সুইস্ আদালত আদৌ ভীতি উৎপাদক নয়। কেমন যেন ঘরোয়া ঘরোয়া ভাব।

অথচ মোকদ্দমাটা বেশ গুরুতর বিষয় নিয়ে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একটি যুবতী। সুন্দরী বলা চলে না, সাদামাটা, তবে দেখতে ভালই। এবং তার চেয়ে বড় কথা, মেয়েটি বেশ স্বাস্থ্যবতী। মুখের রঙটি যেন শিশিরে ভেজা। জানা গেল, মেয়েটি সুইস ইতালিয়ান।

দোস্ত ফিস্ ফিস্ করে বললে, "জানিস তো, জাতে সুইস হলেও এই ইতালিয়ানরা একটু আনস্টেডি—" অর্থাৎ 'উড়ুক্কু' ভাব ধরে।

প্রেমট্রেমের ব্যাপার আদালত সংক্ষেপেই সারে। তবে এ-স্থলে বিবরণীটি নিশ্চয়ই কোনো রোমাণ্টিক ছোকরা পুলিস লিখেছিল। প্রেমটা হয়েছিল গভীরই। প্রতি ছুটির দিনে উইক-এণ্ড, এমন কি কাজকর্মের ফাঁকেফিকিরে সিনেমা-কাবারে-সুইমিং পুল। বেশ স্ফূর্তিতে কেটেছে দিনগুলো—কোনো সন্দেহ নেই। এবং কোনো সন্দেহ নেই মেয়েটাই মজেছিল মরমে মরমে।

সরকারি উকিল গলাখাঁকরি দিয়ে বললেন, "এবং খর্চাটা মেয়েটির কষ্টে জমানো টাকা থেকে।"

আমার কান ছিল বিবরণীর দিকে, চোখ মেয়েটির পানে। এতক্ষণ তার মুখে কোনো ভাবের পরিবর্তন হয়নি। এবারে তার ঠোঁটের কোণে যেন ঈষৎ অসহিষ্ণুতার ভাব দেখা গেল। ··উকিল পড়ে যেতে লাগলেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে আসামী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। প্রকাশ, ছেলেটা প্রতিজ্ঞা করেছিল, আসামীকে বিয়ে করবে। আসামীর পিতামাতা ধর্মভীরু, সেও প্রতি রববারে গির্জেয় যেত। আসামী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে জানামাত্রই ছেলেটা পালায়।"

এবারে বিবরণী প্রথম পুরুষে—মেয়েটির বাচনিক।

"আমার এই বিপদে আমাকে সাহায্য করবার মত সে-শহরে কেউ ছিল না; জমানো কড়িও ফুরিয়ে গিয়েছে। তখন স্থির করলুম, গ্রামে ফিরে গিয়ে বাবা-মাকে সব খুলে বলবো। তাঁরা আঘাত পাবেন জানতুম, কিন্তু এছাড়া আমি অন্য পথ খুঁজে পেলুম না।

বাড়ি ফিরে যে অবস্থা দেখলুম তাতে বাবা-মাকে সব-কিছু খুলে বলার সাহস আমার আর রইল না। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমার দু'বছরের ছোট বোনটি—সেও শহরে গিয়েছিল কাজ নিয়ে, সেও ফিরে এসেছে পেটে বাচ্চা নিয়ে। তাকে কে দাগা দিয়েছে শুধোইনি। আমি কী কষ্টের ভিতর দিয়ে গিয়েছি সে শুধু আমিই জানি। সে বাবা-মাকে সব খুলে বলেছে। আমাকে বললে, তাঁরা বড় আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু তাকে গ্রহণ করেছেন, বাচ্চাটাকেও মানুষ করবেন।

আমি তখন করি কি? দু'দুটো মেয়ে কুপথে গেল—অথচ তাঁরা কত যত্নেই আমাদের মানুষ করেছিলেন। আমি তাঁদের কি করে বলি, আমিও কুপথে গিয়েছি। আর দু'দুটো বাচ্চা তাঁরা পুষবেনই বা কি করে?

আমি স্থির করলুম, আমার বাচ্চাটাকে আমি বিসর্জন দেব। হাজার হোক,

আমার ছোট বোন। তার হক্ক বেশী। আমি তাকে ভালোবাসি। আমি তাকে সাহায্য করতে চাই।—সে বেচারী একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমিও যদি মুখে কলঙ্কের ছোপ মাখি তবে তার হয়ে পাঁচজনের সঙ্গে লড়াই দেব কি করে?

আমি মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলুম। সে যেন একেবারে পাষাণ হয়ে গিয়েছে।

এবারে সরকারী উকিল বললেন, "নদীপারে নির্জনে আসামী বাচ্চা প্রসব করে তাকে জলে ফেলে দেয়।" তারপর একটু থেমে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু সেখানে আর কেউ ছিল না বলে প্রমাণ করা অসম্ভব না হলেও সুকঠিন, বাচ্চাটা মৃতাবস্থায় জন্মেছিল কি না।"

সমস্ত আদালত-ঘর নিস্তব্ধ, নীরব।

এইবারে প্রথম জজ মুখ খুললেন। সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টি ফেলে শুধোলেন, "বাচ্চাটা জন্মের সময় জীবিত না মৃত ছিল?"

মেয়েটি একবার মুখ তুলে তাকিয়ে ফের মাথা নিচু করলো। বললে, "আমি সত্যই শপথ করে বলতে পারবো না। আমি—আমার—আমি তখন সব-কিছু বুঝতে পারিনি।"

আশ্চর্য, জজ তো নয়-ই, সরকারি উকিল পর্যন্ত কোনো রকম জেরা বা চাপাচাপি করলেন না, প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করার জন্য। কারণ এটা তো আইনত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাচ্চা জ্যান্ত জন্মে থাকলে এটা খুন—হয়তো মারডার নয় ম্যানস্লটার—আর মৃতাবস্থায় জন্মে থাকলে বা জন্মের পরেই যদি মরে গিয়ে থাকে তবে বাচ্চা প্রসবের কথা পুলিসকে জানায়নি বলে অপরাধটা কঠিন নয়—হাইডিং অব্ এভিডেন্স্, সত্য তথ্য নির্ধারণের প্রমাণ গোপন করেছে শুধু।

মোকদ্দমা এখানেই শেষ বলা যেতে পারে। কিন্তু জজ তবু একটা প্রশ্ন শুধোলেন, "আচ্ছা, তুমি সেই ছেলেটার সন্ধান নিলে না কেন? তাকে বিয়ে করাতে বাধ্য করালে না কেন?"

কুণ্ডুলি পাকানো গোখরো সাপ যে রকম হঠাৎ ফনা তুলে দাঁড়ায় মেয়েটা ঠিক সেই রকম বলে উঠলো, "কী! সেই কাপুরুষ—যে আমাকে অসহায় করে ছুটে পালালো! তাকে বিয়ে করে আমার বাচ্চাকে দেব সেই কাপুরুষের, সেই পশুর নাম!" তারপর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললে। গোঙরানোর শব্দ কানে এল।

আমি তার মুখের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারিনি।

প্রেম যে কী দ্বেষ, কী ঘৃণায় পরিণত হতে পারে তার বিকৃত মুখে দেখলুম—পূর্বেও দেখিনি, পরেও দেখিনি।

আমি বসেছিলাম একেবারে দরজার পাশে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম।

দু'দিন পরে দোস্তের সাথে ফের দেখা।

বললে, "ছোঃ, তুই বড্ড কাঁচা। পালালি?"

"কি সাজা হল ?"

"চার মাস। কিন্তু জেলে যেতে হবে না। গাঁয়ের পাদ্রি সাহেবের কাছে প্রতি সপ্তাহে একবার করে হাজিরা দিতে হবে—গুড্ কনডাকটের রিপোর্ট দেবার জন্য। আদালত বললেন, "সমস্ত পরিবার যে বদনামের পাবলিসিটি পেল, সেই যথেষ্ট সাজা—আর যার ফাঁসি হওয়া উচিত সে তো আদালতে নেই।"

প্রেম যে কী দ্বেষ, কী ঘৃণার—

———